ব্যাবিলন কথকতা

১০ম সংখ্যা

১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

ব্যাবিলন গ্রুপ

TRENDZ
www.trendzbd.com

ডিসেম্বর ১৫, ২০১৫

সম্পাদক
এস এম এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি

বিশেষ সহযোগিতা
আরিফ হোসেন
জেভিয়ার বিপ্লব দাস
কাজী এ এম তুষার আলম

প্রচ্ছদ
ফারহানা রহমান সুরভী

অলংকরণ
মৌসুমী মিতু
সাইদুর রহমান শাহীন

সার্বিক শিল্প নির্দেশনা
ফারহানা রহমান সুরভী
সাইদুর রহমান শাহীন
মৌসুমী মিতু

সহযোগিতা
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৯৩৬-১৫৬১০০

BABYLON

ব্যাবিলন কথকতা

১০ম সংখ্যা
১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

ব্যাবিলন গ্রুপ

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		১
'ব্যাবিলন কথকতা' ইতিহাসলগ্ন	ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	৩
পরিচালনা পর্ষদের শুভেচ্ছা		৫
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে	আয়শা সিদ্দিকা আরজু	৬
হামার ছওয়াটা মানুষ হইবে	কাজী এ এম তুষার আলম	১৪
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি	মোঃ সুরুজ্জামান (মানিক)	২১
পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং সততা		
সুন্দর জীবনের পূর্বশর্ত	মোঃ নাসির উদ্দিন	২৪
বৃত্তের ভেতর শুধু তুমি আছ	মেহেদি হাসান	২৭
এক চাষীর বন্দনা	আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ	৩০
২০১৫-এর মশা	রতন চন্দ্র রায়	৩১
এইভাবে আর কতদিন	মোঃ মামুন অর রশিদ	৩১
একদিন আমার সকল হবে	ফারুক আহমেদ	৩২
তুমি এবং মানুষ কাব্য	গোলাম মোর্শেদ	৩৩
ভালোবাসা এবং অবশেষে	সেলিনা হোসেন	৩৪
কালো কৃষ্ণচূড়া	আন্না হাসান	৪৩
রানা-প্লাজা	মোহাম্মদ হাসান	৫৫
কু-আচরণে জীবন সংকটময়,		
তবুও কি তা শোধরাবার নয়!	মুহাম্মদ সাইফুল হক	৫৯
তোতলা সাকিবের গল্প	এ কে এম গোলাম মহ্হী চৌধুরী	৬৪
এ্যালোভেরা	এম এম তোফাজ্জল হোসেন	৬৯
জন্মদাত্রী 'মা'	মোঃ ফরহাদ হোসেন	৭১
ভালোবেসে চেয়েছি তোমায়	মোঃ সোহেল রানা	৭২
বিনাশে-অবিনাশে	এস এম আরিফ রাজ্জাক	৭৩
মায়াবিনী	রোজিনা আক্তার	৭৪
ইচ্ছা	এস এম মাহমুদ	৭৪
আমার প্রিয় ব্যাবিলন	শ্রী দীপু রায়	৭৫
ডিজিটাল ভালোবাসা	শেখ জয়নাল আবেদিন জনি	৭৫
সোনালী অতীতের সাড়ে-ছয়টি মাস	এস এম এমদাদুল ইসলাম	৮৩

১৬ই জুলাই	অনিক সঞ্জয় বড়ুয়া	৯১
শঙ্খ সংগম	হাসান মোঃ আশরাফুল ইসলাম	৯৪
আয় ও শিশুশ্রম	সামিউল বাশার রাজা	৯৮
নীল আকাশে সাদা ঘুড়ি	জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা	৯৯
টুম্পার আহত পাখি	রাবেয়া বেগম	১০২
আকাঙ্খা	মোঃ নুরুজ্জামান	১০৬
তারেই ভালোবাসি	কবিরুল ইসলাম	১০৬
আশার আলো ব্যাবিলন	মোঃ আবু ইনাম চৌধুরী	১০৭
ভালোবাসি	জাহানারা আক্তার	১০৭
কল্পলোকের গল্প	ইথার আক্তারুজ্জামান	১০৮
সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ	মোঃ নুর তাপস	১০৯
আকলিমাদের স্বপ্ন ভাঙার গল্প	উম্মে সালমা ডালিয়া	১১০
স্বপ্ন	মোঃ তানভীর হক সরকার	১১৩
জলছবি	মোঃ জোবায়দুল ইসলাম	১১৬
উচ্চ রক্তচাপ-সমস্যা এবং প্রতিরোধ	ডাঃ আসমা আক্তার	১১৯
কমন জেন্ডার	আতিকুল ইসলাম অপু	১২২
বর্ষার আকাশে সাতরঙা		
মেঘেদের দল	আরিফ হোসেন	১২৪
ভালোবাসার ওম	সফিকুল ইসলাম সবুজ	১২৯
পরকালের যাত্রী	মোঃ তাজাম্মুল হোসাইন	১৩১
যাবে তুমি আমার সাথে	বাপ্পি মোড়ল	১৩২
কষ্ট	রাজিয়া সুলতানা	১৩২
মায়ের আঁচল	মোঃ তরিকুল ইসলাম	১৪১
স্বাধীনতা	মোঃ আবুল কালাম (আপন)	১৪৪
মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ	ডাঃ মোঃ মোজাহারুল হক	১৪৫
স্বপ্নের জাল	উজ্জল মাহমুদ	১৪৭
দূর হতেই	আব্দুল কাদের	১৫১
জল-জোছনার কাব্য	মাহমুদ আলম সিদ্দিকি	১৬০
শিশুতোষ বধ	হাদিয়ার রহমান মীর	১৭২
সাগর পাহাড়ের দেশে	মোঃ সাহেবজাদা	১৭৪
Once A Day Together	Salma Sultana	১৭৬
Photo Album		১৮৩

সম্পাদকীয়

আরেকটি বছরের দ্বারপ্রান্তে আমরা। বছরের শুরুতে নেয়া লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী অর্জনের সফলতা ও ব্যর্থতার একটা হিসেব চলে আসে অজান্তেই। গত বছর আশা ব্যক্ত করেছিলাম যে এ বছরটা হবে গুছিয়ে নেবার দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য। বাস্তবতা বলছে, আশা ও প্রাপ্তির মধ্যে ফারাক রয়ে গেলেও গুছিয়ে নেয়াটা এ বছর খুব একটা কম হয়নি। অনেকটা ইচ্ছায়, কিছুটা বা অনিচ্ছায় কারখানাগুলোতে কাজ হয়েছে বেশ। চিহ্নিত দুর্বল কাঠামোর কারখানা ভবনগুলো হয় পরিত্যক্ত হয়েছে, নয়তো সেগুলোতে চাহিদামাফিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে মেরামত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এ কাজ এখনো চলছে। রাজনৈতিক অবস্থা অনুকুলে রয়েছে। বলতে গেলে বিদেশি ক্রেতাদের হারানো আস্থা ফিরে পেতে দেশের শিল্পটি অনেকখানি এগিয়েছে। অর্ডার আসছে, তবে কমপ্লায়েন্স চাহিদা বাড়ছে, মজুরি কমছে; এ এক অদ্ভুত খেলা চলছে শিল্প জুড়ে। ফ্যাক্টরিগুলোতে টিকে থাকার লড়াই চলছে সমানে। উন্নততর প্রযুক্তি ও জ্ঞানের ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে, অপচয় কমছে; কিন্তু এতে করে অর্জন যা হচ্ছে তার পুরোটা ক্রেতাদেরকে দিয়েও তাদেরকে সন্তুষ্ট করা যাচ্ছে না। দেশের তৈরি পোশাকশিল্প এই অদ্ভুত, অযৌক্তিক চাপ আর কতটা নিতে পারবে সেটা দেখার বিষয় এখন।

শিল্পজুড়ে যখন চলছে এই কসরত তখন আমরা ব্যাবিলনীয়ানরা কি করছি? আমরা আছি শিল্পের সবার সাথেই। অন্যান্যদের মতো আমাদের প্রচেষ্টাও চলছে বিরামহীনভাবে। আর সেজন্যে বছরটা কখন যে পলকে শেষ হয়ে গেল তা মোটেই টের পেতাম না আমাদের যদি 'ব্যাবিলন কথকতা'র দশম ও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের তাগিদ মাথায় না থাকত। হ্যা, কেমন করে আমাদের প্রিয় পত্রিকাটি তার দশম বছরে পা দিয়ে দিল! এই গৌরবময় মুহূর্তটিতে পদার্পন করে আমরা গর্ব অনুভব না করেতো পারি না। তাই আমাদের এই প্রয়াস– দশম সংখ্যাটিকে বিশেষ সংখ্যার রূপ দেয়া।

এবারের সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে পাঠক-পাঠিকারা পাচ্ছেন জনপ্রিয় কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন'র 'ভালোবাসা এবং অবশেষে'– রানা-প্লাজার মর্মস্পর্শী দুর্ঘটনার পটভূমিতে লেখা ছোটগল্প। এ পর্যায়ে এই শিল্পের একজন প্রবীণ পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে আমাকে বলতেই হবে যে প্রথমত তাজরীন ফ্যাশন ও পরে রানা-প্লাজা দুর্ঘটনায় সহস্র জীবন বিসর্জনের মূল্য হিসেবে গত দু'বছরে দেশের পোশাকশিল্প দায়িত্বশীলতার অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়েছে। ভয়াবহ ঐ দুর্ঘটনার পরে এটা বড় সান্ত্বনা বটে।

ব্যাবিলন কথকতার গত সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন স্মরণীয় হয়ে আছে ড. সৈয়দ আনোয়ার

হোসেন ও তাঁর স্বনামধন্য সহধর্মিনী ড. শওকত আরা হোসেন'র সহৃদয় উপস্থিতির জন্য। চলতি সংখ্যার জন্য পাঠানো ওঁদের শুভেচ্ছা বক্তব্যের আন্তরিকতায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। ব্যাবিলনের নামকরণের পাশাপাশি তার নামের প্রতি সুবিচারের নিয়তচর্চার বিষয়টিতে ওদের জোরালো আলোকপাত আমাদেরকে গর্বিত করে, উৎসাহিত করে।

ব্যাবিলন কথকতা'র এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থনের জন্য গ্রুপের পরিচালকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ দিতে হবে। এছাড়া যথারীতি সংশ্লিষ্ট কলাকুশলিরা বিশেষ ধন্যবাদের দাবিদার, কারণ যেকোনো বছরের চাইতে এ বছরটা গেছে ব্যস্ততম- এখনো তাই যাচ্ছে। কমপ্লায়েন্স বিষয়ক প্রতিদিন একাধিক অডিট, ভিজিট এবং কমপ্লায়েন্সের নতুন নতুন চাহিদা সামাল দিয়ে এর পরও সহ-সম্পাদক মাহমুদ কি করে সময় বের করেছে পত্রিকা প্রকাশের কাজে তা আমি বুঝতে পারি না। তবে এ থেকে ব্যাবিলন কথকতার প্রতি ওর গভীর দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসাটুকু টের পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ শিল্পী ফারহানা, অলংকরণে মিতু এবং শাহিন, কম্পোজে আরিফ, প্রুফ রিডিংয়ে জেভিয়ার তাদের দৈনন্দিন ব্যস্ততার মধ্যেও যেভাবে সময় বের করেছেন কথকতার জন্য- এদের সবাইকে আমার স্নেহাশীষ ও ধন্যবাদ।

বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ স্বভাবতই ব্যয়বহুল; তবে এক্ষেত্রে ব্যাবিলনের অগণিত ব্যাবসা-সহযোগিদের পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের প্রকাশনাকে সহজ করে দিয়েছে অনেকাংশেই। বিজ্ঞাপন দিয়ে সহায়তার জন্য এদের সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মহা-ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ হাসানকে তার সার্বিক নজর রাখার জন্য। ধন্যবাদ সবুজ, মাহমুদ, তুষার এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইনচার্জগণকে ধৈর্য সহকারে বিজ্ঞাপনদাতাদের সাথে সফল যোগাযোগ রক্ষার জন্য।

পরিশেষে কথকতার সকল লেখক-লেখিকা, ব্যাবিলন পরিবারের বাইরে আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ী, পাঠক-পাঠিকা এবং গত দশ বছর ধরে আমাদের এই পত্রিকার প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট অক্ষর প্রিন্টার্সের কামাল ভাইকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ।

মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছার সাথে হানাহানি ও সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্বের কামনাসহ ২০১৬ সনের আগাম শুভেচ্ছা সবার জন্য।

এমদাদুল ইসলাম
সম্পাদক
ডিসেম্বর ১৫, ২০১৫ইং

‘ব্যাবিলন কথকতা’ ইতিহাসলগ্ন

বাঙালির ইতিহাসচেতনা প্রশ্নবিদ্ধ। বাঙালি ইতিহাস বিস্মৃত হয়, অথবা ইতিহাস এড়িয়ে ঘটনার উদ্দেশ্যপ্রসূত বিকৃতিকে সত্য হিসেবে ধারণ করে। কিন্তু ইতিহাস নগ্ন সত্য; আর সত্যের মুখোমুখি হওয়া কঠিন। বাঙালি বোধহয় এ কারণে ইতিহাসে অনীহ। কিন্তু তবুও বাঙালির ইতিহাস সচেতনতার কিছু আলো- বিন্দু মাঝে মাঝে দৃশ্যমান হয়, এবং তা রীতি মাফিক ইতিহাস চর্চার বাইরেও; আর পেশাদার ইতিহাস চর্চার ঘেরাটোপের বাইরেও। এই যেমন ধরা যাক, ব্যাবিলন গ্রুপ নামের এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা।

প্রতিষ্ঠানটি প্রচারে অনীহ। কাজেই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা ছিল না। জানলাম- চিনলাম প্রতিষ্ঠানটির একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হবার সুবাদে। বাংলাদেশে সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নানা বাহারি নাম আছে; কিন্তু কোন নামে ইতিহাসের স্পর্শ নেই, যেমন আছে ব্যাবিলন গ্রুপের নামের মধ্যে। কাজেই নামের কারণে প্রতিষ্ঠানটি ব্যতিক্রমী। অবশ্য ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য আরো আছে।

কথা হলো, প্রতিষ্ঠানের নামে যে ইতিহাসের স্পর্শ আছে তা কি দৈবাৎ না ইচ্ছাকৃত? নামকরণের ইতিহাস যা-ই হোক না কেন আমাদের মতো ইতিহাস অনুরাগীদের কাছে নামটি আকর্ষণীয় মনে হয়েছে, যেমন হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিও।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা (খ্রিঃ পূঃ ২৩০০-১৭০০) গড়ে উঠেছিল, মেসোপটেমিয়ায়, যে ভূখণ্ড এখন ইরাক নামে পরিচিত। সভ্যতাটির প্রধান অবদান পৃথিবীর প্রথম আইন সংকলন, যার সংকলক ছিলেন রাজা হামুরাবি (খ্রিঃ পূঃ ২১২৩-২০৮১)। এজন্যে সংকলনটির নাম ‘কোড অব হামুরাবি’। হামুরাবির উদ্দেশ্য ছিল সুনির্দিষ্ট আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা

প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের বিবেচনায় ব্যাবিলন গ্রুপও একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান; এবং যার পণ্যও নজরকাড়া মানের।

কর্মস্থলের সুশৃঙ্খল পরিবেশ আর উৎপাদিত পণ্যের সন্তোষজনক মান নির্ভর করে মালিক-কর্মী উভয় পক্ষের হার্দ্য সম্পর্কের ওপর, যা এ প্রতিষ্ঠানে দৃশ্যমানভাবে বিদ্যমান। বিশেষ করে, কল্যাণমুখি উদ্যোগ- আয়োজনে প্রতিষ্ঠানটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে রবার্ট ওয়েনের শ্রমিক কল্যাণমুখি বিভিন্ন প্রাথমিক উদ্যোগের কথা। বলতে দ্বিধা নেই ব্যাবিলন গ্রুপ যেন রবার্ট ওয়েনকে অনুসরণ করছে।

প্রতিষ্ঠানটির আরো একটি দৃষ্টান্তরহিত উদ্যোগ 'ব্যাবিলন কথকতা' নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করা। পত্রিকায় বাইরের কারও নয়, মালিক-কর্মীদের লেখা থাকে, যা মনোগ্রাহী ও মানসম্মত। অর্থাৎ পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠান-কর্মীদের সৃজনশীলতার মঞ্চ হিসেবে থাকছে। উল্লেখ্য, শুধু বাংলায় নয়, ইংরেজিতেও লেখা থাকে, যা প্রশংসনীয়।

ব্যাবিলন গ্রুপ এবং 'ব্যাবিলন কথকতা'- কে অভিবাদন- অভিনন্দন।

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচালনা পর্ষদের শুভেচ্ছা

ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর কর্মসূচিগুলোর মধ্যে ব্যাবিলন কথকতা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। এর শুরুটা হয়েছিল শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাগণের মানসিক বিকাশের একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়ার জন্যে। মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ না ঘটলে কাম্য কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা অনেকটাই দুরূহ ব্যাপার। শিল্পবোধের উন্মেষ মানুষের ভাবনার পরিমন্ডলের ব্যপ্তি ঘটায় এবং তার ভাব বিকাশের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে বলেই আমরা মনে করি।

এই দশ বছরে ব্যাবিলন কথকতা শুধুমাত্র একটি সাহিত্য পত্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রীতিমতো একটি সোস্যাল ডায়ালগে পরিণত হতে পেরেছে। আমরা বিশ্বাস করি- একটি নিরাপদ এবং বিশ্বস্ত কর্মপরিবেশের জন্য কর্মরত সকলের মধ্যে স্বার্থহীন সুসম্পর্ক অত্যাবশ্যক। গত দশ বছরে ব্যাবিলন কথকতা এরকম একটি সম্পর্ক তৈরিতে যে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পেরেছে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

আমরা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছি একটা চলমান প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাগণের লেখনি শক্তি উন্নততর হয়েছে, তাদের চিন্তার ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটেছে। আমাদের বিশ্বাস শিল্পচর্চার মাধ্যমে বিকশিত একজন মানুষ প্রতিষ্ঠানের জন্য কখনো ক্ষতিকর হতে পারে না বরং তার বিকাশ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সহায়ক হয়।

এই পত্রিকার লেখা, অলংকরণ, প্রচ্ছদ, সম্পাদনা সবই ব্যাবিলনের কর্মীগণের চিন্তা, শ্রম এবং প্রয়াস থেকে সংগঠিত হয়- আত্মনির্ভরশীলতার এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ হতে পারে এটি। যারা এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিরলস শ্রম দিয়েছেন দৈনন্দিন কাজের ভেতর থেকে সময় বের করে- তাদের সকলের প্রতি আমাদের অভিনন্দন রইল।

ব্যাবিলন কথকতার দশ বছর পূর্তির এই শুভক্ষণে আমরা সকলের জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি। ব্যাবিলন কথকতার যাত্রা অব্যাহত থাকুক আমরা সেই প্রত্যাশাই করি আন্তরিকভাবে।

আব্দুস সালাম	পরিচালক
আবিদুর রহমান	পরিচালক
মইনুল আহসান	পরিচালক
নিসার আহমেদ	পরিচালক
এমদাদুল ইসলাম	পরিচালক

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে

আয়শা সিদ্দিকা আরজু
ওয়েলফেয়ার অফিসার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

বৃষ্টির নুপুর পায়ে রিনিঝিনি ছন্দ তুলে ছুটে চলেছে সদ্য কিশোরী বর্ষার প্রকৃতি। ছন্দে ছন্দে ছুঁয়ে দিচ্ছে গাছপালা, মাঠ-ঘাট, পাহাড়, নদী এমনকি গাঁয়ের ছোট ছোট ঘরের উঠানে শুকোতে দেয়া ডালের বড়িকেও। এতদিনের প্রখর সূর্যের তাপে পুড়ে দগ্ধ হয়েছে কিশোরী প্রকৃতি, ফেটে চৌচির হয়েছে তার বুক, ক্লান্তিতে অসাড় হয়েছে তার বুকে আশ্রয় নেয়া মানুষগুলো।

তাইতো গগন গরজে যখন বর্ষা এল, লাজুক কিশোরী তখন যেন ফিরে পেল স্বস্তির ছোঁয়া। বৃষ্টির আবেগী স্পর্শে নিজেকে মেলে ধরতে আর কোনো বাধা রইল না। বর্ষার এই হঠাৎ আগমনে আনন্দ ছড়িয়ে গেল সবার মনে। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো দুরন্ত-দুর্বার, বৃষ্টির ছন্দে ছন্দে নাচতে লাগলো ওরাও। ঘর ছেড়ে সব বৃষ্টির জলে নাইতে লাগল, অকারণে চিৎকার করে ছুটে বেড়াতে লাগল দিগ্বিদিক। কেউ ছুটে গেল বড় মাঠের দিকে, কেউ মাটির রাস্তা ধরে বহুদূরে, আবার কেউবা নদীর তীরে হিজলের নুয়ে পড়া ডাল থেকে লাফিয়ে পড়তে লাগল নদীর জলে। গাঁয়ের কিশোরী মেয়েগুলো- কোমরে ওড়না পেঁচিয়ে বাড়ির উঠোনে একজন অন্যজনের হাত ধরে এক নাগাড়ে ঘুরতে ঘুরতে হাত ছেড়ে দিয়ে পড়ে যেতে লাগল পিছলা উঠানে, আর অকারণে হেসে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

ছোট্ট ঘরের টিনের চালের উপর বাঁশের তৈরি চালনিতে নেড়ে দেয়া হয়েছে কেজি দেড়েক মাশকলাইয়ের ডাল আর তেল চিটচিটে কভারবিহীন দুটো বালিশ। বৃষ্টির জলে ভিজে যেগুলো ইতিমধ্যে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। বাড়ির পিছনে ছোট্ট মাঠটিতে বাঁধা গরু এবং বাছুরছানা ভিজে দাঁড়িয়ে আছে জড়সড় হয়ে। বাড়ির অন্যান্য কাজকর্ম করতে করতে এই সবকিছুর কথা বেমালুম ভুলে গেছে রাশিদা বেগম। হঠাৎ মনে পড়লে দৌড়ে ছুটে গেলেন মাঠের দিকে। ভিজতে ভিজতে গরুর গলায় বাধা দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন বাড়ির উঠানে। নির্ধারিত জায়গায় গরুগুলোকে রেখে ঘরের চালের দিকে চোখ যেতেই চিৎকার করে উঠলেন তিনি- এত বড় বুড়ি বেটি ছৈল্ থাকতি হামার এত কষ্ট করণ

লাগিচ্ছে, বুড়ি খালি বসি বসি গিলতি পারে, একখান কাম না করে। আইজ তোর খাওন হামি বালা করি খাওয়াইছুঁ- একমনে কাজ করছেন আর মেয়েকে বকেই যাচ্ছেন তিনি। মায়ের চিৎকার শুনে পড়িমড়ি করে দৌড়ে ছুটে আসে আসমা। পাতলা ছিপছিপে গড়নের তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরী বালিকা সে, বাদামী গায়ের রং, গোলগাল মুখের গড়ন, ডাগর দুটি চোখ, মায়াবী চেহারা।

অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে এমনিতেই কাঁপছিল সে। তার উপর মায়ের বকুনি শুনে তার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পা টিপে টিপে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মেয়েকে সামনে দেখে রশিদা বেগমের রাগ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এক ঝটকায় বা হাত দিয়ে আসমার বেনুনী চেপে ধরে পিঠের উপর ধপাধপ কয়েকটি থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। চুল ধরে বাড়ির বাইরের দরজায় নিয়ে আসেন আসমাকে- বাইর হয়া যা, মুই যেন্ আর কুনোদিন তোর মুখ ন দেখি, তোরা মইরলে মুই শান্তি পাঁও, বাইর হয়া যা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, খুব ভয়ে ভয়ে ঘরে ফিরে আসে আসমা। কেরোসিনবিহীন হ্যারিকেনটি নিভু নিভু করছে ঘরের এককোণে। সারাদিনের অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মনটা ভীষণ রকমের খারাপ হয়ে আছে রাশিদা বেগমের। মেয়েকে আবারও সামনে পেয়েই ক্ষেপে যান তিনি, আইজ তুই ভাত না খাইস? তোক্ না কইছুঁ তুই হামার সামনে না আইছ্? চুপচাপ ছেঁড়া চাটাইখানা মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়ে আসমা। দৌড়ঝাঁপ, সারাদিনের সকল ক্লান্তি আর ক্ষুধায় নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়ে সে। অন্য ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ঘুমাতে দিয়ে আসমার শিয়রে গিয়ে বসেন রশিদা বেগম। মেয়ের ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতর হূঁ-হূঁ করে কেঁদে উঠে তাঁর। আজ খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে মেয়েটার সাথে। বাবাহারা ছেলেমেয়েগুলো, কত কষ্ট করে সারাদিন অনাহারে আর অর্ধাহারে দিন কাটে ওদের। নিজের পেটের ছেলে এবং মেয়ে আসমা আর সতীনের এক ছেলে দুই মেয়ে সবাই তাঁরই ভরসায় বেঁচে আছে। রিকশাচালক স্বামী হঠাৎ করেই তাদেরকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে না ফেরার দেশে।

তখন থেকে ছয়-ছয়টি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে একাই হাল ধরেন সংসারের। স্থানীয় একটি ইটের ভাটায় চাকুরি নেন তিনি। বড় ছেলেটি (আসমার সৎ ভাই) মায়ের সাথে জীবন সংগ্রামে নেমে পড়ে। দূরসম্পর্কের চাচাত ভাই ঢাকায় কোন একটা গার্মেন্টসে চাকুরী করে, তার সাথেই চলে আসে ঢাকায়। ১৬৬৬ টাকায় চাকুরি নেয়। এই স্বল্প বেতনে ঢাকা শহরে ভাড়া দিয়ে খেয়েদেয়ে চলাটা খুব কষ্টসাধ্য ছিল। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বাড়িতে টাকা পয়সা পাঠাতে পারত না নিয়মিত। এভাবেই কোনোরকমে দিনযাপন করছিল রাশিদা ও তার পরিবার। অনেক কষ্ট করে স্বামীর ১ম স্ত্রীর বড় মেয়েটিকে বিয়ে দেন তিনি। কিন্তু অনাহারে-অর্ধাহারে কতদিন বেঁচে থাকা যায়? তাইতো ৫ম শ্রেণী পড়ুয়া আসমা বড় ভাইয়ের সাথে ভাগ্যের পরিবর্তনে ঢাকায় চলে আসে। মিরপুরের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকুরি নেয় সে। নিজে খুব কষ্ট করে থাকলেও প্রতিমাসে মায়ের জন্য অল্প অল্প করে টাকা পাঠাতে থাকে সে। কাজে-কর্মে খুব নিষ্ঠা এবং আন্তরিক থাকায় কাজের ফাঁকে

ফাঁকে অবসরে সে মেশিন চালানো শিখে নেয়। কাজের প্রতি তার এই আগ্রহ, সময়নিষ্ঠার জন্য তাকে সাধারন অপারেটর করা হয়। খুশির খবরটি মাকে জানানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে আসমা। ছুটির পর মোবাইলের দোকানে গিয়ে মায়ের সাথে কথা বলে সে। বলে- মা তুই কেমন আছ? হামি ভালো আছুঁ, মা জানস, মুই তো অপারেটর হয়া গেছুঁ, এখন মোর বেতন বাড়ায়া দিব, তুই দোয়া করিস মা- মুই যেন ভালা মত কাম করতি পারি। বেতন পায়া আমি ট্যাকা পাঠায়া দিমু।

কিন্তু এই সুখ বেশি দিন স্থায়ী হলো না। কমপ্লায়েন্সের নিয়মানুযায়ী ১৮ বছর বয়সের নিচে কোন শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানোটা শর্তসাপেক্ষ। কমপ্লায়েন্সের ইস্যু নিয়ে একটা সময় বিদেশি ক্রেতাগণ নানানভাবে ফ্যাক্টরিগুলোতে অডিট এবং ভিজিট করে বিভিন্ন ফাইন্ডিংসের আওতায় ফেলছে। কোন ধরনের শিশুশ্রম করানো যাবে না এটাও তারই একটি অংশ। একদিন প্রতিদিনের মত নিজের কাজ করছিল আসমা। হঠাৎ একজন এসে জানায় তাকে এইচআর সেকশনে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সে এইচআর এ যায়। ম্যানেজার স্যার তাকে জানায়- আসমা আসলে কি জানো, গার্মেন্টসের নিয়ম-কানুন এখন অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। আমরাতো বিদেশিদের কাজ করাই আর বাংলাদেশে শ্রমিকদের জন্য অর্থাৎ তোমাদের জন্য একটি আইন আছে, সেই আইনানুযায়ী যাদের বয়স ১৮ বছর হয়নি তাদেরকে ফ্যাক্টরিতে নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি আছে। তোমাকে তো দেখতে একটু কম বয়সী মনে হয় তাই তোমাকে আমরা আর রাখতে পারছি না। বায়াররা এসে তোমাকে দেখলে আমাদের ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিবে অথবা জরিমানা করবে, তাই কাল থেকে তুমি আর ফ্যাক্টরিতে এসো না।

স্যারের সেই দিনের শেষের কথাগুলো খুব অস্পষ্ট শুনাল তার, পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে যায়। কি বলবে কিছুই বুঝতে পারল না। এইচআর স্যারের কাছে খুব কাকুতি মিনতি করে কিন্তু নিয়মের বাইরে কেউ যেতে পারেনা।

অতএব, যেখান থেকে শুরু আবার সেখানেই ফিরে যাওয়া। সেদিন অফিস থেকে বের হয়ে মায়ের সাথে মোবাইলে কথা হয়, মা রে মা, হামার কি সর্বনাশ হইল। কালকার থনে হামি কামে আর ন জাম, তেনারা বলিছে, হামার বয়স নাহি কম, মোরে রাইখলে নাহি কোম্পানির অনেক ক্ষতি হইবে? এক অজানা আশংঙ্কায় বুকের ভিতরটা মুহূর্তেই যেন কেঁপে ওঠে রাশিদা বেগমের। কিন্তু তারপরও মেয়েকে সান্ত্বনা দেন রশিদা বেগম। থাকুক! তুই মন খারাপ ন করিস, তোর একলার লাগি এত মাইনষ্যের ক্ষতি কেনে হইবে? তুই বাড়িত চলি আ- বললেন রশিদা বেগম। মায়ের কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয় আসমা। আসমা ফিরে আসে তার সেই ছোট্ট মাটির ঘরে। আবারও শুরু হয় দারিদ্র আর ক্ষুধার সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার ব্যর্থ-প্রয়াস। পিতৃহীন গরিব মায়ের সন্তান। তাই ভালো কোনো ঘর থেকে বিয়ের সমন্ধ আসলেও পণের টাকার জন্য অনেকেই ফিরে গেছে। দু-

বেলা দু-মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকাটা যেখানে নিত্যদিনের চিন্তা সেখানে পণ দিয়ে কন্যা বিদায় দেয়ার কথা ভাবাটাও যেন রীতিমত দারিদ্রের সাথে পরিহাস করা। যাইহোক, ঈশ্বরের বুঝি এবার দয়া হলো আসমার প্রতি। অবশেষে পাত্র পাওয়া যায়- পাশের গ্রামেরই ছেলে। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বাউন্ডুলে ছেলেকে হাতে রাখতে কোনোরকম পণ ছাড়াই আসমাকে ছেলের বউ করে নিতে রাজি হলেন আসমার শ্বশুর-শাশুড়ী। কিন্তু ঐ যে দারিদ্র, সে তো পিছ ছাড়েনা। এখন আবার স্বামীর জ্বালা। বাউন্ডুলে বাউন্ডুলেই রয়ে যায়। দিনরাত আড্ডাবাজি, জুয়া খেলা- এইসব করেই কাটায় প্রতিদিন। এভাবেই কাটছে দিন। ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই, পরিস্থিতিকে ভাগ্য মেনে নিয়ে চুপচাপ সব কিছু সহ্য করে যাচ্ছে সে। এরই মাঝে আসমার কোলজুড়ে আসে ফুটফুটে কন্যা সন্তান।

সন্তানের জন্মের পর কিছুটা পরিবর্তন আসতে থাকে তার স্বামীর মাঝে। কিছুটা ঘরমুখো হয়, কিছুদিন ভালো থাকে আবার মাঝে মাঝে পুরোনো আচরণে ফিরে যায়। স্বামীর এই আচরণ আসমাকে দিনে দিনে অসুস্থ করে দিতে থাকে। কন্যা-সন্তানের অনাগত ভবিষ্যৎ আর নিজের ভবিষ্যতকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে এক সময় খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় সে। এতে করে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে যায়। আসমার এই অবস্থা দেখে খুব মায়া হয় তার স্বামীর। নিজেকে পুরোপুরি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয় সে। একদিন আসমাকে কাছে ডেকে পরম আদরে বুকে জড়িয়ে নেয়, মাথায় হাত রেখে বলে- বউ, তুই মেলা ভালারে, মুই তোক্ কত কষ্ট দি, কত জ্বালাও, কিন্তু তুই মোরে কিচ্চু না কঁও, এত ধৈর্য কেন্ তোর? এই তোর মাথায় হাত রেখে কওছুঁ মুই ভালা হয়া যাম, আর জুয়া ন খেলিম, তুই যা কইব মুই তাই হুনিম, তুই মোরে মাফ করি দে। স্বামীর কথাগুলো যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। চোখ ছলছল করছে তার। তুমি কি সত্য কইছো? স্বামীকে প্রশ্ন করে আসমা। সেদিন দুটি মানুষের মধ্যে হয় ভালোবাসার সন্ধি আর হয় ভালো থাকার স্বপ্নবোনা। দুজনেই সিদ্ধান্ত নেয় তারা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করবে আর মেয়ের জন্য গড়ে তুলবে সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। ছোট্ট কন্যা-সন্তানকে মা এবং শ্বশুর-শাশুড়ির হাতে তুলে দিয়ে দু'জনেই চলে আসে ঢাকায়। ফুফাত বোনের আশ্রয়ে আসে সাভারে। অবশেষে ব্যাবিলনে ঠাঁই হয় স্বামী-স্ত্রী দু'জনের। ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেডে কাটিং সহকারী হিসেবে চাকুরি হয় আসমার স্বামীর, আর অবনী ফ্যাশনস্ লিমিটেড এ সহকারী অপারেটর হিসেবে কাজ নেয় আসমা। ফ্যাক্টরির কিছু দূরে একরুমের একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে মনের মতো সংসার সাজায় আসমা। এ যেন স্বর্গ, আর এরই নাম যেন বেঁচে থাকা। বেশ ভালোই কাটছিল কপোত-কপোতির সুখের সংসার। প্রতি মাসে সব খরচ করে কিছু টাকা জমাতে থাকল তারা। কয়েকমাসে মোটামুটি ভালো টাকা জমা হলো। কিন্তু ঐ যে কথায় আছে- কয়লা ধুলে ময়লা যায় না, আর স্বভাব যায় না মরলে। কয়েকদিন পর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকে আসমার স্বামী। কিছুদিন পর আসমার অনুরোধে আবার চাকুরি নেয় ব্যাবিলন ট্রিমস্ এ। এবার একটু হাপ ছেড়ে বাঁচে সে। কিন্তু আবারও কয়েকদিন পর সেখান থেকেও চাকুরি ছেড়ে দেয়। আসমার একার উপার্জনে সংসার চলছে কোনোরকম। মেয়ের জন্য

টাকা পাঠানো, মায়ের হাত খরচ, বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির খরচ, ঘরভাড়া সবই চলে আসমার আয়ে। কিন্তু এভাবে আর কত দিন? স্বামীকে এত করে বোঝায়, কিন্তু কোন কাজ হয় না। কী হবে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ, কীভাবেই বা বেঁচে থাকবে? এইসব চিন্তায় ঠিকমত কাজ করতে পারে না আসমা। সারাক্ষণ শুধু অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে সে।

আসমা খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে। নিজের কষ্টগুলো নিজের ভিতরেই রাখে। কাউকে কিছুই জানতে দেয়নি ও। আসমার আশেপাশে যারা কাজ করত তারা কিছুটা জানত তার অবস্থার কথা। একদিন তার পাশের একজন অপারেটর আসমাকে বলে, আসমা, তোর জামাইয়ের কথাতো সবই জানি, আমার পরিচিত একজন আছেন, তার একটা নতুন অটোরিক্সা আছে, হে কয়দিন চালাইছে, এখন ঐটা বেইচা দিব, তোর হাতে যদি নগদ ট্যাকা থাকে, আর তুই রাজি থাইকলে আমি হের লগে কথা কইতে পারি। প্রস্তাবটি মন্দ লাগে না তার কাছে। কিন্তু সাহসও পায় না। ভাবে- হাতত নগদ টাহাতো কিছু আছে কিন্তু মোর জামাই তো মানুষ ভালা না, হে কি ঠিকমত গাড়ি চালাইবো? অনেক প্রশ্ন জাগে তার মনে। তার স্বামীতো বলে তার নাকি চাকুরি করতে ভালো লাগে না, স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায় সে। হয়তো এই প্রস্তাবটি তাঁর ভালো লাগতেও পারে। রাতে খাবারের পর স্বামীকে বিষয়টি জানায় সে। নিমিষেই রাজি হয়ে যায় তার স্বামী। পরের দিনই নগদ ৭০,০০০/= (সত্তর হাজার টাকা) এবং ১০,০০০/= (দশ হাজার টাকা) বাকি রেখে অটো-রিক্সা কিনে দেয় স্বামীকে। কিন্তু রিকসার কোন কাগজপত্র তারা দেয় না। তাদের কথা হলো পুরো টাকা পরিশোধ করে দেয়ার পর কাগজপত্র দেয়া হবে। তারপর শুরু হয় আরেকটি নতুন জীবন। নতুন করে স্বপ্ন দেখা, স্বপ্নের জালবোনা। শক্ত হাতে অটো রিকসার স্টিয়ারিং ধরে রাস্তায় নামে আসমার স্বামী। চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক আর পাহাড় সমান স্বপ্ন। প্রতিমাসে কিছু কিছু করে বাকি টাকা পরিশোধ করতে থাকে তারা দু'জন মিলে। দু'জনে মিলে পরিকল্পনা করে, গাড়ির টাকাটা পুরোপুরি পরিশোধ হয়ে গেলে বড় দেখে একটা ঘর ভাড়া করবে। শ্বশুর-শাশুড়ি এবং মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে, সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকবে। এমনই নানারকম সুখস্বপ্ন নিয়ে ভালোই কাটছিল আসমার সংসার। আসমার স্বামী ওকে বলে, বউ মোর বড় শখ- তোক্ একদিন মোর গাড়িতে বসায়া ঘুরাইতে লই জামু। আসমা লাজুক হাসি দেয়- ইশ্! মরণ! দেনা শোধ না হইল্ মোরে গাড়িতে ঘুরাইবার খাওশ হইছে? মনে মনে খুব খুশি হয় আসমা কিন্তু স্বামীকে কথাগুলো শোনায় সে। স্বামীর ইচ্ছাপূরণ করতে একদিন বৃহস্পতিবার অফিস থেকে ফিরে স্বামীর পাতে ভাত দিতে দিতে বলে-তুমি না মোরে ঘুরতি লই যাইবা? কাইলতো বন্ধ, নিবা মোরে....। পরের দিন সকাল সকাল স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে ঘুরতে বের হয়। খুব শখ করে গাড়িতে সাউন্ড বক্স লাগায় আসমার স্বামী। গান শুনতে শুনতে সারাদিন ঘুরে বেড়ায় দু'জনে। দুপুরে খুব ছোট একটি দোকানে খাবার খায় তারা।

আসমার এত সুখ এবং এত স্বপ্ন বুঝি বিধাতার পরিকল্পনায় ছিল না। অফিস থেকে ফিরে যথারীতি রান্না করে সংসারের আনুসঙ্গিক কাজগুলো সেরে স্বামীর অপেক্ষায় বসে থাকে আসমা। পাশের ঘরের ভাবির কাছে গিয়ে কতক্ষণ গল্প করে। রাত নয়টা বেজে গেল তখনও তার স্বামী ফিরে না। সারাদিনের ব্যস্ততা আর ক্ষুধায় খুব অস্থির লাগছে তার। আবার স্বামীর না ফেরাটাও কেমন যেন বুকের ভিতরটায় মোচড় দিয়ে আসছে। সারারাত স্বামীর অপেক্ষায় থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে আসমা। প্রতিদিনের মত সেইদিনও খুব সকালে ঘুম ভাঙে। রান্নার জন্য চুলায় সিরিয়াল ধরতে হয়, তাই খুব ভোরেই রান্না বসিয়ে গোসল সেরে নেয়। একরাশ দুঃশ্চিন্তা মনে নিয়ে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয় সে। পা যেন চলছে না, কি এক অজানা আশংকায় মনটা উতলা হয়ে আছে। কই আছে মানুষটা? কোন অঘটন ঘটিছে? মোর এত কষ্ট ক্যান্ লাগিছে? এমনই হাজারো প্রশ্ন করতে থাকে নিজের মনকে।

অফিসের খুব কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ে এক জায়গায় একসাথে অনেকগুলো মানুষ জটলা করে আছে আর বিভিন্নরকম কথা শোনা যাচ্ছে। আহারে! কোন্ মায়ের বুকের মানিক, কোন্ সময় মরছে কে কইব? মাথা খান থেতলা হয়া গেছে- এমনই নানা ধরনের কথার কলরবে সয়লাব হয়ে আছে জায়গাটি। কথাগুলো কানে যতই যাচ্ছে, ততই যেন হাত পা সব অবশ হয়ে আসছে তার, কণ্ঠ যেন শুকিয়ে আসছে, দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে বুকটা। হামার এরাম কেনে লাগে? ও আল্লাহ্, তারে তুমি দেখেন- এভাবেই অজানা আশংঙ্কায় সৃষ্টিকর্তার কাছে স্বামীর সুস্থতা কামনায় আকুতি করছে। কিন্তু না...! বিধাতা বুঝি তার শেষ খেলাটা খেলেই ফেললেন। নিজের মনের অজান্তেই অনেক মানুষের ভিড় ঠেলে ভিতরে চলে যায়, সেখানে গিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না আসমার। ও আল্লাহ রে... আল্লাহ মোর কি হইল্, তুমি মোর লগে এ কোন্ খেলা খেলিলা... স্বামীর বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে প্রচণ্ড আর্তনাদ করতে থাকে সে। ওগো তুমি মোরে ছাইড়া ন যাও, মোরে একলা রাইখা কই যাইবা তুমি- বিভিন্ন করুণ কথায় বিলাপ করছে একনাগাড়ে। আসমার আত্মচিৎকারে সেদিন ভারি হয়ে ওঠে পদ্মার মোড়ের আকাশ। ওর বুকফাটা আর্তনাদে থমকে দাঁড়ায় পথচারীরা। পাষাণেরও চোখেও সেদিন ঝরে পড়ে বিষাদের অশ্রু। তার চিৎকার যেন অনেক দূরে গিয়ে আবার ফিরে ফিরে আসছে পদ্মার মোড়ে।

...এখানেই থেমে যাবার কথা ছিল আসমা নামের মেয়েটির জীবনচক্র। কিন্তু না .., আসমা থেমে থাকেনি। অসহায় আসমাকে আরও বেশি অসহায় করে পুরোপুরি ভেঙে দিতে চায় কিছু লোভী মানুষরূপী পশু। যাদের কাছ থেকে অটোরিক্সা কেনা হয়েছে, তারা এসে ক্ষতিপূরণ দাবি করে, বেমালুম অস্বীকার করে তাদেরকে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার টাকা) দেয়া হয়েছে। নীরবে সব অন্যায়কে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ওর নেই। আর ওর হয়ে প্রতিবাদ করার মতোও কেউ নেই। তবুও সে বেঁচে আছে নতুন সূর্যোদয়ের আশায়। স্বামীর রেখে যাওয়া শেষ সম্বল একমাত্র কন্যা-সন্তানটিকে ঘিরেই এখন তার সব

স্বপ্ন, সব আশা। স্বপ্ন দেখে মেয়েকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়ে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার, নিজের সকল অপূর্ণতা যেন মেয়েকে ছুঁতে না পারে সেই স্বপ্নই দেখে প্রতিনিয়ত। আসমার স্বপ্ন কখনো সত্যি হবে কি না জানি না, হয়তো হবে, হয়তো না...

এ গল্প শুধু আসমার নয়, এই গল্প অথবা এর চাইতেও অনেক বেশি হৃদয়স্পর্শী জীবনযুদ্ধের সংগ্রামে লড়াই করে বেঁচে আছে পোশাকশিল্পে কর্মরত মেহনতি শ্রমিকেরা। এদের বেশিরভাগই জীবনের কোনো না কোনো সমস্যার কারণে অথবা ভালোভাবে বেঁচে থাকার আশায় পোশাকশিল্পে কাজ করে। স্বামী পরিত্যক্তা নারী, যার স্বামী সন্তান জন্ম দিয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে (অন্য কোথাও বিয়ে করে) অথবা গ্রামের সহজ সরল বাবা মায়ের অবাধ্য ছেলে অথবা কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার আদরের মেয়েটি... এরা সবাই আজ পোশাকশিল্পের প্রাণ, দেশের ও দশের সম্পদ। তারা একদিকে যেমন নিজেদের জীবনের গতিকে পরিবর্তন করতে সদা ব্যস্ত, তেমনি উন্নতির উচ্চস্তরে নিয়ে যাচ্ছে দেশকে।

একজন ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে এইসব মেহনতি শ্রমিকদেরকে খুব কাছ থেকে দেখবার, বুঝবার এবং জানবার সুযোগ হয়েছে। জীবনের অনেক উত্থান-পতন পেরিয়ে ওরা বেঁচে থাকার সংগ্রামে টিকে থাকতে সদা প্রস্তুত। ওদের জীবনযাপনে এসেছে অনেক পরিবর্তন- ওদের পোশাক, ব্যবহার, আচরণ সবকিছুই এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ। আধুনিক জীবনের সাথে তাল মিলাতে চায় ওরা। অনেকে নিজের টাকায় গ্রামে বাড়িও করেছে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে ওদের সন্তান-ভাই-বোনেরা। আমাদের কোম্পানি শ্রমিকদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে, সুচিকিৎসার জন্য দরিদ্র সহায়তা তহবিল করেছে এবং এছাড়াও সম্প্রতি ব্যাবিলন গ্রুপ তাদের অনেকগুলো মহতী কর্মসূচীর পাশাপাশি নতুন একটা কর্মসূচী চালু করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভীষণ গরিব এবং অসহায় শ্রমিকদের খুব কাছ থেকে জানতে তাদের কয়েকজনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। দেখেছি পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের সেই আসমানীদের। মানুষ যে কতটা কষ্টের মাঝে থাকতে পারে তাদের বাড়িতে না গেলে বিশ্বাস হতো না। কুঁড়ে ঘর না হলেও শহরের ছোট ছোট ইটের ঘরগুলো তার চাইতেও দম বন্ধ করা অবস্থা। সেই ছোট্ট ঘরটিতে কোনো আসবাবপত্র নাই, নাই কোনো জানালা, তবুও সেই ঘরের জন্য দিতে হয় ১৫০০-২৫০০ টাকা ভাড়া। দু'চারটি বালিশ, কাপড় রাখার জন্য ঘরে টানানো একটি দড়ি, যারা একটু বেশি বেতন পায় তাদের কারো কারো ঘরে একটি ছোট চৌকি, একটি র‍্যাক এই হলো ওদের আসবাবপত্র। ওদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে নিজের অজান্তেই দু'চোখ ভিজে ওঠে। তবুও ওরা হাসে। আসমা, নালো, নাহার, নাজমা, ফেন্সি এবং শিখা রানীরা হার মানেনি নিয়তির কাছে বরং নিয়তিকে ওরা জয় করেছে। উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে ওরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ওরা সবাই বলে একবাক্যে- ভালো আছি, অনেক ভালো- গার্মেন্টস না থাকলেতো এটুকুও থাকতাম না। ওরা ভাঙবে কিন্তু মচকাবেনা, ওরা মাথা নোয়াবেনা কারো কাছে...

‘আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব বিজয় কেতন,
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া, স্বর্গ মর্ত করতলে...’

শত কষ্ট, শত অপমান, শত ঝড়-ঝঞ্ঝা, শত বাধা... এরই মাঝে হেসে খেলে কাজ করে বেঁচে থাকে ওরা এবং ওদের মতো লাখো শ্রমিক। মজার বিষয় হলো- ওদের মধ্যে আবার অনেক প্রতিভাসম্পন্ন শ্রমিক আছে যারা সুন্দর গান গাইতে পারে, সুন্দর নাচতে পারে। কান্নাকে কীভাবে হাসিতে পরিণত করতে হয় এটা ওরা জানে। ওরা বারবার ভাঙে আর বারবার গড়ে।

ওরা ছুটে চলে তেপান্তরের মাঠের পানে, রাতের শেষে সোনালী সকালের আশায়, কারণ ওরা জানে- মেঘের ওপারে আছে নীল আকাশ- ঐ তেপান্তরের মাঠের উপরে।

হামার ছওয়াটা মানুষ হইবে

কাজী এ এম তুষার আলম
এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর এন্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ।

নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের সামনে অপেক্ষমান আমি ও আমার চাচাত ভাই রুবেল, পাশেই অপেক্ষমান আমাদের বাহন অকটেন চালিত দ্বিচক্রযানটি। আমার অপেক্ষা করার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে কিন্তু রুবেল সামান্যই জানে বিষয়টা নিয়ে। এক ধরনের রোমাঞ্চ কাজ করছিল আমার মনে। এ ধরনের যাত্রা আমার প্রথম নয়। তবুও মনের মধ্যে কৌতূহলের শেষ নেই। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটল। ম্যাজেন্টা রঙের টি শার্ট ও সাদামাটা একটি প্যান্ট পরে ১৭ বছর বয়সী এক কিশোর এসে আমাকে সালাম জানাল। সালামের উত্তর দিতে দিতে তার দিকে আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। শীর্ণ চেহারার মজনু মিয়ার চোখ দু'টোর ঔজ্জ্বল্য তার প্রকৌশলী হবার অদম্য ইচ্ছেটাকে ব্যক্ত করে স্পষ্টভাবে। কোনোরকম সময় অপচয় না করেই তাকে নিয়ে রওনা দিলাম তার বাড়ি পশ্চিম বেরুবাড়ির উদ্দেশে, খুব বেশি দূরে না, দুই কিলোমিটার রাস্তা হবে। আর কিছুদূর এগুলেই তাদের প্রিয় বেরুবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এবং তারপরেই দুধকুমার নদী সীমান্তের প্রায় কাছ ঘেঁষে। আরও একটু এগুলেই বানরভিটার ফেলানীর বাড়ি। হতভাগা কিশোরীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস এখনো মানুষকে শিহরিত করে।

ঈদ আসে একরাশ আনন্দ নিয়ে। এ আনন্দের টানে আমরা ঘরমুখো হই স্বজনের সাথে ঈদের আমেজটা বিনিময় করতে। ঈদের দিন বাড়ির স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের সাথে সময় ব্যয় করে ঈদের পরের দিন ১৩৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গেলাম এই কিশোরদের সাথে ঈদ আনন্দ ও কুশল বিনিময় করতে। এই কিশোরদেরই একজনের নাম মজনু মিয়া। আমি অবাক হলাম, তার বাড়িতে ঈদের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখতে পেলাম না। মজনু মিয়ার মা বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁর মজুরীর টাকা সংগ্রহ করছে। তাঁরই কুড়েঘরে সেলাই করা কাপড় পরে উক্ত গ্রামের কিছু কিশোরী, যুবতী ঈদ আনন্দে মত্ত। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ পথে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক রিক্সার প্যাডেল থেকে নেমে সালাম জানালেন, আমি মজনুর বাবা। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না ভদ্রলোকের পেশা। তিনি যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে আমাদের একখানা ঘরে বসতে দিলেন। বিদ্যুৎ নেই তবুও যেন আলোর অভাব নেই। ঘরের চতুর্দিক দিয়ে অসংখ্য ছিদ্র যেখান দিয়ে আলো অবলীলায় প্রবেশ করছে। বিছানায় বসতে বসতেই নজর পড়ল একখানা টেবিলের উপরে দু-একখানা বই ও গুটিকয়েক হাড়ি-পাতিল। সবমিলে যে এগুলোই তাদের সম্পত্তি, এগুলোই তাদের সম্পদ। রোদের আলোর কণাগুলো

পরম মমতায় চুম্বন একে দিয়ে যাচ্ছে ঘরে থাকা সম্পদগুলোকে। রুবেল যেন খানিকটা হতাশ হলো। বিন্দুমাত্র বিশ্বাস হচ্ছিল না এতদূর আসার পর এই রকম একটি বাড়িতে এসে উঠব। ওর মুখ ফসকে একটি লাইন বেরিয়েই গেল, এইখানে কী! আমি একটি মুচকি হাসি দিয়ে বললাম- একটু অপেক্ষা কর, সব বুঝতে পারবি।

নীলফামারী থেকে যাত্রা শুরু করার সময় রুবেলকে শুধু বলেছিলাম, নাগেশ্বরীতে দু'জন ছাত্রের সঙ্গে দেখা করব। রুবেলের আয়োজনের যেন কমতি নেই। সানগ্লাস, পানি, সামান্য খাবার, বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য রেইনকোট ইত্যাদি ইত্যাদি। দু'পাশের বৃক্ষরাজি চিরে আমরা যখন নীলফামারী-রংপুর হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন চোখে পড়ল ছোট ছোট পিকআপগুলোতে শিশু-কিশোরের ঈদ উল্লাস, চিৎকার, চেচামেচি। পথিমধ্যে দু'একটা দুর্ঘটনাও আমাদের চোখে পড়ল। খানিক পরেই স্বস্তি পেলাম হাইওয়ে পুলিশবাহিনী এসব পিকআপগুলোকে আটক করে রাখছে হাইওয়ের পরিবেশ রক্ষা করার জন্য। ঈদ উল্লাস করা ভালো, কিন্তু এমন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ উল্লাসের পরিণতি ভালো নয় বলে আমাদের মনে হলো, কারণ এতে জীবনের ঝুঁকিও থাকে। পথিমধ্যে পুলিশভাইদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাশের ডোবায় কিছু পদ্মফুল ও ফড়িংয়ের উপর ফটোগ্রাফিও করলাম। খুবই স্বাভাবিক, ফটোগ্রাফির এই অভ্যাসটা হয়েছে ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাবের জন্য। এই নিয়ে আমি বেশি কিছু লিখলাম না কারণ এখন পর্যন্ত ফটোগ্রাফিটা ঠিকমতো আত্মস্থ করে উঠতে পারিনি। শুধু ছবিই তুলে যাচ্ছি।

রংপুরে এসে সামান্য বিশ্রাম নিলাম। খুবই অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিলাম রুবেলের এই ব্যাগভর্তি আয়োজনকে, কিন্তু দেখলাম এটা কাজে লাগছে বেশ। ক্ষিধে সামান্য মিটিয়ে রওনা হলাম কুড়িগ্রামের উদ্দেশে। গুগলের দেয়া তথ্যমতে আরো ১ ঘন্টা ২৮ মিনিট সময় লাগবে কুড়িগ্রাম যেতে। রুবেল খানিকটা হতাশ হলেও তার ভালোই লাগছে ভ্রমণটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বহুল আলোচিত তিস্তা নদীর সেতু। এখানে কিছুক্ষণ না দাঁড়ালেই নয়। সেতুর পশ্চিমে বয়সের ভারে ন্যুব্জ বেইলি ব্রীজটি এখনও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেল চলাচলের জন্য। থাঙ্গু, ইয়মথাঙ্গু এবং দোখনা পর্বতমালা থেকে উৎপত্তি হয়ে তিস্তা কাংশেতে এসে তিস্তা নাম ধারণ করে রংপ, দার্জিলিং-পশ্চিমবাংলার সীমান্ত ধরে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দহগ্রাম হয়ে বাংলাদেশে তিস্তা নামেই প্রবেশ করে। তিস্তায় পানি কমে যাওয়া দেখে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতকে দুয়োবাদ দেয়া ছাড়া আমাদের যেন কিছুই করার নেই। পাশেই হেঁটে যাওয়া একজনকে শুধালাম-
-ভাই পানি কতদূর পর্যন্ত বাড়ে।
-সরকার জানে।
হাঃ হাঃ করে হাস্যধ্বনিও শুনতে পেলাম পাশের এক লোকের মুখে। আমাদের আর বলার কিছু থাকল না।

আবারো কিছুক্ষণ ফটোগ্রাফি করে রওনা দিলাম গন্তব্যের উদ্দেশে। কিছুদূর আসার পরেই

মনে হলো আমরা হাইওয়ে ছেড়ে বাইপাস রাস্তা দিয়ে গেলে ১৫ কিলোমিটার রাস্তা কমবে। অথচ লালমনিরহাট পাটগ্রাম হাইওয়ে দিয়ে গেলে তিস্তার আরেক শাখা সতী নদীর দেখা মিলবে। লোভ সংবরণ করে রাস্তা কমানোর উদ্দেশ্যেই লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম বাইপাস রাস্তায় নেমে পড়লাম। সিঙ্গের ডাবরিতে ঝমঝম করে বৃষ্টি আসলো। রেইনকোট গায়ে দিয়ে আবারো রওনা দিলাম আর রুবেলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখ দু'টো ভরে গেল। টোগরাইহাট পৌঁছানোর পর একপাশে রেলপথ, আরেকপাশে সড়কপথ। পাশাপাশি দুই পথেই অসংখ্য গাছগাছালি ও পানি ভর্তি নিচু জমি চিরে পৌঁছালাম রাজারহাট। অন্যরকম রূপ-সৌন্দর্যে ভরপুর কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাটে পানিতে তলিয়ে যাওয়া নীচু জমি দেখে একটু সংশয় হলো। ফসলি জমিগুলো পানির নীচে তলিয়ে আছে, সামনেই আশ্বিন-কার্তিক মাস (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর) যখন আমন ধানের উৎপাদনের সময়। বুকে আশা বেধে রাখলাম নিশ্চয়ই পানি অতি শীঘ্রই নেমে যাবে। যদি এ সময় যথেষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপাদন না হয় তাহলে গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী এবং রংপুরের কিছু কিছু অঞ্চলে শস্যাভাব দেখা দিলে অভাব অর্থাৎ মঙ্গার উৎপত্তি হয়। তিস্তাতে পানিবণ্টনটাও ঠিকমতো হয় না এখন আর। কখনো কখনো তিস্তার বুকে ছেলেদের ফুটবল খেলতেও দেখেছি। আবার পরের দিন অথৈ পানি দেখেছি গজলডোবা তোতা বাঁধের কল্যাণে। যাহোক, অতশত চিন্তা না করে প্রকৃতির বৈচিত্র্যটাকে উপভোগ করতে থাকলাম আর মাঝে মাঝেই কিছু সেলফি নিলাম। ডানদিকে কুড়িগ্রাম-চিলমারী হাইওয়ে এবং সোজা কুড়িগ্রাম-ভুরুঙ্গামারী রোড। মনে পড়ে গেল সেই বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান-

ওকি গাড়িয়াল ভাই
হাকাও গাড়ি তুই চিলমারী---।

ভাবতে ভাবতেই পৌছে গেলাম ধরলা নদীর সেতুতে। তিস্তা সেতুর অবিকল কারুকাজে গড়া এই সেতুটি। খুবই অবাক হলাম যখন দেখলাম এখানে বিশাল এক এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে ধরলা রিসোর্ট। ভারতে ধরলারা নামধারী নদীটি অতটা প্রশস্ত না হলেও বিস্তৃতি দীর্ঘ। সিকিমের কুপুপ ও বিতাং লেক থেকে জলঢাকা নদী এবং নেওরাভেলি জলপাইগুড়ি থেকে মূর্তি নদীর উৎপত্তির পরে মিলিত স্রোতে জলঢাকা নাম ধারণ করে অতঃপর ধরলারার সাথে মিলিত স্রোতে সিংঙ্গিমারি, ফুলেশ্বরী এইসব নাম ধারণ করে বাংলাদেশে ধরলা নামেই প্রবেশ করে।

রুবেলের ঈদ আনন্দ যেন বহুগুণ বেড়ে গেছে। সে মাঝে মাঝেই আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে মোটেও ভুল করছে না সাথে করে কুড়িগ্রাম নিয়ে আসার জন্য। মজনু মিয়ার বাড়িতে বসে তার হতাশার কারণ বুঝতে আমার আর বাকি রইল না। আমি তার দিকে চেয়ে আর বিশেষ কিছু না বলেই চলে গেলাম মজনু মিয়ার বাড়ির পিছনে অত্যন্ত অবহেলায় দাঁড়িয়ে থাকা দোকানঘরটিতে। মজনুর মা দিনান্ত পরিশ্রম করেন স্বল্পপুঁজির এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিতে। তাঁর চোখে মুখে আনন্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল ছেলের শিক্ষার নিশ্চয়তা নিয়ে। মাঝে মাঝেই আমাদেরকে ধন্যবাদ দিতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি ভদ্রমহিলা। ছেলের

পড়াশোনায় যাতে কোন ক্ষতি না হয় তাই তিনি ছেলেকে রেখেছেন দুই কিলোমিটার দূরে কলেজের কাছাকাছি একটি মেসে। বাবা-মা দুজনেই অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন ছেলেকে শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য।

এ বছর এপ্রিলে আমার প্রথম সুযোগ ঘটে অদম্য মেধাবী আর নিরন্তর সংগ্রামী মানুষগুলোর অন্দরের সংগ্রাম চিত্র দেখবার। নীলফামারীর সিদ্দিকুর ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। একই ঘরে এক পাশে গরু, আরেক পাশে সিদ্দিকুর রহমানের পড়াশোনার টেবিল। মা-হারা এই কিশোরটি বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত সংগ্রাম করে। তার সৎমা গৃহিনী ও বাবা একটি গ্রাম্য মসজিদের খাদেম। তার মা ও বাবা শুধু ভালোবাসাটাই দিতে পারেন সন্তানের জন্য এর বেশি কিছু নয়। তাদের এই ভালোবাসাটাও অমূল্য তার জন্য। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি বেশ আগ্রহ থাকায় পড়াশোনা থমকে যাওয়ার এতটুকু সুযোগ দেয়নি এই কিশোরটি। পড়াশোনা করাটা তার জন্য ছিল বেশ দুরূহ। ছেলেবেলা থেকেই পরের বাড়িতে লজিং মাস্টার হিসেবে কাজ করে খাবার, আবাসন ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করেছে সে নিজেই। তার পরিশ্রমের মূল্য হিসাব করার মতো দুঃসাহস আমার নেই। তার গ্রামে স্কুল আছে কিন্তু কলেজ নেই। দূরবর্তী নীলফামারী কলেজে পড়াশোনা করতে গেলে যে খরচ হবে তার যোগফল মেলাতে গেলেই সিদ্দিকের চোখ যেন কপালে উঠে যায়। সে বুঝতে পারে তার সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই। তারপরও তাকে আমি এতটুকু হতাশ হতে দেখিনি। তার মা আশির্বাদের বান ছুড়ে দিলেন আমার দিকে। কারণ একটাই, যখন তারা কোনো উপায়ন্তর দেখছিল না এমনই সময় আমরা শিক্ষাবৃত্তির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এই কিশোরটির প্রতি। সিদ্দিকের আপাততঃ পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না এই তাদের প্রশান্তি। সিদ্দিকের মা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "হামার ছওয়া পড়াশোনা করি বড় অফিসার হইবে।"

সাবলীল উচ্চারণে সিদ্দিকুর তার জীবনী বলছিল আমার কাছে। আমি লক্ষ্য করলাম তার ঠোঁটের কোণায় এক চিলতে হাসি। যে হাসির অর্থ- এত সহজে হার মানব না। পড়ন্ত দুপুর বেলায় বাড়িতে কোনো খাবারের যোগান না দেখে তাকে চেপে বসালাম আমার দ্বিচক্রযানে। উদ্দেশ্য কোনো হোটেলে আমরা খাওয়া সেরে রওনা হব আরেক ছাত্র আল-আমিনের বাসায়। বড় তৃপ্তির সাথে সিদ্দিকুর খাচ্ছে মাছ-মাংস যা পাচ্ছে সবই। অশ্রুসজল হওয়া থেকে নিজেকে অতি সাবধানে সংবরণ করলাম। আমার এ লেখনিতে খুব সামান্যই বিবরণ দেয়া সম্ভব তাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনের সাথে যুদ্ধ করে পড়াশোনা চালিয়ে যাবার সামর্থটাকে। আল-আমিন মাতৃবিয়োগের পরে বোনের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছে। আল-আমিনের দুলাভাই এক অজপাড়াগাঁয়ের সামান্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। জানতে পারলাম, আল-আমিনকে পড়াশোনার সাহস যুগিয়েছে তার দুলাভাই। ফেরার সময় তাই ভদ্রলোককে আমি ধন্যবাদ দিতে এতটুকু কার্পণ্য করিনি তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য। আবারো একবার তাঁকে সালাম জানালাম। তিনিও সিদ্দিকুরের মায়ের মতো একই আশা প্রকাশ করলেন ছেলেপ্রতীম শ্যালককে নিয়ে।

মজনু মিয়ার মায়ের দোকানের খবর নিতে নিতেই আগমনবার্তা শুনলাম মোর্শেদ আলমের বাবার। মজনুর বাড়ির কাছাকাছিই মোর্শেদের বসতভিটা, তার বাবা একজন পান দোকানদার। তাদের স্কুলের পাশেই তার ছোট্ট দোকান। মজনু মিয়ার সাথে একই কলেজে অধ্যয়নরত মোর্শেদ। মোর্শেদের বাড়িতে যেয়ে দেখলাম একই চিত্র। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রয়োজনের পাশাপাশি একটি জিনিস প্রয়োজন না থাকলেও সব সময় তাদের পাশে থাকে অভাব নামক এই দ্রব্যটি। মোর্শেদের মা দিনান্ত পরিশ্রম করেন হাঁস, মুরগী, গরু পালন করে ছেলে ও মেয়ের পড়াশোনার খরচ যোগাতে। আমার এ ধরনের যাত্রায় সামান্য যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে তা দুর্মূল্য।

ভাই এই গরুটার দাম কত?
চল্লিশ হাজার টাকা- বিক্রেতা উত্তর দিলেন।
ভাই একজন দরিদ্র মানুষকে গরুটি বাছুরসহ দান করব এক কোম্পানির পক্ষ থেকে। গরীব মানুষ দোয়া করবে। এরকমভাবেই দরদাম চলছিল পলাশবাড়ির নতুন গরুরহাটে। আমার সাথে পাতানী খালার ছেলে। পাতানী খালার মেয়ে মোর্শেদা অবনী নীট ওয়্যারের (ব্যাবিলন গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) শ্রমিক। অনেক দরদামের পর আমরা একটা সমঝোতায় পৌঁছে গরু ও বাছুর নিয়ে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশে। পথিমধ্যে পাতানী খালার ছেলের হাকডাকের শেষ নেই। বাড়িতে পৌঁছে অর্ধ-শতক জমির উপর কুঁড়েঘরটায় কোথায় থাকবে এই প্রাণীটি কোথায় আর থাকবে এই পরিবারের সদস্যগুলো, এ নিয়ে সমাধান দিলেন পাতানি খালা নিজেই। তার রান্নাঘরের অর্ধেক অংশে বাছুরসহ গরুটির আশ্রয় মিলল। মোর্শেদার মেয়ে নানীর কাছে থাকে যাতে পড়াশোনা করতে পারে। পাতানী খালা গরু-বাছুর পেয়ে যারপরনাই পুলকিত। সাথে সাথেই মোর্শেদাকে ফোন দিয়ে জানিয়ে দিলেন নাতনীকে নিয়ে চিন্তা না করতে। তাদের এই আনন্দে আমারও চোখের কোণে ২/ ৪ ফোঁটা মুক্তোদানা খিলখিল করে হাসতে থাকে চিবুকে লেপ্টে যাওয়ার জন্য। এখন আমি অনেকটা অভ্যস্ত তাদের এই সাধারণ আবেগে বলা বাক্যগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে।

রাশিদা খালার স্বপ্ন আরো অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর বাড়ি পীরগঞ্জ থানার খালাসপীর ইউনিয়নে। রাশিদা খালার মেয়ে আসমা অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড (ব্যাবিলন গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) এর শ্রমিক। রাশিদা খালা তাঁর মা এবং আসমার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে উক্ত অঞ্চলে বাস করেন। আসমা তার মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব মায়ের উপর ছেড়ে দিয়েছে। রাশিদা খালার বাড়িতে আমার দু'বার যাওয়া হয়েছিল। প্রথমবার গাভি পরিদর্শন করতে এবং দ্বিতীয়বার তার উত্তরোত্তর উন্নতি দেখতে। বাড়িতে ঢুকতেই চমৎকার করে দোআঁশ লেপনে চাদর বিছানো উঠোন থেকে ঘর পর্যন্ত। গাভীটি এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে ও বাছুরটি ইচিং বিচিং খেলায় ব্যস্ত। রাশিদা খালার কুঁড়েঘরটি এখন আর কুঁড়েঘর নেই। ইট দিয়ে এটি এখন দশ ফুট বাই দশ ফুট একটি পাকা ঘর। তাঁর নাতনী নিয়মিত স্কুলে যায় এবং সে ভালোই পড়াশোনা করছে। রাশিদা খালার ইচ্ছে নাতনী শিক্ষিত হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবে। নাতনিকে সর্বোচ্চ শিক্ষিত করার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি দু'হাত

ভরে আশির্বাদ করলেন গাভি দান করার জন্য। তিনি দৃঢ়ভাবে বলে উঠলেন- মোর নাতনী তোমাক ছাড়ি যাইবে, আরো বড় অফিসার হইবে, দোয়া করেন বাবা। তার এই সরল উক্তিটি আমাকে ছুঁয়ে দিল। আমি আসমার মেয়েকে অনেক আশির্বাদ করলাম।

সিদ্দিক বিএসসি। হ্যা, ভদ্রলোক এই নামেই পরিচিত। তাঁর সাথে দেখা না করলে যেন পুরো সফরটাই বৃথা। তাঁর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও যোগাযোগ ঠিক করা গেল না। দেখা মিলল মাহবুব স্যারের যিনি এই সিদ্দিক বিএসসি স্যারের সাথেই শিক্ষকতা করেন। মাহবুব স্যার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন- সিদ্দিক বিএসসি'র আত্মত্যাগের কথা। ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পে দু'জন ছাত্রকে নিয়ে সিদ্দিক বিএসসি এসেছিলেন বৃত্তির সাক্ষাৎকার দিতে। সাথে আরো দু'জন ছাত্র ছিল যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। কোনো এক ফাঁকে আবিদ স্যারের (পরিচালক, ব্যাবিলন গ্রুপ) নজর পড়ল ভদ্রলোকের উপর। আবিদ স্যার আমাকে জানালেন, এই ছাত্র দু'জনের শিক্ষক সিদ্দিক বিএসসি'র সাথে কথা বলবেন। আবিদ স্যারের সাথে সিদ্দিক বিএসসি'র কথপোকথনের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। সিদ্দিক স্যারের সাবলীল উত্তর দেখে আমি অভিভূত হলাম। তিনি তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেন যাতে তারা নিজেদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে ঐ গ্রামের নাম উজ্জ্বল করতে পারে। পশ্চিম বেরুবাড়ির যত জনের সাথেই কথা বলেছি সবারই একই কথা। সিদ্দিক বিএসসি'র মতো মানুষ হয় না। অজপাড়াগাঁয়ের এই গ্রাম থেকে কিছু ছাত্র-ছাত্রী আজ বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে ভাবতেই ভালো লাগে। আবিদ স্যার সিদ্দিক বিএসসি'র মোবাইল নাম্বারটা আমাকে রেখে দিতে বললেন।

এক সময় হন্তদন্ত হয়ে সিদ্দিক স্যার এসে হাজির হলেন। তিনি শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন, এ কারণে দেরি হলো বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। মোর্শেদ তার আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। আমি, রুবেল, সিদ্দিক বিএসসি এবং মজনু মিয়া একসাথে দুপুরের খাবার খেতে বসলাম নাগেশ্বরীর একটি রেস্তোরায়। খেতে খেতেই আরও দু'চারটে কথা লেনদেন হলো। সিদ্দিক স্যার জানালেন ২০১৫ সালে তাঁর স্কুলের একটি মেয়ে গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে পাশ করেছে। বলার সময় তাঁর কপালটি শীতের রঙিন চাদরের মতো দোল খেয়ে উঠল, পরম তৃপ্তি প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর কণ্ঠে।

ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প এমনিভাবে অনেক শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণ করতে চলেছে। মোর্শেদ, আল-আমিন, সিদ্দিকুর, মজনু মিয়ার মতো আরো অনেক শিক্ষার্থী আজ অভাবকে জয় করে স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরণের কথাগুলো শুনতে যেমন ভালো লাগে তেমনি তাদের জন্য গর্ব হয়, শির উন্নত হয় তাদের মনোবল থেকে, তারা যেন সবাই এক একটি দীপ নিয়ে রাস্তায় নেমেছে আর তাদের সহায়তা করছে ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রমপ্রায় মুহূর্তে আশার আলো দেখাতে পেরে আমরাও যেমন গর্বিত তেমনি তাদের অভিভাবকরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে। শুধুমাত্র এসএসসি যারা পাশ করেছে শুধু তাদেরকে নিয়ে বসে নেই ব্যাবিলন পরিচালকমণ্ডলী। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরাও যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য

তাদের মেধাবী ছেলে মেয়ের খরচ যুগিয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রয়োজনে যারা শ্রমিকবৃত্তি বেছে নিয়েছে এবং সন্তান গ্রামের বাড়িতে রেখে কষ্ট করে জীবনযাপন করছে তাদের জন্যও বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যাবিলন। গরু-গাভি কর্মসূচী তারই একটি প্রতিফলন। গাভি পালন করে সেখান থেকে যা আয় হবে তা দিয়ে শিশুটির পুষ্টি নিশ্চিত করে ছোটবেলা থেকেই যেন সে ভালোভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে তার সামান্য এই অবদানটুকুও তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্বপ্নপূরণে সহযোগিতা করছে। কখন যে এই প্রকল্পের প্রত্যেকটি ফলফুলের সাথে নিজে জড়িয়ে ফেলেছি তার অনুভূতি আমার কাছে আজীবন অমলিন থাকবে।

রুবেলের যদিও এই প্রকল্পের সাথে সংযুক্তি নেই তবুও এই প্রকল্পের মহত্ব দেখে সে অভিভূত হলো এবং অনুধাবন করতে পারল। ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকের সাথে সময় কাটিয়ে রুবেলের হতাশা এখন আনন্দ হিসেবে কাজ করছে। সে এ ধরনের প্রকল্পের জন্য আমি এবং আমার কোম্পানিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। অনুভূতি প্রকাশ করতে যেয়ে রুবেল আরো জানাল- বৃত্তি দেয়ার পরে কোনো প্রতিষ্ঠান যে এসব শিক্ষার্থীর বাড়িতে তাদের খোঁজখবর নেয়ার জন্য স্বশরীরে পরিদর্শন করে তার জন্যও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। রুবেল একজন ব্যাংকার তাই হয়তো ধন্যবাদের বিষয়টা মাঝে মাঝেই দিতে ভুল করে না।

নাগেশ্বরী থেকে ফেরার সময় মজনু মিয়া, তার মা, বাবা, ভাই-বোন ও অনেকেই বিদায় জানানোর জন্য প্রস্তুত যদিও বিদায় দেবার মতো খুব বেশি আতিথেয়তা করার সুযোগ দিলাম না। ছোট্ট উঠানে আমরা সবাই মিলে ছবি তুললাম। সিদ্দিক স্যার অপেক্ষা করছে আমাদের এগিয়ে দেয়ার জন্য। মাহবুব স্যার রাস্তার পাশেই দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিদায় মুহূর্তটি আর দীর্ঘায়িত না করে বাহনে চেপে বসলাম। ফিরতি পথে রংপুরে এইচআর এর সহকর্মী অপুর বাড়িতে নাও ভেড়ানোর আবদারটা উপেক্ষা করতে পারলাম না। ভাবির খুব স্বল্প সময়ের আতিথেয়তা আমাদের মুগ্ধ করল ও ক্ষুধা নিবারণ করতে সহযোগিতা করল। বুঝতেই পারিনি আমাদের বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল এই ভ্রমণটাতে। অপুর ছেলের সাংঘাতিক দুষ্টুমি আমাদের ভ্রমণের ক্লান্তি কিছুটা দূর করতে সহযোগিতা করল। এক কাপ চা খেতে খেতে মনে পড়ল মজনুর মায়ের মুখটি। তিনি খুবই অনাড়ম্বরভাবে তাঁর ছেলের জন্য আমার কাছে দোয়া চেয়েছিলেন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে জানিয়েছিলেন- 'হামার ছওয়াটা মানুষ হইবে- তোমরা দোয়া করেন বায়।'

সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি...

মোঃ সুরুজ্জামান (মানিক)
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি এ্যাস্যুরেন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

হৈ-হুল্লোড় সারাদিন। কোথাও কোনো বিশ্রাম নেই। একেবারে মেইল ট্রেন। কোথায় থামবে জানা নেই। তবে সন্ধ্যা হলেই বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়ি ফিরেই মায়ের বকুনি, বাবার শাসন। সারাদিন স্কুল ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সাথে খেলায় মেতেছি, নদীতে সাঁতার কেটেছি। সন্ধ্যা না হলে বাড়িই ফিরতাম না। কেন জানি শৈশবের সেই দিনগুলির কথা খুব মনে পড়ছে। মনে হয় সেই শৈশবে আবার ফিরে যাই। তখন কোনো বাধা ছিল না, ছিল না কোনো পিছুটান। ছিল মায়ের হাতে পিঠা খাওয়ার আনন্দ। সময় হলে স্কুলে যাওয়া আর স্কুল ছুটি হলেই বন্ধুদের সাথে খেলায় মেতে ওঠা, দৌড়াদৌড়ি করা, আরো যে কত কী? এই তো মনে হয় সেইদিন, মামাত ভাই এসেছে আমাদের বাড়িতে, সেও আমার মতো ডানপিটে। দু'জনে মিলে পাশের আঙ্কেলের বাড়িতে গেলাম পেয়ারা খেতে। আঙ্কেল দু'জনকে দু'টো পেয়ারা দিলেন এবং বললেন আরো লাগলে বলো। দু'জনে পেয়ারা খেলাম। খাওয়ার পরে বুদ্ধি করলাম পেয়ারা আর চেয়ে খাওয়া যাবে না, চুরি করতে হবে। চুরি করে খাওয়ার মজাটাই আলাদা। চুরি করে খেতে শুরু করলাম। একদিন ধরা পড়ে গেলাম।

খেলার সময় বন্ধুদের সাথে মারামারি- এটাতো নিত্যদিনের ঘটনা। কীভাবে কাউকে রাগানো যায়, সেই বুদ্ধি নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম। বকুল ছিল আমার এক বন্ধু। তার বাবার নাম মোস্তফা। লোকজন মোস্ত নামেই চেনে। বকুলের সাথে কোনোরকম তর্ক হলেই বলতাম, মোস্ত একটু গোস্ত দে, ঝাল লেগেছে পানি দে। সে তখন কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে নালিশ করত। তার মা আবার আমার মায়ের কাছে নালিশ নিয়ে আসত। মা তখন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, গুরুজনের নাম বলতে হয় না, বললে অমঙ্গল হয়, লোকজন খারাপ বলবে। তবুও কি থেমে থাকে দুষ্টুমি?

আমার ক্লাসের স্যারও জানতেন যে আমি দুষ্ট। তবুও স্যার আমাকে অনেক আদর করতেন। একদিন হঠাৎ স্যারের হাতে বেদম প্রহার খেলাম। কারণ ছিল পড়া নিয়ে দুষ্টামি। স্যার ক্লাসে ঢুকেই ক্লাস শুরু করলেন। আমি ক্লাসে বেশ মনযোগী ছিলাম, যদিও দুষ্টামি করতাম। স্যার সন্ত্রাস আর ডাকাত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আলোচনা শেষে বললেন- ডাকাত নিয়ে ১০০ শব্দের একটি অনুচ্ছেদ লিখ। যে আগে খাতা জমা দিবে তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিব। আমি তাড়াহুড়ো করে খাতা-কলম বের করে লিখতে শুরু করলাম-

অনেকদিন আগে আমি আর আমার বাবা মেলা থেকে রাতে বাড়ি ফিরছিলাম। পথিমধ্যে একদল ডাকাত আমাদের আটকাল এবং আমার বাবাকে ধরে রাখল। আমি কোনোমতে দৌড় দিয়ে পালাতে লাগলাম এবং চিৎকার করে বলতে লাগলাম ডাকাত, ডাকাত। স্যারের হাতে খাতা জমা দিলাম। স্যার আমাকে আদর করে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানালেন। তারপর খাতার দিকে চোখ দিলেন। পড়া শেষ করে স্যার আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, মানিক তুমি এটা কি লিখেছ? আমি বললাম, কেন স্যার, ডাকাত নিয়ে ১০০ শব্দের অনুচ্ছেদ। বর্ণনায় আছে ৩২ শব্দ আর ডাকাত আছে ৬৮ বার, সব মিলে ১০০ শব্দ। স্যার কোনো কথা না বলে আমাকে মারতে শুরু করলেন এবং বললেন লেখাপড়া নিয়ে ফাজলামো? তোমার দুষ্টামির ভূত আমি তাড়াচ্ছি- বলে আমার পিঠের উপর বেত চালাতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে আমার সর্দি লেগে গিয়েছিল। ক্লাসের এই ঘটনা বাকি স্যারদের অজানা রইল না। তারপর থেকে সেই স্যারের ক্লাসে আর কোনোরকম দুষ্টামি করতাম না।

ইতিমধ্যে সকল স্যারের কাছে আমি দুষ্টামির নায়ক হিসেবে পরিচিতি পেলাম। একদিন ইংলিশ স্যার ক্লাসে আমাকে বললেন- আচ্ছা মানিক, ধরো তোমার সামনে দিয়ে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে। লোকটির পকেট থেকে পাঁচশত টাকার একটি নোট পড়ে গেল। তুমি সেটা দেখে তুলে কি পকেটে রেখে দিবে? আমি বললাম- কি বলেন স্যার, আমি কখনো এ কাজ করব না। স্যার তখন খুশি হয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন- তাহলে তুমি টাকাটা কি করবে? আমি বললাম- ইচ্ছেমতো খরচ করব স্যার। স্যার তখন মন খারাপ করে আমাকে বললেন- তুই আসলেই একটা দুষ্ট। স্যারদের সাথে এমন আচরণ যেন আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

সব স্যারের কথা ভুলে গেলেও সমাজ স্যারের কথা ভুলতে পারব না। একদিন ক্লাসে সমাজ স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোন মুরগি পছন্দ, সাদা না কালো? আমি অধীর আগ্রহে উত্তর দিলাম কালো মুরগি। স্যার তখন আমাকে যুক্তি প্রদর্শন করতে বললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন কেন আমার কালো মুরগি পছন্দ। আমি তখন বললাম, কালো মুরগি সাদা ডিম পাড়তে পারে কিন্তু সাদা মুরগি কালো ডিম পাড়তে পারে না। স্যার প্রথমে হেসে ফেললেন- পরে গম্ভীর হয়ে বললেন, এই বদমায়েশী তুই কোথা থেকে শিখেছিস? আমি বললাম স্যার- সুমন্ত সেনের রোল নং-১৩ এই গল্পের বইয়ের অন্তু অনেক দুষ্টামি করত। আমিতো তার মতো কোনোকিছু করিনি। স্যার তখন বললেন অন্তুর তাহলে নিশ্চয় রোল

নম্বর ১৩ ছিল। আমি বললাম জি স্যার। স্যার আমাকে বুঝিয়ে বললেন- অন্তর রোল নম্বর ১৩, তুমি তাকে অনুসরণ করো, অথচ যার রোল নম্বর ১ তাকে অনুসরণ কর না। সব সময় ভালোটা গ্রহণ করবে, মন্দটা বর্জন করবে। তাহলে জীবনে অনেক বড় হতে পারবে। স্যারের এই উপদেশ আমার হৃদয়ে নাড়া দিতে লাগল এবং দু'চোখে পানি চলে এল। তারপর থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কারো সাথে দুষ্টামি করব না। শুধু মন দিয়ে লেখাপড়া করব। জীবনে অনেক বড় হব। পরের বছর ক্লাসে রোল নম্বর হলো ১। এই আনন্দের মনে হয় শেষ নেই। তারপর স্যারের অনেক সহযোগিতা পেলাম। পেলাম বড় হওয়ার অনুপ্রেরণা।

ছোটবেলার সেই স্মৃতিগুলো বারবার মনে পড়ে। একদিন বাবার সাথে মেলায় গিয়ে অনেক মজা করছিলাম। পুতুলনাচ দেখেছিলাম, নাগরদোলায় উঠেছিলাম এবং সার্কাস দেখেছিলাম। কিন্তু মেলায় সব দেখার পর যখন বাড়ি ফিরছিলাম, ভীড়ের মধ্যে আমি মেলায় হারিয়ে যাই। বাবাকে হারিয়ে ফেলি। চারদিকে বাবাকে খুঁজতে থাকি। কোথাও পাই না। মনে মনে আমার অনেক ভয় হয়েছিল। আমি এখন কি করব? দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। চারদিকে মেলার মিউজিকবাতি, সার্কাসের সেই টিপ টিপ লাইট জ্বলছে। একদিকে লাগছে ভয়, অন্যদিকে আবার মিউজিকের তালে তালে বাতি জ্বলছে- সেগুলোও ভালো লাগছে। এক পা দু'পা করে আমি সার্কাসের দিকে এগুতে থাকি এবং সার্কাসের সামনে দাঁড়িয়ে যাই। আমার বাবা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। পাঁচ বোনের মাত্র একটা ভাই আমি। বাবা হতাশ হয়ে চারদিকে পাগলের মতো আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি তখন সার্কাসের বনমানুষদের সাথে সার্কাসের গেটের বাইরে নাচছি। সামনে দিয়ে বাবা খুঁজতে খুঁজতে যাচ্ছিলেন, অথচ আমার মনেই নেই যে আমি বাবাকে হারিয়ে ফেলেছি ভীড়ের মধ্যে। বাবা আমাকে দেখতে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলেন এবং বাড়িতে নিয়ে আসলেন। তারপর মাকে সবকিছু বললেন। অথচ আমি মায়ের কাছে নালিশ করলাম যে আমি সার্কাসের বনমানুষদের সাথে নাচছিলাম, বাবা আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছে। তারপর বাবা আমাকে এই মেলার কাহিনী সম্পর্কে বললেন- এই মেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মেলা। এই মেলার নাম বিরাট নেকমরদের ওরশ মেলা। রাজা হীমরাজ ও ভীমরাজের আমলে এই মেলার গোড়াপত্তন হয়। সেই থেকে এই মেলা অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের সকল প্রান্ত থেকে মানুষ এই মেলায় ঘুরতে আসে।

দেখতে দেখতে অনেক বছর পেরিয়ে এসেছি। দেখেছি অনেক কিছু, শুনেছি অনেক কিছু, মনে রেখেছি অনেক কিছু, ভুলে গেছি অনেক কিছু। সবকিছু আবছা আবছা মনে হলেও শৈশবের সেই দিনগুলি আমার স্পষ্ট মনে আছে- যা কোনোদিন ভুলবার নয়।

পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং সততা সুন্দর জীবনের পূর্বশর্ত

মোঃ নাসির উদ্দিন
ডিএমডি, ফেমাস ডিজাইন লিমিটেড
প্রাক্তন সিনিয়র ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

এই অধিবিশ্বে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং খুব অল্প সময় দিয়েছেন জীবনচক্র সমাপ্ত করার জন্য। এই স্বল্প জীবদ্দশায় মানুষকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়, বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আর ধাপে ধাপে এই সমস্যার মোকাবিলা করে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে তাকে প্রমাণ করতে হয় সৃষ্টির সেরা জীব।

আমার জীবনের সময়কালও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাকেও আমার জীবদ্দশায় বিভিন্ন স্তর পার হতে হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে। যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি, পরিশ্রম-কর্মদক্ষতা-সততা দিয়ে সামনের দিকে নিজেকে এগিয়ে নিতে।

আমার জন্মস্থান বৃহত্তর বরিশালের পটুয়াখালী জেলায়। তাই বাল্যজীবন যথাক্রমে পটুয়াখালীর গলাচিপা, দশমিনা থেকেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়াশুনা শেষ করে ঢাকায় আগমন। এরপর জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে পরিবার পরিচালনার দায়িত্বকে নিয়েছিলাম চ্যালেঞ্জ হিসেবে, বোঝা হিসেবে নয়। আর এরই পরিক্রমায় ৩রা জুন ১৯৯২ সালে আমি কর্মস্থল হিসেবে ব্যাবিলনে যোগদান করি এবং এই প্রতিষ্ঠানকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং আদর্শ শিক্ষালয় বলে মনে করি- যেখানে মানুষ (প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল সদস্য) লাভ করে আল্লাহর অশেষ রহমতে জীবিকা নির্বাহের নিশ্চয়তাসহ আদর্শ ব্যক্তিত্ব অর্জনের সকল উপাদান। যাইহোক, আজ সময়ের এই সুযোগে সেই স্বর্ণালী দিনের ব্যাবিলন ইতিহাস দু'কলম লিখছি।

১৯৯২ সালে ব্যাবিলনে যোগদান করে শুরু করলাম আমার জীবনের আরেকটি স্তর। প্রথম থেকেই কর্মস্থলের নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে শুরু করলাম। কাজকে দায়িত্ব আর দায়িত্বের সঠিক পালনকে মনে করলাম জীবনের সফলতার পথ। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা মাথায় রেখে কর্মস্থলে কাজ চলতে থাকল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ করেই আমি জন্ডিসে আক্রান্ত হই। এত অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনকেই জন্ডিসের কারণ বলে বিবেচনা করি এবং সিদ্ধান্ত নেই চাকুরি থেকে অব্যহতি নেয়ার। আমার ধারণা হয়েছিল কর্মস্থল হিসেবে গার্মেন্টস আমার জন্য উপযুক্ত নয়। এভাবেই প্রায় পনের দিন আমি অসুস্থ এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকি। হঠাৎ একদিন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি সালাম স্যার (পরিচালক, ব্যাবিলন গ্রুপ) এইচআর ডিপার্টমেন্টের কাইয়ুম সাহেবকে নিয়ে আমাকে দেখতে আসেন। আমি অবাক হই। স্যার আমার জন্য কষ্ট করে ডাব ও অনেক ধরনের ফলমূল নিয়ে এসেছেন। আমি ঐ

অসুস্থ অবস্থা থেকে বিছানায় উঠে বসি এবং স্যারকে অনুরোধ করে বলি- আমি আর গার্মেন্টসে চাকুরি করব না, এত কষ্ট আমার দ্বারা হয়তো সম্ভব হবে না। স্যার আমার সে কথাগুলি মনযোগ দিয়ে শুনেন এবং আমাকে বলেন- টিনশেডের এই জীর্ণ বাসস্থান পরিত্যাগ করে দুই পরিবারের একটি ফ্ল্যাট বাসা ভাড়ার ব্যবস্থা করতে। তিনি আমাকে সাহস যোগালেন এবং বললেন, গার্মেন্টস সেক্টরেই আপনি একদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন। এই কথার উপর বিশ্বাস করে পুণরায় আমি কর্মস্থলে ফিরে যাই এবং ব্যাবিলনের শ্রদ্ধেয় স্যারদের প্রতিটি আদেশ, উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করি। আর এভাবেই ধীরে ধীরে আমার অবস্থার উন্নতি বুঝতে পারি। এর ধারাবাহিকতায় প্রথমে এক লাইন, দুই লাইন করে ল্যাপিন ড্রেসেসের দায়িত্ব পাই এবং পরবর্তীতে জুনিয়র ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি হয়।

আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে সব সময় মনে করি, যেকোনো কঠিন কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলে জীবনে উন্নতি নিশ্চিত। এর একটা উদাহরণ না দিলেই নয়- শ্রদ্ধেয় এমদাদ স্যার কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্ডারের কাজ ল্যাপিনে করাতে চাচ্ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন ব্যাবিলনে কাজটা হোক। ঐ সময় ব্যাবিলনের কাজের কোয়ালিটি অনেক ভালো ছিল। ল্যাপিন প্রোডাকশনে নতুন বলে স্যার ভরসা পাচ্ছিলেন না। আমি স্যারকে বললাম- স্যার, ব্যাবিলন সঠিকভাবে কাজ করতে পারলে আমিও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইনশাল্লাহ কাজটি সঠিকভাবে করতে পারব। স্যার রাজি হলেন, এবং আমি সঠিক ও সুন্দরভাবে কাজটি সম্পন্ন করলাম। এ রকম আরো অনেক চ্যালেঞ্জের উদাহরণ রয়েছে।

যাইহোক, ব্যাবিলনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, যাদের হাতে ব্যাবিলন প্রতিষ্ঠানের জন্ম, তাঁরা সবাই শুধু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বা আদর্শের উদাহরণ নয়। তাঁরা হলেন শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠনের কারিগরও। যেটি আজ না লিখলেই নয়, আমি একদিন শার্টের সামান্য ডিফেক্ট এমদাদ স্যারকে দেখাতে ল্যাপিন থেকে ব্যাবিলনে যাই। স্যার শার্টের ত্রুটি দেখেন এবং আমাকে বলেন- আপনি হয়তো শার্টটি ১০০% কিউসি দেখাতে পারেন, তাতে কাস্টমার হয়তো বুঝতে পারবে না বা দেখতে পারবে না, কিন্তু উপরওয়ালা যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সকল দেখার অধিকারী তিনি ঠিকই দেখবেন। কাস্টমারকে ঠকানো হবে। স্যারের এ ধরনের সততা আমাকে মুগ্ধ করল। আমি অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে, এ ধরনের কাজেও তারা বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেন এবং সঠিক দায়িত্ব পালন করেন।

আমার ব্যাবিলন জীবনে আরো একটি উল্লেখ করার মতো ঘটনা না বললেই নয়- শ্রদ্ধেয় সালাম স্যার একদিন আমাকে ডেকে বললেন, হেমায়েতপুরে প্যান্ট ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশন লস হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার এনেও কাজ হচ্ছে না। আমার মনে হয় আমাদের পুরোনো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ম্যানেজার হিসেবে আপনি গেলে হয়তো ফলপ্রসূ হতে পারে। আপনি এক মাস ভেবে সিদ্ধান্ত নেন। আমি স্যারের অনুরোধকে মূল্যায়ন করে

কাজটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম এবং শেষ অবধি আমি দায়িত্ব নিয়ে ফ্যাক্টরিটাকে ০৩ লাইন থেকে ১১ লাইনে উন্নীত করেছিলাম।

ব্যাবিলন প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন যাদের স্নেহ-ভালোবাসা-দোয়ায় এবং আল্লাহর অশেষ কৃপায় আজ নিজেই একটা গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছি, যেখানে অনেক মানুষের সাথে আমাকে কাজ করতে হয়। যেখানে অনেক মানুষের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা আর পরিচালনার দায়িত্ব আমার কাঁধে। তাই নিয়মনীতির পালনটা সেই শ্রদ্ধেয় স্যারদের মতো করার চেষ্টা করি। গত জুলাই ২০১০ইং থেকে আমি আমার নিজের প্রতিষ্ঠানকে সকলের দোয়ায় বেশ ভালোভাবেই পরিচালনা করে যাচ্ছি।

বৃত্তের ভেতর শুধু তুমি আছ

মেহেদী হাসান
প্রাক্তন অফিসার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আমার তুমি,

চিঠির খামটা খুলতে খুলতে কি একরাশ নস্টালজিয়া মেঘ ভীড় করেছে চারপাশে? সেই পুরোনো দিনের মতো অক্ষরগুলোর উপর আঙ্গুল বুলিয়ে চেনা স্পর্শ পাবার চেষ্টা করছ নাকি? কী হিসাব করছ মনে মনে? কতদিন পরে চিঠি পেলে আমার? না, ভুল হয়নি তোমার, সত্যিই সময়টা পাঁচ বছর এগার মাস তেইশ দিন। আমি জানি, এই এতগুলো বছর পর আমার লেখা এই একটা চিঠি অন্তত তুমি পড়ছ। কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে লেখা এ রকম আরো অন্তত হাজারটা চিঠি আছে যা কখনও তোমার কাছে পৌঁছেনি, মনে মনে হাজারটা চিঠি লিখেছি আমি তোমাকে। আমার প্রতিটা নির্ঘুম রাত পার হতো তোমাকে চিঠি লিখে। জানতাম, এই চিঠিগুলো কখনও তোমার কাছে পৌঁছবে না, তবু খুব ভালো লাগত লিখতে। আমার স্বপ্নে, আমার কল্পনায় এত কথা আমি বলেছি তোমাকে, যে আজ এই সত্যিকারের তোমাকে সত্যি সত্যি কোন কথাটা বলেছি আর কোন কথাটা বলা হয়নি তা ভেবে পাচ্ছি না।

যখন কলেজে পড়তাম, আমাদের গণিতের এক প্রফেসর বলেছিলেন যে মানুষের একটা বড় সুবিধা হলো মানুষ ভুলে যায়। তা যদি না হতো, মানুষের নাকি বেঁচে থাকাটাই কঠিন হতো। ধরো, কারো সবচে' কাছের মানুষটা মরে গেল, ঐ সময়কার কষ্টের যে তীব্র অনুভূতি, জীবনটাকে যে হঠাৎ করে অর্থহীন মনে হওয়া, তা যদি সময়ের সাথে ফিকে হয়ে না যেত তাহলে তো তার জীবনটাই থেমে যেত। ক'দিন কাঁদে মানুষ- এক দিন, তিন দিন, এক সপ্তাহ, বড়জোর এক মাস; তারপর সবকিছু আগের মতো। হয়তো মনের খুব গভীরে কোনো এক কোণে ভোঁতা একটা হাহাকার থাকে, এক সময় সেটাও নাই হয়ে যায়। টাইম ইজ আ ভেরি ইফেক্টিভ এন্টিবায়োটিক। কিন্তু কেন যেন এই ইফেক্টিভ এন্টিবায়োটিক আমার উপর কোনো ইফেক্ট করতে পারল না। জানোতো, মানুষের মস্তিষ্কের বাম অংশ নিয়ন্ত্রণ করে লজিক আর ডান অংশ আবেগ। আমার বোধ হয় বাম অংশ বলে কিছু নেই, সবটাই আবেগ নিয়ন্ত্রক ডান অংশ। তা না হলে আসলে কিন্তু কোনো যুক্তি ছিল না, এ

রকম করে সবটা সময় তোমার একটা হ্যালুসিনেটিং এক্সিসটেন্স তৈরি করে তার সাথে দিন কাটানোর। আমার চারপাশে সব বাম মস্তিষ্ক ডমিনেটেড হিতাকাঙ্খী বন্ধুদের ছড়াছড়ি, তারা আমার এই স্মার্টফোনের যুগে আনস্মার্ট আবেগপ্রবণতায় বেশ অবাক আর বিরক্ত হতো। ওদের একটা ভুল ধারণা ছিল, ওরা ভাবত আমি বুঝি তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছি। একটা সময় পর্যন্ত অবশ্য আমি সত্যি সত্যি খুব অপেক্ষা করে থাকতাম, ফোনের রিংটোন বাজলেই মনে হতো এই বুঝি তোমার ফোন আসলো। অচেনা কোনো নম্বর মুঠোফোনে কড়া নাড়লেই ভয় হতো, এই বুঝি তুমি। কথার পরে কথা, অনেক অনেক অভিমান জমা করে রেখেছিলাম তোমার ফিরে আসার সেই দৃশ্যটার জন্য। কিন্তু যখন পাঁচ পাঁচটা বছর চলে গেল, তখন মনে হলো তুমি আর আসবে না। কিন্তু কেমন করে যেন তবু তুমি রয়ে গেলে আমার অস্তিত্ব জুড়ে। সবটা সময় মনে হতো তুমি আমার সাথেই আছ। সকালবেলা অফিস যাওয়ার সময় মনে হতো তোমাকে বাসায় রেখে যাচ্ছি, অফিসে বসে টেনশন হতো তুমি বাসায় একা আছ, অফিস শেষে তাড়াতাড়ি ফেরার তাড়া, বাইরে থেকে ঘরের তালা খুলেও মনে হতো তুমিই ভেতর থেকে দরজা খুলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছ। সুনীল নাকি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বাইরে থেকে দরজা খুলতে খুলতে, বেচারা জানত না বাইরে থেকে দরজা খুলেও কি করে অনুভব করতে হয়, দরজাটা কেউ ভেতর থেকে খুলেছে। তোমাকে ছাড়া দুঃস্বপ্নের মত নিঃসঙ্গ অন্ধকার সময়টাতে একটা মুহূর্তের জন্যেও তোমার স্মৃতিকে আমি দূরে থাকতে দেইনি। তোমাকে শুভ সকাল বলে দিন শুরু করতাম, ঘুমোনোর আগে তোমাকে শুভ রাত্রি বলতেও ভুল হয়নি কখনও।

আরব্য রজনীর একটা গল্প আছে না, বোতলবন্দী জ্বীনের গল্প, জ্বীনকে কে যেন বোতলে ভরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। সমুদ্রের নীচে বোতলের মধ্যে বসে জ্বীন আশা করে থাকত, কেউ হয়তো তাকে উদ্ধার করবে। হাজার হাজার বছর চলে যায়, জ্বীনের অপেক্ষা আর শেষ হয় না। এক পর্যায়ে জ্বীন মনে মনে ঠিক করল, আগামী এক হাজার বছরের মধ্যে কেউ তাকে যদি উদ্ধার করে তবে তাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবে। কেউ আসলো না। ডেডলাইন আবার বাড়ানো হলো আরো এক হাজার বছর, পুরস্কারও বাড়ল দ্বিগুণ। কিন্তু এবারো কেউ আসলো না জ্বীনকে উদ্ধার করতে। শেষমেষ জ্বীন রাগে-দুঃখে-হতাশায় ঠিক করল আগামী এক হাজার বছরের মধ্যে যদি কেউ তাকে উদ্ধার করে তবে উদ্ধারকারীকে সে হত্যা করবে। আর এক হতভাগা ঠিক সেই সময় জ্বীনটাকে উদ্ধার করল। আমার অবস্থা ঐ জ্বীনের মতো। যখন ধরে নিলাম শুধু তোমার ছায়ার হাত ধরে বাকি পথটা চলতে হবে, ঠিক তখনই পথের বাঁকে বিনা নোটিশে তুমি এলে। কী অদ্ভুত! আমি ভাবতাম, শুধু আমিই তোমার ছায়ার হাতে হাত রেখে পথ চলি, এত বছর পর যখন দেখা হলো, দেখলাম তোমার হাতও ধরে আছে আমারই ছায়া। 'আজ আবার সেই পথে দেখা হয়ে গেল...।' কত কথা বলব বলে ভেবে রেখেছিলাম, কিছুই বলা হলো না, কিছুই করা হলো না। নির্বাক আমি শুধু এইটুকুই অনুভব করলাম, মাঝখানের এই যে সময়টুকু, এই সময়টুকু আমি আসলে বেঁচে ছিলাম না। জীবন চলছিল জীবনের মতো; খাচ্ছিলাম,

ঘুমুচ্ছিলাম, কিন্তু এই বেঁচে থাকাকে আসলে বেঁচে থাকা বলে না। ছিলাম বোতলবন্দী জ্বীনের মতো বৃত্তবন্দী আমি। আচমকা তুমি এসে ভেঙে দিলে আমাকে ঘিরে থাকা কষ্ট রঙের বৃত্তটা। এখন আবার আমি স্বপ্ন দেখি, আকাশটা আবারও এখন বিশাল আর নীল মনে হয়।

শোনো, আমার না খুব ইচ্ছে করে আবার সেই আগের সময়ে ফিরে যেতে। এবার আমি যখন বাড়ি আসব, তুমি কোথাও যাবার জন্য যদি বাসা থেকে বের হও তো আগে থেকে আমাকে জানিও, আমি আগে থেকে রাস্তার পাশে তোমাকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকব সেই প্রথম সময়ের মতো। তুমি কিন্তু ভুলেও আমার সাথে কথা বলতে যেও না। আগের মতো করে আড়চোখে চেয়ে একটু হেসে চলে যেও। হাসছ কেন? জানোই তো, আমি একটু পাগল আছি। চেয়েছিলাম তুমি যখন চলে আসবে, তোমাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে তোমার পছন্দমতো একটা বাসা ভাড়া করব ঢাকায়। কিন্তু তা করতে গেলে আবার হাতে একটু বেশি সময় দরকার। জানোইতো, তোমার বর যে চাকরি করে সেখানে সময়ের বড়ই অভাব। দুই রুমের ছোট্ট একটা বাসা নিয়েছি, বেশ ছিমছাম, তোমার বোধ হয় পছন্দ হবে। অনলাইনে তোমার পছন্দ করা টুকিটাকি কিছু হোম এপ্লায়েন্স আমি অলরেডি কিনে ফেলেছি। বাকি যা যা লাগে তুমি এলে দু'জন মিলে পছন্দ করে ধীরে ধীরে কিনে ফেলব। তোমার সংসার তুমি তোমার মতো করে সাজিয়ে নিও। সবকিছু রেডি, শুধু তোমার আসার অপেক্ষা। আর বেশি দেরি করো না, এমনিতেই অনেক দেরি করে ফেলেছ। গড় আয়ু পর্যন্তও যদি বাঁচি, আর বাঁচব মোটে ত্রিশ বছর। তার মধ্যে দশ বছর তো ঘুমাতেই হবে, অফিস করতে হবে আরো প্রায় দশ বছর, এ রকম টুকিটাকি আরো সব হিসেব বাদ দিলে দেখা যাবে সংসার করার জন্য আর পাঁচ বছর জীবনও হাতে নাই। তাই শুভস্য শীঘ্রম। তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দিও, নিজের প্রতি যত্ন নিও, ভালো থেক, ভালো রেখ।

ইতি
তোমার আমি

পুনশ্চঃ ওহ্! ভুলেই গিয়েছিলাম, কাঁটাবন থেকে তোমার জন্য খুব সুন্দর দু'টো লাভবার্ড কিনেছি, লাভবার্ড তো কথা বলতে পারে না, কিন্তু ভাবে মনে হয় ওরাও তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এক চাষীর বন্দনা

আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ
প্রাক্তন ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

"বদ্ধ দুয়ারে আঘাত পড়ে আহ্বানের,
"হে পরম শক্তিধর, কড়া নাড়ো শরীরে আমার"

বৃষ্টি কেবল ঝরে না বর্ষায়,
মাটি সিক্ত হলেই হবে না ফসল।
পূর্বের কথা চাষবাস,
যত্ন-আত্তি শরীরে তোমার।
তবু কেন ভেজাও আমায়
মননে পুরু ধুলার আস্তরণ,
যে গ্রীষ্মে তীব্র খরা
তৃষ্ণা প্রিয় কি দারুণ তখন।
আর যদি বৃষ্টি নামে, কথা দিলাম,
চাষবাসে দেবো গভীর মনযোগ।

তিনি বল্লেন, "হও", কী আশ্চর্য! হয়ে গেল।

সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে
সৃষ্টি করি যে সত্যের
তাতে অধিকার তোমার সর্বাঙ্গীণ,
তোমাতে সৃষ্ট হোক অনন্ত ঈশ্বরী আরো এক
কথা দিলাম, মহাবিশ্বে সঞ্চিত সবটুকু জলকে
ঘুরিয়ে আনব মেঘের পথে
ঝরিয়ে দেবো বৃষ্টির তুমুল প্রতিজ্ঞায়।
অধিকার আর অনধিকারের দ্বন্দ্বে আমি
নত হব দুই ঈশ্বরীর বন্দনায়।

"অতঃপর সমর্পিত হই শরীরে
শরীরের অভ্যন্তরীণ শরীরে।"

শরীরের মাঝে যে শরীর
তার কথা শেষ হয়।
শুরু হয় অস্তিত্বের কথা।
হে ঈশ্বরীজননী,
বৃষ্টি হলেই কেবল
আমি গ্রীষ্মের প্রখরতায়
এক মৃত্যু ব্যতীত কিছু নই।

২০১৫-এর মশা

রতন চন্দ্র রায়
জুনিয়র অফিসার, বিলিং সেকশন
ব্যাবিলন ট্রিমস্ লিমিটেড

ড্রেনের মশা আজব মশা
কামড় দেবে যখন,
ম্যালেরিয়া হবেই হবে
নিস্তার নাই তখন।

ঘরের মশা গায়ক মশা
রাতে শোনায় গান,
ব্যস্ত থাকে গলা সাধায়
রাত-দিনমান।

ঝোঁপের মশা জংলি মশা
কমনসেন্সের অভাব,
যাকে পাবে কামড় দেবে
ভীষণ মন্দ স্বভাব।

গাঁয়ের মশা গেঁয়ো মশা
আদব কায়দা নাই,
মাতব্বর আর মুরব্বিরও
মান রাখে না ভাই।

পানির মশা বাচ্চা মশা
শান্ত হয়েই থাকে,
বড় হলেই যত বিপদ
কামড় দিতে শেখে।

এইভাবে আর কত দিন?

মোঃ মামুন অর রশিদ
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, মেইন্টেনেন্স ডিপার্টমেন্ট
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাক্ষণ আমি যেন সৎপথে চলি।

সাত তারিখে বেতন পাই
ছেলেকে নিয়ে বাজারে যাই।
বাজার থেকে বাসায় ফিরি
সবাই মিলে রান্না করি।
মাসের শেষে টানাটানি
দোকান থেকে বাকি আনি।

বছর শেষে বেতন বাড়ে
বাড়িভাড়া আগেই বাড়ে
বাড়তে থাকে কর্জ ঋণ।
বুকের ভিতর দারুণ খরা
কষ্টগুলো নাড়ে কড়া
এইভাবে আর কত দিন?

একদিন আমার সকল হবে

ফারুক আহমেদ
সেলস্ এক্সিকিউটিভ
ট্রেন্ডজ, বসুন্ধরা সিটি

একলা রাতে সঙ্গী হবে
সন্ধ্যামুখী বিকেল হবে
জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি হবে
মিথ্যেরা সব সত্যি হবে।

ইচ্ছেগুলো পূর্ণ হবে
মন খারাপের মেঘলা হবে
জলভরা আকাশ হবে
পাহাড়ভরা কান্না হবে।

হরেক রকম মানুষ হবে
অচেনা এক সঙ্গী হবে
জীবন বাঁধার ছন্দ হবে
একদিন আমার সকল হবে।

তুমি এবং মানুষ কাব্য

গোলাম মোর্শেদ
প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ব্যাবিলন গ্রুপ

তুমি উষ্ণ জলের সুহাস নদী
ঢেউয়েতে মাতাল সুখ
তুমি ঝাপসা আকাশ, মেঘলা মিছিলে
বিজলী ছড়ানো মুখ
তুমি সন্ধ্যাপাড়ার আঁধার খামে
একটি ভোরের চিরকুট
তুমি ভালোবাসা উধাও বিকেলে
তেরেসার মায়া-লুক।

তুমি আড্ডা বেলার ধোঁয়াটে ক্যাম্পাসে
গল্প তুফানে দাও চুমুক
তুমি সুখ সাদা রঙে, মেখে দুঃখী কালো
স্বপ্ন সাজাও কিংশুক।

তুমি লালনের গান, খাঁচার পাখিটা
তার খোঁজে উন্মুখ
তুমি প্রেম-দীপ বুকে জ্বেলেছিলে বলে
জোছনারা আজও হিংসুক।

তুমি হিমালয় ছাদে, উড়াল সূর্য
সাহস সমুদ্র সিন্দুক
তুমি নুয়াওনি মাথা বৃক্ষ-সবুজ
যতই ঝড় আসুক।

তুমি রোদেলায়-সাঁঝে স্থাপত্যশৈলীর
গড়েছ জীবন এইটুক
তুমি হৃদয়ের কাছে মেলেনি হিসাব
চেয়েছ জীবনটা ভাঙ্গুক।

তুমি দূর হাঁটা পথ হেঁটে ভেবেছ
এই পথ একটু থামুক
তুমি দেখেছ তখন, জিতেছে মানুষ
জিতে যায়, হৃদয় শালুক।

তুমি শালুক-সুন্দরের মানে বলেছিলে
কালো-তিল নক্ষত্র চিবুক
তুমি তাই লিখে গেছ সুন্দর আহা
জীবনের যত ভুল-চুক।

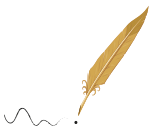

ভালোবাসা এবং অবশেষে

সেলিনা হোসেন
কথা সাহিত্যিক

দু'জনের জীবনযাপনের একসঙ্গে যাত্রা শুরু হয়েছে চার মাস আগে। সন-তারিখের অতশত হিসেব ওদের মনে নেই, শুধু মনে আছে সেদিন কার্তিক মাসের শেষ দিন ছিল। কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করেছিল দু'জনে। রেখা পরেছিল লাল রঙের তাঁতের শাড়ি। কালো রঙের ব্লাউজ। কপালে লাল টিপ। হাতভরা কাঁচের চুড়ি। পায়ে ছিল রুপালি রঙের দুই ফিতার স্যান্ডেল। চুড়ি আর স্যান্ডেল দিয়েছিল বাশার। বিয়ের উপহার। শাড়ি কিনেছিল ও নিজে। ব্লাউজও। খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি কিনেছিল বাশারের জন্য। বাশার নিজে কিনেছিল জিনসের প্যান্ট আর স্যান্ডেল।

এটুকুই ওদের দু'জনের বিয়ের আয়োজন। ওরা ইচ্ছে করেই আর কাউকে বিয়ের সঙ্গী করেনি। বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব কাউকে না। একটা ভাড়া করা ঘর ছিল বাশারের। ওখানেই বাসর হয় এবং একসঙ্গে থাকার শুরুও। বাসর রাতে রেখা বলেছিল, ভাত রাঁধার সময় চালের দানা গুনেছি অনেক দিন। অনেক বছর ধরে। বয়সের বুঝ হওয়ার সময় থেকে। বাশার নির্বিকার গলায় বলেছিল, তাতে হয়েছে কি। যারা রাস্তায় হামাগুড়ি দিতে শেখে তাদের এসব শিখতে হয়।

আমি চালের দানা গুনতে গুনতেই এক-দুই-তিন গোনা শিখেছি।

বেশ করেছ। অভাবের হাঁড়ি থেকে একটা কিছু তো শিখেছিলে।

এখন কি আমাদের সংসারেও চালের দানা গুনতে হবে? হবেইতো। এবারও বাশারের নির্বিকার কণ্ঠস্বর ঘরের বাতাসে উড়ে যায়। সাথে উড়তে থাকে রেখার দীর্ঘশ্বাস। ওর গায়ে এখন লাল রঙের তাঁতের শাড়িটা নেই। ও পুরনো ম্যাক্সিটা পরেছে, রঙজ্বলা, ফুলপাতা উঠে গেছে একরকম। মনে মনে ইচ্ছা ছিল, একটি নতুন ম্যাক্সির, যেটা ওকে বাশার উপহার দিয়ে বলবে, এইটা তোমার রাতের জামা। আমার পছন্দের কেনা। এই জামায় রোজ আমি তোমাকে চাই। বিছানায়। মশারির নিচে। রাতের আন্ধারে। আন্ধার তখন আন্ধার থাকবে না। রাতের ফুলকি হবে।

না, বাশার ওকে রাতের জামা কিনে দেয়নি। উল্টো ওর মায়ের কথা বলেছিল রেখাকে। ততদিনে দু'জনের ভালোবাসার কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ওর মা ওকে বলেছিল,

বাবা এর-ওর কাছে শুনতে পাই মাইয়াটারে তোর পছন্দ হয়েছে। তোরা বিয়া করবি। কিন্তু বাবা আমাগো কথা ভুলিস না। তোর বাপতো ক্যাবল অসুখে ভোগে। অভাবের দৈত্যের লগে তো আর পারি না।

ও মাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল, ভাইবেন না মাগো। আমি আপনের অভাবের দৈত্যরে ঠেকনা দিব। পত্তি মাসে টাকা দিব।

মায়ের মুখ খুশিতে ভরে উঠেছিল। বাশার বলেছে, এই দৃশ্যটি ওর জীবনের দেখা সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। আর যা কিছু দেখে তা সবসময় ওর কাছে একরকম লাগে। রেখার মুখও আর দশটা মেয়ের মুখের মতো একই রকম। তফাৎ খুঁজে নিতে হয়।

রেখা একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, অভাবই তোমার সামনে একটাই চেহারা।

বাশার উত্তর দেয়নি। মনোযোগ দিয়ে আমড়া চিবিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মায়ের কথা ওকে শুনিয়েছিল রেখা। বলেছিল, আমার মায়ের চেহারায় চিন্তার ছাপ ছিল। মেয়ের বিয়ের আনন্দ তার ছিল না। দম নেয়ার জন্য ও থামে। তারপর আবার বলতে শুরু করে। ততক্ষণে বাশারের আমড়া খাওয়া শেষ হয়। আঁটিটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে রেখার ওড়নায় হাত মুছতে মুছতে বলেছিল, তোমার কথাডা আমি কমু?

কও। দেখি কেমন মরদ তুমি।

হা-হা করে হেসে উঠেছিল বাশার। হাসতে হাসতে বলেছিল, মায়ে কইল, মাগো পোলাটারে তোর পছন্দ হইছে জানি। বিয়েও করবি। আমাগোরে ঝাঁটায়ে সরায়ে দিস না। অভাবের লগে পারি না।

আমি বলেছিলাম, মাগো চিন্তা কইরেন না। সংসার করি আর যাই করি, জন্মের ঋণ শোধ করমু। দেখেন নাই আমারে চাইলের দানা গুইনে ভাত রানতে!

হ, দেখছিতো। আমার দেখার কি শেষ আছে। তাইলে এখন ভয় পান ক্যান?

তোর সংসার হইবে মা।

হইবেইতো। কিন্তু গার্মেন্টে আমার কাজ আছে না। যতদিন আমার কাজ আছে ততদিন আপনার ভয় নাই মা।

রেখার মা আঁচলে চোখ মুছেছিল। ও মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। মায়ের শাড়িটা মাথার ওপর ছেঁড়া। ছেঁড়া শাড়িতে মাথা ঢাকে না। মা কীভাবে নিজের মাথা ঢাকবে? একটি নতুন শাড়ির জন্য অপেক্ষা করবে ওর মা। কতদিন? রেখা তা জানে না। মায়ের চেহারা ক্লান্ত-বিষণ্ন। দু'হাতের রগগুলো ফুলে আছে।

তাকিয়ে দেখিস কি?

কিছু না।

কথা লুকাবি ক্যান?

আপনের মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ দেখি মা।

নিজের জন্য মায়া হয় রেখার। একদিন ওকেও কি মেয়ের কাছে সাহায্য চাইতে হবে?

বাসরের মধ্যরাতে দু'জনেই বুঝেছিল যে অভাবের বস্তা কাঁধে রেখেও দিন কাটানো সহজ হয়, যদি দু'জনের মনের মিল থাকে। অভাবকে প্রতিদিনের হিসেবের মধ্যে রেখে বেশ

আছে দু'জনে।

খ.

রেখার বাবা রিক্সা চালায়।

গ্রাম থেকে পরিবারকে নিয়ে এসেছে মেয়েকে গার্মেন্টে কাজ করাবে বলে। কাজেও দিয়েছে। সংসার খানিকটুকু স্বচ্ছল হয়েছে। এখন মেয়ের প্রেমের খবরে তার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করুক তা তার ইচ্ছা ছিল না। মেয়ের উপার্জন মেয়ের সংসারে চলে যাবে ভেবে রহিম মিয়ার দম আটকে এসেছিল। রাগ হয়েছিল। রাগের প্রকাশ ঘটিয়েছিল বউকে মেরে। সাহারা খাতুন ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি একটা নিষ্ঠুর বাপ। মাইয়ার আয় খাইবা, বিয়া দিবা না। থুঃ।

রহিম মিয়া বউকে আবার মারতে গেলে ঘর থেকে ছুটে এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল রেখা। বলেছিল, বাজান আমার বেতনের টাকা আপনে পাইবেন। যেভাবে আগে দিছি সেইভাবেই দিমু। আপনি তো আমারে রানা প্লাজার পথ চিনাইছেন। আয় করতে পাঠাইছেন। আমি ভুলি নাই বাজান।

তোর স্বামী মানব? মানব না ক্যান? রোজগারের টাকা আমার। খরচের হিসাবও আমার। ভাত খাবি না? আমার ভাত তো আমি খাব। তার জন্য টাকা লাগব। সেই টাকাতো আপনে আমারে রাখতে কইবেন। না বাজান?

রহিম মিয়া লজ্জা পেয়ে চুপ করে যায়। খানিকটা বিব্রতও হয়। এদিক-ওদিক তাকায়। হাত বাড়িয়ে ঝুলে থাকা গামছাটা টেনে নেয়। মুখ মোছে। রেখার মনে হয় বাবা নিজেকে ওদের থেকে আড়াল করতে চাইছে। তার মুখমন্ডলে ঘাম জমেছে। সাহারা খাতুন গুনগুন করে কাঁদছে। নানা কথা বলছে। বিয়ের জীবনে কত কষ্ট করেছে সেসব কথা। মৃদুস্বরে গালিও দিচ্ছে রহিম মিয়াকে। অন্যসময় হলে কি হতো বলা যায় না, কিন্তু এখন রহিম মিয়া মেয়ের সামনে ভেজা বেড়াল। লুঙ্গি উঠিয়ে হাঁটু চুলকায়। বাম হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে গামছাটা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বলে, রিক্সা চালানো খুব কষ্টের। পরান ধড়ে থাহে না।

রেখা বোঝে বাবার বয়স হয়েছে। ওদের ছোটবেলায় বাবার মুখে এমন কথা শোনেনি। কারণ তখন বাবা জোয়ান ছিল। রহিম মিয়া বাড়ির বাইরে চলে যায়। রেখা মায়ের কাছে গিয়ে বসে। মায়ের পুরো মুখ দেখা যায় না। একপাশ ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। অর্ধেক মুখমন্ডলে রেখা পুরো পৃথিবী দেখতে পায়। বুঝতে পারে ওই মুখটুকুই ওর জন্য যথেষ্ট। পৃথিবীটা অনেক বড়। কত বড় তা মাপার সাধ্যি ওর নেই। ওর ভেতরটা ওলটপালট হয়ে থাকে। ছোট ভাইবোনগুলোর চিৎকার-হইচই ওকে বিরক্ত করে। একসময় মাথার ঘোমটা ফেলে দেয় সাহারা খাতুন।

দু'হাতে চোখের জল মুছে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকায়। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, বিয়ের খুব শখ না?

শখ! রেখা জ্বলে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলায়। তারপর নিজেও গলার স্বরে হিসহিস ধ্বনি তুলে বলে, তোমাদের মাথার উপরে থেকে বোঝা সরে যাচ্ছে, তোমরা খুশি না?

সাহারা খাতুন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। রেখা উঠে এসে রান্নাঘরে ঢোকে। আজ গার্মেন্ট ছুটি। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ও কলসি থেকে চাল বের করে কুলোয় নেয়। তারপর চালের দানা গুনতে বসে। একবেলার চাল ছিল কলসিতে। দুপুরের ভাত খেয়ে নিজেই যাবে চাল কিনতে। ডাল কিনতে হবে এবং আলুও। ঘাড় ঘুরিয়ে মাকে দেখে। মা বারান্দায় বসে শাড়ির ছেঁড়া আঁচল সেলাই করতে বসেছে। বেচারি। একসময় শাড়ি সেলাইয়ের অবস্থায়ও থাকে না, কাঁথা সেলাইও হয় না। একজন মানুষ জীবনের কত ফুটো সেলাই করতে পারে? রেখা কুলোর চাউল গামলায় ঢালে। কলসি থেকে পানি ঢেলে ধুয়ে চুলোয় বসায়। জ্বলে ওঠে শুকনো কাঠের আগুন।

আগুনের শিখা দেখে ছুটে আসে পাঁচ ভাইবোন। ভাত রাঁধা হচ্ছে, ভাত রাঁধা হচ্ছে বুবু কি রাঁধছ? রেখা কথা বলে না। ডাল আলু ভর্তা বললে ওরা হইচই করবে। বলবে, আমাদের খিদা নাই। ভাত খাব না। পানি খাব। পানি খেয়ে পেট ভরাব। বুবু কথা বল না কেন? আজ রান্ধাবাড়া নাই? কেন? বাজানতো বাজার আনে নাই। তুমি আন নাই কেন? আমিতো এনেছি। কি এনেছ? নুন আর মরিচ।

ভালো ভালো। নুন আর মরিচ দিয়ে ভাত খাব। চল চল।

চারজন চলে গেলে রেবা কাছে দাঁড়িয়ে বলে, বুবু তুমি কি বিয়ের জন্য টাকা জমাও?

জমাইতো। নিজের বিয়া নিজে করব। কারো সাহায্য চাই না।

সেইজন্য নুন-মরিচ?

হি-হি হাসিতে গড়িয়ে পড়ে রেবা। বলে, আমিও গার্মেন্টে চাকরি করব, নিজের বিয়ে নিজে করব।

চুপ কর রেবা। মা শুনবে। মাকে শোনাতে চাই। মা শুনুক। তুমি আমাকে কবে রানা প্লাজায় নিয়ে যাবে?

কখনোই নিব না। আমি চাই না তুই ওখানে কাজ করিস। সুইং সেকশনে। যেখানে আমাকে গিয়ে কাজে বসতে হয়। সকাল হলে মেয়েদের সাথে একসাথে কাজে যাই। বিকালে বের হওয়ার পর মাথায় কিছু থাকে না। মাথা ঠিক হতে সময় লাগে দুই ঘন্টা।

আমাকে এত কথা বলা লাগবে না। আমি চাকরি করব। টাকা আয় করব। বিয়ে করব।

বিয়ের খুব শখ না!

শখ! কী বললে? শখ! তারপর আকস্মিকভাবে হি-হি হাসিতে ভেঙে পড়ে বলে, ঠিক তোমার মতো শখ। শখতো হবেই!

হাসতে হাসতে রেবা বাইরে যায়। ও রাস্তায় ছুটোছুটি করে ফুল বিক্রি করে। মাঝে মাঝে বলে, আমি রোজ ফুলের দানা গুনি।

ফুলের দানা কি?

এই পাতা, পাপড়ি, কাঁটা, ডাটা এইসব।

গুনিস কেন?

ভাত খাওয়া যাবে কিনা তার হিসাব করি।

ভাত খাওয়া যায়? না গেলেও যায়। আধা পেট-ভরা পেট ডুগডুগি ডুগডুগি

এমন ছন্দ মিলিয়ে গান গায় ভাইবোনেরা। এদের জীবনে বিয়ে তো শখই। মায়ের দিকে তাকিয়ে রেখার মনে হয় বিয়ের শখ একসময় মিটে যায়। একদিন ওর জীবনেও কি তাই হবে? বাশারকে এমন প্রশ্ন করলে ও বলেছিল, অভাবের বস্তা ঘাড়ে থাকুক আর মাথায় থাকুক, সামাল দেব। কিছু আসে যায় না। ভালোবাসার দানা ঠিকমতোই গুনব। পারবে না? পারব। ভালোবাসা একদিকে, অভাব একদিকে।

ঠিক।

কী অদ্ভুত স্বরে বলেছিল বাশার। ছোট্ট ঠিক শব্দটি নীলকণ্ঠ পাখি হয়ে উড়েছিল ওদের মাথার ওপর। একদিন বিকেলবেলা রানা প্লাজার পেছনে দাঁড়িয়ে এমন কথাই হয়েছিল দু'জনের। আশপাশে দিয়ে অনেকে হেঁটে গেছে। কেউ ওদের দিকে তাকিয়েছে। কেউ তাকায়নি। সামনের রাস্তা থেকে গাড়ির হর্ণ ভেসে এসেছিল। রিক্সার টুনটুন ধ্বনিও। ফেরিওয়ালাদের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। তারপর দু'জনে ফিরে গিয়েছিল কারখানায়। মেশিন আর কাপড়ের এক হওয়ার ঘরে আটকে ছিল দু'জনের নিঃশব্দ অনুভব। বুকের ভেতরে বেজেছিল ঠিক শব্দের ঘড়ি। দু'জনেরই মনে আশা ছিল যে ঠিক শব্দের ঘড়ি কোনোদিন যেন বন্ধ না হয়। তাহলে আর ঘরের মায়া থাকবে না। ঘর হয়ে যাবে মরুভূমি। এভাবেই দু'জনের সমঝোতার বলয় গড়ে ওঠে। মেশিনের শব্দ সে বলয়কে গ্রাস করতে পারে না।

গ.

বাশারের বাবা ফেরিওয়ালা।

সকালের দিকে শাকসবজি বিক্রি করে। বিকেলের দিকে বাদাম-বুট বা ঝালমুড়ি নিয়ে হাঁটে। নুন আনতে পান্তা ফুরিয়েছে এতকাল। বাশার চাকরিতে ঢোকার পরে সংসারের ভার খানিকটুকু কমেছে।

ছেলের প্রেমের কথা কানে আসার পর থেকে ইয়াছিন মিয়ার মুখ কালো হয়ে যায়। ছেলের সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলে না। ঘরে ঠিকমতো ঘুমুনোর জায়গা নেই বলে ও বাবার বাড়ি থেকে খানিকদূরে ঘর ভাড়া নেয়। নিজের মতো করে একা থাকার আনন্দ আছে। এটুকুই সান্ত্বনা ওর। টাকাপয়সার টানাটানি নিয়ে মাথা ঘামায় না। আশেপাশের সবাই মনে করে ছেলেটি অন্যরকম।

মা সফুরা খাতুনকে বিষণ্ন দেখলে ও মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, ভয় পেয়ো না মা। আমি তোমাদের বাড়া ভাতে ছাই দেব না।

সফুরা খাতুন বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, তোমার বিয়ের বয়সতো হয় নাই বাজান।

বয়স? আমার বয়স কত?

হিসাব তো রাখি নাই বাজান।

হা-হা করে হাসে বাশার। হাসতে হাসতে বলে, মাগো আমার বিয়ে আমি করব। যখন ইচ্ছা তখন করব। আপনি ভয় পাবেন না।

ভয় পাব কেন। ভয় পাব না বাজান। তোমার উপর আমার অনেক ভরসা।

আবার হা-হা হাসিতে বাড়ি মাতায় ও। অন্য ভাইবোনেরা যে যেখানে ছিল হাসি শুনে কাছে এসে জড়ো হয়।
কি হয়েছে? ভাইজান হাসছেন কেন?
তোদের ঝালমুড়ি খাওয়াব। যতক্ষণ খেতে পারবি ততক্ষণ খাওয়াব।
কখন খাওয়াবেন? আপনার টাকা আছে তো ভাইজান?
আছে রে আছে। তোরা আর কতটুকু খেতে পারবি। চল যাই।
চলেন এখনই। চলেন। ছোটরা বড় ভাইয়ের হাত ধরে টানাটানি করে।
দাঁড়া, দাঁড়া আজ একটা মজা করব।
কি মজা, ভাইজান?
বাবার কাছ থেকে ঝালমুড়ি কিনব। চল, আমরা সবাই সাভার বাজারে যাই।
চলেন। চলেন। আম্মা যাবেন?
না, আমি যাব না। তোদেরকে ঝালমুড়ি কিনতে দেখলে তোদের বাবা খুব অবাক হবে।
আর বাবাকে অবাক করব বলেইতো ওখানে যাওয়া।
আমরা আম্মার জন্য ঝালমুড়ি নিয়ে আসব। আম্মার যেতে হবে না।
সফুরা খাতুনের বিষণ্নতা কাটে না। ছেলেটি বিয়ে করলে সংসারে আবার অভাব দেখা দেবে। এই চিন্তা থেকে সে নিজেকে আলাদা করতে পারে না। গতরাতেও ইয়াছিন মিয়া ছেলের ওপর রাগ ঝেড়েছে। বিয়ের পোকা মাথায় ঢুকেছে, বলে খুব বাজে ভাষায় গালি দিয়েছে। দিনের আলোয় এমন গালির শব্দ মাথায় এনে লজ্জাই পাচ্ছে সফুরা খাতুন। রেখাকে তো কতবারই দেখেছে। কখনো দজ্জাল মেয়ে বলে মনে হয়নি। তারপরও সব মেয়েই বিয়ের আগে একরকম বিয়ের পরে অন্যরকম। নিজের সংসার বলে কথা। তখন স্বার্থ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। ভাবতে ভাবতে অবসন্ন বোধ করে সফুরা খাতুন। দূরের গাছে কাক ডাকে। আশেপাশের মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কারা যেন তারস্বরে ঝগড়া করছে। চেঁচিয়ে বলছে, নরক নরক। সফুরা খাতুন বোঝার চেষ্টা করে যে, নরক মানে কি? শব্দটি আগে কখনো শোনেনি। ভাবে, বাশারকে জিজ্ঞেস করে জানবে নরক মানে কী।

সফুরা খাতুনের মাথায় শব্দটি গেঁথে থাকে। কেন যে গেঁথে থাকে নিজেও তা বোঝে না। শুনতে পায় কাকের ডাক বেড়ে গেছে। হয়তো কোনো মরা ইঁদুর নিয়ে মারামারি করছে ওরা। সফুরা খাতুন ছোটবেলায় কাক ভালোবাসতো। ইঁদুরও ভালোবাসতো। প্রজাপতি, ফড়িংয়ের চেয়ে এগুলো ওর বেশি প্রিয় ছিল। কখনো কখনো বন্ধুরা ওকে নেংটি ইঁদুর ডাকতো। আসলেই তো ও একটি নেংটি ইঁদুর। কবে কোনদিন ধান জমানোর জন্য বিয়ের গর্তে ঢুকেছিল, সে গর্ত থেকে আর বের হওয়া হলো না। এখন তার বড় ছেলে বিয়ের-গর্তে ঢুকবে। জমাবে ধানের দানা। সেই দানা থেকে উড়কি ধানের মুড়কি হবে।
তারপরও সফুরা খাতুনের বিষণ্নতা কাটে না। নরক শব্দের মানে না জেনেও শব্দটা ইয়াসিন মিয়ার জন্য রাখে। যে বাপ ছেলে বিয়ে করবে দেখে মুখ খারাপ করে সেই বাপ একটা নরক। নিজে নিজেকেই বলে, আমি নেংটি ইঁদুর হয়ে ধান জমাই। তুমি নরক হয়ে ধান

পোড়াও, শূয়োর একটা।

ঘ.

কাজ থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে থাকে রেখা। ক্লান্তি আরও বাড়ে যখন ভাবে চুলো ভাগাভাগি করে রান্না করতে হবে। বাশার অবশ্য খাওয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না। যা রান্না হয় তাই খেয়ে খুশি থাকে।

টানা বারান্দায় পাশাপাশি সাতটি। বারান্দার মাথায় আছে গ্যাসের চুলো। কে কখন রান্না করবে সে ভাগটা নিজেরাই করে নিয়েছে। সেদিক থেকে কোনো ঝামেলা নেই। মাঝে মাঝে রেখাকে স্বস্তি দেয়ার জন্য বাশার হোটেল থেকে ভাত কিনে আনে। এটুকুতে খুশির সীমা থাকে না রেখার। ভাবে, ভালোইতো যাচ্ছে সংসার। অভাবের দাঁতের কামড় নেই। শ্বশুরবাড়ি-বাপেরবাড়িতে টাকাও দিতে পারছে। ভাইবোনেরা আসে। ওদের সিনেমা দেখাতে পারে। ঝালমুড়ির আসর বসাতে পারে। বাশার মাঝে মাঝে দু'টো রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার আনে। একটা গুলবানু, অন্যটা কাকপক্ষি। রেখা সবাইকে বলে, আমার সংসারে দু'জন কাজের লোক আছে। একজন গুলবানু, অন্যজন কাকপী। এটা শুনে ওর শাশুড়ি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটির কথা বোঝা যায় না। কি যে বলে, আর না বলে। তারপরও সফুরা খাতুন খুশি যে তার সংসারে ওরা ঠিকমতো টাকাটা দেয়।

মাঝে মাঝে অনুরাগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রেখা বলে, আমরা ভালো আছি, না?

আছিতো। তুমি আমার লক্ষ্মী বউ।

আর তুমি? তোমাকে কি বলব?

আমাকে? আমি একটা নাকাল স্বামী। বোটকা গন্ধের স্বামী।

ধুত! কি যে বল না!

তাহলে তুমি বলো আমি কী?

আমার হিরো।

ওয়াও-ও।

দু'জনের হুটোপুটিতে মেতে ওঠে সময়। নড়ে চৌকি। ঘর নড়ে এবং চৌকির নিচ থেকে বেরিয়ে আসে তেলাপোকা। রেখা বলে, ভালোবাসার দানা কি খুদকুঁড়ো?

হ্যাঁ, খুদকুঁড়ো। খুদকুঁড়ো হতে দোষ কী?

তা দিয়ে কী রান্না হবে?

লাল ভাত। রঙিন সুতো। সোয়েটার। টি-শার্ট। রঙিন জামা। জিনসের প্যান্ট।

ভালোই বলেছ।

এসবেই আমাদের ঘর-সংসার।

তাইতো। ঠিক বলেছো।

রান্না প্লাজা কী?

দৈত্য। ওটা দৈত্যদের বাসাবাড়ি। আমাদের শ্রম যায়। নেয় বেশি, দেয় কম।

ঠিক। ওটা আমাদের সংসারের বোঝা।

রেখার দীর্ঘশ্বাস উড়ে যায় ঠিক শব্দ নিয়ে। আছড়ে পড়ে সাভার বাজারের ওপর। এনাম হাসপাতালের প্রাঙ্গণে। নিউমার্কেটের দোকান ঘরে। রঙিন বেলুনের চত্বরে। আরিচাগামী সড়কে।

তারপরে আবার সকাল আসে দু'জনের সংসারে। রাত নামে, ভোর হয়। আবার দিনের শুরু। গ্যাসের চুলো জ্বলে ওঠে। হাঁড়িতে ফুটতে থাকা ভাতের দিকে তাকিয়ে চালের দানার হিসেব করে রেখা। ভাবে খাঁচা থেকে বের হওয়া কঠিন। তা বিয়ের আগেই হোক বা পরেই হোক!

বাইরের টিউবওয়েল থেকে কলসি ভরে পানি আনে বাশার। রেখা ভাতের মাড় গেলেছে। আলু ভর্তা বানিয়েছে। ডাল রান্না করেছে। শুকনো মরিচ পোড়ানোর ঝাঁঝ ঘুরপাক খায় ওর চারপাশে। ও দ্রুত হাতে কাজ সারে। ওকে কাজে যেতে হবে। কারখানার গেট পার হতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের আগে।

ছোট্ট ঘরের মেঝেতে বসে ভাত খেতে খেতে ও তাড়াহুড়োর সময় ভুলে যায়। সারাদিন তো পরিশ্রম। দু'চার কথা বলার সময় হয় না। এই ঘরের মেঝেতে এখন দু'জন মানুষের খুনসুটি। ফিক করে হেসে রেখা বলে, এই ঘরের জোড়া তেলাপোকার ডিম পাড়ার সময় হবে না?

বাশার ভ্রু উঁচু করে বলে, তেলাপোকা? হ্যাঁ, তেলাপোকার সময়তো হবে। তবে এখনই না। সময়ের হিসেব করতে হবে।

কবে? কবে রে তেলাপোকা?

দেখা যাক কবে। সময়তো করতেই হবে।

ঘরজুড়ে তেলাপোকার বাচ্চা। হাসতে থাকে বাশার।

বুড়ি হয়ে যাব না? বুড়ি হয়ে গেলে আর কি হবে?

একশ বছরেও জোয়ান থাকবি। তোর শখের মাথায় ফুলের বৃষ্টি ঝরুক।

ঠিক আছে আজ থেকে দিন গুনব একশ বছরের।

দু'জনে খাওয়া শেষ করে তড়িঘড়ি পোশাক কারখানার পথে নামে। দূর থেকেই দেখা যায় রানাপ্লাজা ভবনের চূড়ো। রোদের আলোয় দিনের বিকাশ। ভবনের চূড়া থেকে নেমে আসে চড়ুইয়ের ঝাঁক।

ঙ.

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে হয়। দেরি করার উপায় নেই। ওরা ভাবে ওদের পায়ের নিচে ঘূর্ণির চাকা আছে। দু'জনে নিজেদের কাজের জায়গা সাততলায় পৌঁছে যায়। যার যার কাজ শুরু হয়। মেশিনের পেছনে দাঁড়িয়ে কাজ করে। খানিকটা সামনে রেখা। পেছনে বাশার।

বেলা নয়টা।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। চমকে ওঠে বাশার। অন্ধকার চারদিকে। উৎকণ্ঠিত হয়ে ডাকে, রেখা।

এইতো আমি এখানে। বাশারের কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে রেখার বুকের ভেতর কাঁপন জাগে। যেন বাশার বলছে, বুড়ি হবি না। একশ বছরেও জোয়ান থাকবি। তখন তেলাপোকার বাচ্চারা .....

তখুনি দু'জনে টের পায় ভবন নড়ে উঠেছে। কখনো তো এমন হয়নি। হলো কি? ওরা দেখতে পায় মাথার উপর থেকে দালান ধসে পড়ছে। চারদিকে ভেঙে পড়া ছাদ ও দেয়ালের স্তূপ। আরও ভেঙে পড়ার আগেই বাশার দ্রুত এসে জড়িয়ে ধরে রেখাকে। ধসে পড়া দালানের অর্ধেক ভেঙে যাওয়া দেয়ালের ওপর কাত হয়ে পড়ে যায় রেখা। শরীরের অর্ধেকটা ধ্বংসস্তূপের ওপরে। পেছনে ঝুলে যায় মাথা। ওর চারপাশে পড়ে থাকা ইট-সিমেন্টের টুকরোর ওপর মাথা রাখে বাশার। ঝরে পড়া টুকরোর নিচে ঢাকা পড়ে ওর অর্ধেক শরীর। দু'জনের ভঙ্গিতে একশ বছরের পুরনো ঢং। চারদিকে ইটের স্তূপের মধ্যে দু'জনের শরীরে উপরের অংশ ঠিক আছে। তবে ততক্ষণে নিথর হয়ে গেছে রেখা। ওর পিঠের নিচে বাশারের বাম হাত। রেখার ডান হাত ভাঁজ হয়ে আছে বুকের ওপর। হাতভর্তি কাঁচের চুড়ি। দু'তিন রঙের মেলানো চুড়ি। পিঠে ধ্বংসস্তূপের বোঝা নিয়ে রেখার মাথার বাম পাশে বাশারের মাথা। মাথায় রডের আঘাতে বাম চোখ থেকে রক্ত গড়িয়ে নাক ছুঁয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। শরীরের স্পন্দন থেমে গেছে।

মহাকালের প্রলয় বয়ে যায় ভবনের উপর দিয়ে। ততক্ষণে রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। উদ্ধারকর্মী একজন থমকে যায় বাশার ও রেখার দৃশ্যের সামনে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। যেন শিল্পীর আঁকা অসাধারণ শিল্পকর্ম। যে দেখবে তাকে তাকিয়ে থাকতেই হবে। শিল্পকর্ম সবটুকু বোঝার জন্য। পাশের জনের হাত জড়িয়ে ধরে বলে, দেখো চোখের জলের বদলে রক্তজল। আমি চোখে এমন রক্তের রেখা দেখিনি।

অন্য উদ্ধারকর্মী বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, কী অপূর্ব দেখাচ্ছে ওদের। মৃত্যুর এমন দৃশ্য আমি দেখিনি। মনে হচ্ছে ওরা ঘুমিয়ে আছে। ভোর হলে জেগে উঠবে।

এমন দৃশ্য আমিও দেখিনি। ওদেরকে একজোড়া পাখির মতো লাগছে।

চলো ওদেরকে উদ্ধার করি।

না, ওদেরকে এখনই আলাদা করতে পারব না। ওরা থাকুক এভাবে। অন্যরা এসে দেখুক মৃত্যু কত সুন্দর হতে পারে। ধ্বংস মৃত্যুকে যে থ্যাঁতলাতে পারে না তাই দেখা হলো। হায় আল্লাহ!

দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকে সে দৃশ্যের সামনে। ওরা নিজেদের অনেক কাজের কথা ভুলে যায়।

কালো কৃষ্ণচূড়া

আন্না হাসান
অফিসার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আজ সিঁথির বিয়ে। ও অনেক খুশি। কিশোর ওর কথা রেখেছে। তবে সিঁথির একটু খারাপ লাগছে ওর বাবা-মা-দিদি-ছোট ভাইকে রেখে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে পালাতে। কিন্তু কী করবে- কিশোরকে ছাড়াও থাকতে পারবে না ও। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিশোরের সাথেই সে ঘর করবে।

কিশোর একটা ফুলের দোকানে চাকুরি করে, আর সিঁথি ব্যাবিলনে। দু'জনের যা টাকা রোজগার হবে তাতে ভালোই চলবে। সিঁথি কিশোরের কথামতো নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, কোরআন-নামাজ সব শিখতে শুরু করে দিয়েছে।

কিশোরের বাড়ির উঠানে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে। ফুলগুলো লাল টুকটুকে। কিশোর আর সিঁথি সেখানে আরও কিছু ফুলের গাছ লাগাবে; সারাদিন ফুলের গন্ধে বাড়িটা ভরে থাকবে। কিশোর সিঁথিকে বিয়ে উপলক্ষে একটা লাল টুকটুকে শাড়ি কিনে দিয়েছে।

বিকেল ঠিক চারটায় কিশোর এল। সিঁথিকে বলল তৈরি হতে। সিঁথি লাল টুকটুকে শাড়িটা পরে জলদি তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল। একটা কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করে নিল ওরা। বিয়ে শেষ করে বেরিয়ে এসে কিশোর সিঁথিকে বলল- তুমি তোমার বাসায় যাও। সিঁথি বলল, কেন? আজ তো তোমার বাসায় যাওয়ার কথা ছিল। কিশোর বলল- তুমি যাও, আমি একটু ঘুরে এসেই তোমাকে বাসায় নিয়ে যাব। সিঁথি বলল- এখন আবার যাবে? কিশোর অনেক বুঝিয়ে সিঁথিকে রিক্সায় তুলে দিল। সিঁথির অনেক খারাপ লাগছিল, কান্নাও পাচ্ছিল। আজকের দিনটাতে কিশোর না গেলেও পারত।

রাত এগারটা। সিঁথি সেই বিকেল থেকে সেজেগুজে বসে আছে নতুন কাপড় পরে। এতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়? সিঁথি কতদিন থেকে এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাছাড়া কিশোরও বলেছিল সিঁথিকে লাল শাড়িতে অনেক সুন্দর দেখায়। ওকে না দেখিয়ে শাড়িটা সিঁথি কী করে খুলে রাখবে। বিয়ের সময় কিশোর ভালো করে সিঁথির দিকে একবার তাকিয়ে দেখেওনি। কিন্তু সময়টা এলেও কিশোর কেন জানি লুকোচুরি খেলছে। সিঁথি পথের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না।
পাশের ঘরের মেয়ে ময়না সিঁথিকে মনে হয় একটু হিংসা করে। কিশোরকে মনে হয়

ভালোবাসে মেয়েটা। সিঁথি যখন কাজি অফিস থেকে বিয়ে করে ফিরে এসেছে তখন থেকেই একই কথা বলছে- তোমরা কি আসলেই বিয়ে করেছ, নাকি খালি খালি বলছ? কিশোরের নামে অনেক বাজে কথা বলে সিঁথির কান ভারী করার চেষ্টা করল ময়না। কিন্তু সিঁথি ওইসব বিশ্বাস করে না, কারণ সিঁথি জানে কিশোর ওকে কখনো ঠকাবে না।

রাত বারটা। সিঁথির খুব খারাপ লাগছে। কিশোর এখনো আসছে না কেন? রাস্তায় কোনো বিপদ হয়নি তো? না না ভগবান যেন এমনটা না করেন। এই যা আবারও ভগবান বলে ফেললাম, কিশোর জানলে খুব রাগ করবে। অনেক দিনের অভ্যাসতো তাই এমন হচ্ছে। আল্লাহ যেন এমনটা না করেন। এইবার ঠিক আছে।

রাত সাড়ে বারটা। সিঁথির চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল, শুনতে পেল দরজায় কেউ ডাকছে। সিঁথি জলদি গিয়ে দরজা খুলে দিল। সিঁথি দেখতে পেল কিশোর খুব বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরকে দেখে সিঁথির খুব মায়া হলো। সিঁথি খেয়াল করে দেখল, কিশোর ওর দিকে তাকাচ্ছে না। সিঁথি বলল- কি হলো, ভেতরে আসো। কিশোর ছোট বাচ্চার মতো ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে পড়ল।

সিঁথি ঃ কিছু হয়েছে? মুখটা এমন করে আছ কেন? দোকানের চাচা বকেছে? কিছু না বললে বুঝব কি করে?
কিশোর ঃ একটু পানি খাওয়াতে পারবে?
সিঁথি ঃ এভাবে বলছ কেন? আনছি বসো।
সিঁথি দেখল কিশোর কেমন এক নিঃশ্বাসে পানি খেয়ে ফেলল।
সিঁথি ঃ এখন বলো কি হয়েছে?
কিশোর ঃ আমি তোমাকে একটা উপহার দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না।
সিঁথি ঃ আবার উপহার লাগবে কেন? এটার জন্য তুমি এত রাত করে ফিরলা?

সিঁথি লক্ষ্য করল, কিশোরের মুখটা আরো বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছিল। তাই কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কী উপহার ছিল? সিঁথি দেখল কিশোরের মুখটা কেমন কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেছে।
কিশোর ঃ আমি ফুলের দোকানের চাচাকে বলে রেখেছিলাম আজ আমাদের বিয়ে, তাই কিছু ফুল লাগবে। চাচা বেশ খুশিই হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমার যত ফুল লাগে নিয়ে যেও। চাচা আমাকে তখনই নিতে বলেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম বিকেলে নিয়ে গিয়ে সাজাব, যাতে অনেকক্ষণ থাকে। জীবনে অনেক বিয়ের ঘর সাজিয়েছি, ইচ্ছে ছিল তোমার জন্যেও সাজাব। কিন্তু পারলাম কই? সব কাজ শেষ করে যখন বের হব ফুলগুলো নিয়ে, ঠিক তখনি একটা বড় গাড়ি এসে আমাদের দোকানের সামনে দাঁড়াল। কয়েকজন নেমে এসে বলল ফুল লাগবে। দোকানে তখন আমার ফুলগুলো ছাড়া আর কোনো ফুল নেই।

চাচা প্রথমে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন আজ আর ফুল হবে না। শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ওরা ফুল না নিয়ে যাবে না। বলল, যা দাম আছে তার দ্বিগুণ দিবে। চাচা তবুও রাজি ছিলেন না, কিন্তু ওদের পীড়াপীড়িতে না দিয়ে পারলেন না। ফুলগুলো সব নিয়ে গেল। আমি কিছুই বলতে পারলাম না।

সিঁথি ঃ আমাদেরতো বিয়েটাতেই অনেক বাধা ছিল। শেষ পর্যন্ত যে বিয়েটা হলো এতেই আমি খুশি। আমার আর কিছু লাগবে না।
কিশোর ঃ তা ঠিক আছে, কিন্তু.. আচ্ছা থাক চলো।
সিঁথি ঃ চলো মানে, এত রাতে কোথায় যাব?
কিশোর ঃ কোথায় যাব আবার কি? আমার বাড়িতে। সে রকম কথাই তো ছিল।
সিঁথি ঃ হ্যা, তা ঠিক, আজতো রাত হয়ে গেছে, কাল সকাল বেলায় গেলে হয় না?
কিশোর ঃ না না, আমার বাড়িতেই থাকব আজ। জলদি চলো।

সিঁথি কিছু না বলে ব্যাগটা নিয়ে এল। সিঁথি মনে মনে ভাবতে লাগল এখানে তো কাউকে বলার নেই, কারো কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়ারও নেই। এতক্ষণে বাড়িতে সবাই হয়তো জেনে গেছে। নিশ্চয় মা অনেক কান্নাকাটি করছেন, আর বাবা মনে হয় আমাকে অনেক বকছেন।
কিশোর ঃ কি হলো, চলো...
সিঁথি ঃ হ্যা হ্যা, চলো।

রিক্সা ঠিক কিশোরের বাসার সামনে এসে দাঁড়াল। কিশোর ভাড়া দিচ্ছিল। সিঁথি ভাবল ও ভাড়া দিয়ে আসতে আসতে আমি ভেতরে ঢুকি। কিন্তু যেই না সিঁথি পা বাড়াল কিশোর বলল, দাঁড়াও একসাথে যাচ্ছি। কিশোর এসে তালা খুলে বলল, তুমি দাঁড়াও আমি আসছি। সিঁথি ভাবল হয়তোবা বউ বরণ করার কোনো নিয়ম ওদেরও আছে। সিঁথিদের যেমন বউ বরণ করতেই দুই ঘন্টা সময় লেগে যায়। কিশোর মনে হয় ওকে বরণ করেই ঘরে তুলবে। সিঁথি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল আকাশে আজ পূর্ণিমা চলছে। বাহ! বেশ ভালো দিনেই বিয়েটা হয়েছে তবে। সিঁথি কিশোরের আওয়াজ শুনতে পেল। কিশোর সিঁথিকে ভেতরে যেতে বলছে।

কিশোর ঃ ব্যাগটা রেখে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এসো।
সিঁথি দরজা লাগাতে লাগাতে ভাবল, কই তাকে তো বরণ করা হলো না, তবে ভেতরে কী করছিল কিশোর?
ব্যাগটা রেখে সিঁথি খাটের উপর বসল। জানালা দিয়ে তাকাতেই সিঁথির চোখ থমকে গেল...। এত সুন্দর ফুলের বিছানা সিঁথি আগে কখনো দেখেনি। কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে একটা সাদা ধবধবে চাদর পাতা, তার উপর টপটপ করে কৃষ্ণচূড়া পড়ছে। বিছানাটা হয়তো অনেকক্ষণ থেকে পাতা, নইলে এত ফুল জমত না। আলো সব নিভানো। চাঁদের

আলোয় বেশ অপূর্ব লাগছিল।

সিঁথি ঃ এত সুন্দর করে সাজিয়েছ, বেশ ভালো লাগছে।
কিশোর ঃ কি করব, ফুলগুলো পেলাম না- তাই ভাবলাম এই জিনিসটা খারাপ হবে না।
সিঁথি সত্যি খুব ভাগ্যগুণে এমন মানুষ পেয়েছে, বাবা-মা থাকলে বুঝানো যেত- দ্যাখো আমি ভুল করিনি।

সিঁথি আর কিশোরের দাম্পত্য বেশ ভালোই চলছে। আদর-আহ্লাদ-হাসি-অভিমান-খুনসুটিতে রঙিন জীবন দু'জনের। প্রতিদিন সকালে রান্নাবান্না শেষ করে খেয়েদেয়ে কাজে চলে যায় দু'জন। আবার সন্ধ্যায় সিঁথি এসে রান্না করে কিশোরের জন্য অপেক্ষা করে। কিশোর অনেক রাতে আসে।
প্রতিদিনের মতো সিঁথি সেদিনও এসে রান্না বসাল। পাশের বাড়ির চাচি রিমার মা হন্তদন্ত হয়ে সিঁথির কাছে ছুটে এল।

সিঁথি ঃ কি চাচি কেমন আছেন? চাচি কোনো উত্তর দিলেন না।
চাচি ঃ কিশোর কই?
সিঁথি ঃ দোকানে চাচি। কোনো কিছু লাগবে?
চাচি ঃ দ্যাখো তো ফোন কইরা আছে কি না?
সিঁথি ঃ কেন চাচি কি হয়েছে, আমাকে আগে বলেন?
চাচি ঃ শুনলাম, শাহবাগের ঐ দিকে মারামারি হইছে। একজন নাকি মারাও গেছে। কিশোর তো ঐখানেই কাজ করে। টেলিভিশনে দেখাইতাছে।

সিঁথির ভেতরে তোলপাড় চলছে। নিজেকে সামলে নিয়ে টেলিভিশনের চ্যানেল ঘোরাতে থাকে সিঁথি। হঠাৎ স্ক্রলবারের দিকে তাকিয়ে সে স্থির হয়ে যায়। শাহবাগে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের গোলাগুলি, কিশোর নিহত। সিঁথি নির্বাক হয়ে যায়। হঠাৎ কিশোরের আওয়াজ আসে। সিঁথি, এক গ্লাস পানি দাও। আজ মরতে বসেছিলাম। তোমার ভালোবাসার জোরে বেঁচে আসতে পারলাম।

সিঁথির ঘোর তখনও কাটেনি।

EXIM BANK
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক
অ ব বাং লা দে শ লি মি টে ড
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক
পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন যেমনটা আপনার চাই
আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিকতায় এক্সিম ব্যাংকের
আকর্ষণীয় আমানত হিসাবসমূহ
ক্যাশ ওয়াক্ফ আমানত
শান্তি-পারলৌকিক মুক্তি"
মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প
"আপনার হজ্জ হোক স্বাচ্ছন্দ্যময়"
এক্সিম রুহামা
"তিন বছরে দ্বিগুণ (প্রাক্কলিত)"*
এক্সিম যিয়াদাহ
"পাঁচ বছরে তিনগুণ (প্রাক্কলিত)"*
*শর্ত প্রযোজ্য
মাসিক আয় আমানত প্রকল্প
মুনাফা যখন উপার্জনের সাথী"
সুপার সেভিংস
প্রকল্প
আগামীর পথে"
এক্সিম সু-গৃহিনী
"সাংসারিক ব্যস্ততার মাঝে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি"
এক্সিম ফেমিনা
"আজকের আমানতে আগামীর নিশ্চয়তা"
এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
আগামীর আত্মবিশ্বাস"
স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
মাসিক স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী প্রকল্প
মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
"সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের স্বপ্ন"
মুদারাবা মাল্টিপ্লাস সেভিংস আমানত প্রকল্প
"দীর্ঘমেয়াদে তিনগুণ মুনাফা"
দেনমোহর/
আমানত প্রকল্প
স্ত্রীগণকে তাদের দেনমোহর
দাও"
নিসা, আয়াত ২৫
আল ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত
"আমানত থাকুক সুরক্ষিত"
মুদারাবা মেয়াদী আমানত
"মেয়াদ শেষ তো মুনাফা শুরু"
সিনিয়র
আমার অবলম্বন"
সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প
মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
"সঞ্চয়ের শুরু এখানেই"
মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
"মাসিক সঞ্চয়ে বার্ষিক মুনাফা"
স্বপ্নপূরণের পথে"
হাউজিং/অন্ট্রাপ্রেনারশিপ
প্রকল্প
এক্সিম কৃষি
"সঞ্চয়ের বীজে বাড়ুক সমৃদ্ধির ফসল"
মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
কলসেন্টার: ১৬২৪৬
www.eximbankbd.com

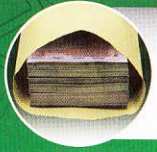

with the best compliments

FALCON VENTURE LIMITED

We specialize in

100% Virgin Kraft Liner Paper
Semi-chemical Fluting Paper

Kraft Liner Paper ◆ Medium Paper ◆ Test Liner Paper ◆ Duplex Board
◆ Art Paper ◆ Sack Kraft Paper ◆ Corrugel SC Powder
◆ Tapioca Starch and Other Quality paper of world famous brands
◆ Rotogravure & Flexo Printing Ink
&
All kinds of Printing & Packaging Machineries

VISY FOR A BETTER WORLD
Australian Paper
GP
BILLERUDKORSNÄS
mondi
正隆股份有限公司 CHENG LOONG CORP
LEKOK 利國造紙有限公司 LEKOK PAPER SDN BHD

From Australia, Europe, Canada, USA, Malaysia, Taiwan, Korea & other countries

You can reach us...

FALCON

FALCON VENTURE LIMITED
bridging you with quality paper

Dhaka Office
House- 436 (4th floor), Road- 30
New DOHS Mohakhali, Dhaka-1206

Tel : 02-882308, 8824684, 031-2516995
Fax : 02-8811245
E-mail : nhmasum@falconventureltd.com

Chittagong Office
232 Commerce College Road
Agrabad C/A, Chittagong

www.falconventureltd.com

ঝুঁকিমুক্ত সম্পদ সমৃদ্ধির সোপান
বীমা নিরাপত্তাই এর সর্বোত্তম বিধান

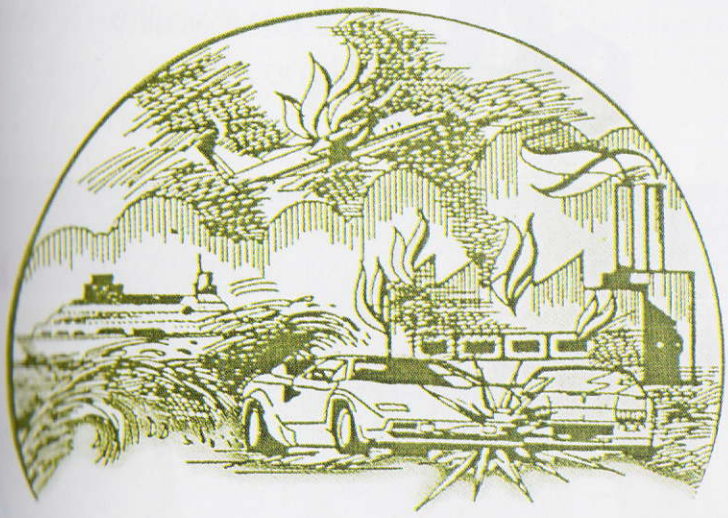

পেশাগত দক্ষ সেবাই আমাদের আদর্শ
সর্বোত্তম বীমা নিরাপত্তাই আমাদের উদ্দেশ্য

অগ্নি, নৌ, মটর এবং বিবিধ বীমার
জন্যে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
CENTRAL INSURANCE COMPANY LTD.

সিআইসি টাওয়ার (৪র্থ ও ৫ম তলা), ৭-৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ফোন : পিএবিএক্স: ৯৫৬০২৫১-৪
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬৭৪২১-২, ই-মেইল : cic@cicl-bd.com ওয়েবসাইট : www.cicl-bd.com

We congratulate Babylon Group on
10th publication of Babylon Kathokata

HUNTSMAN
Enriching lives through innovation

Sustainability
Innovation
Collaboration

Pioneering a Sustainable
Textile Industry

At Huntsman Textile Effects, we are leading the change and pioneering a sustainable textile industry through our cutting edge innovation and by collaborating with all stakeholders across the entire textile value chain.

Swiss Colours Bangladesh Ltd
(Agents for Huntsman Singapore Pte Ltd)
Ahmed Tower (3rd Floor), House# 54/1, Road# 4/A
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, Bangladesh.
Tel: +880-2-8618428, 8618390
E-mail: info@swisscolours.com

We congratulate Babylon Group on 10th publication of Babylon Kathokata.

ECONOMY TRAVEL & TOURS AGENCY

We invite you to contact with us for:

- VISA PROCESSING
- AIR TICKET
- TOUR PACKAGE

Address: Baitul Abed (3rd Floor), 53 Purana Paltan,
Dhaka, Bangladesh
Phone: 7117237, 01915-604554, Fax: 9565159.

ব্যাবিলন কথকতার গৌরবময় দশ বছর-
আমরা অভিনন্দন জানাই... ।

এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর রেটিং - 'এ' অর্জন

এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড তৃতীয় প্রজন্মের দ্রুত বিকাশমান নন-লাইফ বীমা কোম্পানী। ৩১/১২/২০১৩ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে 'ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেসন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড' (CRISL) কোম্পানীকে 'এ' রেটিং প্রদান করেছে।

দাবী পরিশোধের সক্ষমতা - 'এ' কোম্পানীর বীমা দাবী পরিশোধের উচ্চ সক্ষমতা নির্দেশনা করে।

কোম্পানীর আর্থিক ও টেকনিক্যাল কার্যক্ষমতা, আর্থিক তারল্য, বহুমূখী বিনিয়োগ, শেয়ার বাজারে প্রবেশের প্রচেষ্টা, স্থায়ী আমানতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষন ও বিবেচনা করে কোম্পানীকে আলোচ্য- 'এ' রেটিং প্রদান করা হয়েছে।

৩১/১২/২০১৪ তারিখে সমাপ্ত বৎসরে কোম্পানী ৪২০.৩৪ মিলিয়ন টাকা মোট প্রিমিয়াম, ১১৫.৭৯ মিলিয়ন টাকা নীট মুনাফা অর্জন এবং শেয়ারধারীদের জন্য ২০% শেয়ার লভ্যাংশ প্রদান করেছে। একই সময়ে কোম্পানীর পরিশোধীত মূলধনের পরিমাণ ৩৯১.১৮ মিলিয়ন টাকা, বিনিয়োগ ৫৪০.৪৪ মিলিয়ন টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ৯৭৪.৮৬ মিলিয়ন টাকা।

এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
EXPRESS INSURANCE LIMITED
Head Office : Al-Razi Complex (9th & 10th Floor),166-167, Shahid Syed Nazrul Islam Sarani, Bijoynagar, Dhaka-1000

Are You Looking For the right Insurance Company To help you to expand your business and to get Insurance Claims smoothly after an accident?

We are the right Insurance personnel

Express Insurance Limited

Naya Paltan Branch

INSURANCE SOLUTION

- Marine Insurance
- Fire Insurance
- Motor Vehicle Insurance
- Miscellaneous Insurance

Address:

S.M.KHURSHID ALAM
Asst. Managing Director &
Br. In-Charge

Express Insurance Ltd.
Naya Paltan Branch
Navana Rahim Ardent, Suit B2
(2nd Floor)185,Shahid Syed Nazrul Islam Sharani,Bijoynagar, Dhaka-1000.
Mobile:01817-549875,01617-549875
Tel: 9343151,9361657
Fax:880-2-9343251

Head Office: Al-Razi Complex (9th & 10th floor) 166-167, Shahid Syed Nazrul Islam Sharani, Bijoynagar,Dhaka-1000. PABX:9554421,9561255,9569546,9557196, Fax: 88-02-9568616. Email:express_insurance@ymail.com , info@eilbd.com,

Visit us:www.eilbd.com

brother
at your side

NEXIO

S-7300A

Single Needle Direct Drive Lock Stitcher with Electronic Feeding System and Thread Trimmer

High quality sewing / Reduction of disposition of thread ends / Equipped the color LCD touch panel for intuitive operation / Offers a new value with Design Stitch Enhances the operability with new Hand Switch

BROTHER INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD

Dhaka Liaison Office
Mahmoods Bhaban (2nd Floor)
25/B, Lake Drive Road, Sector-7,
Uttara Model Town, Dhaka-1230
Tel: 88 02 8962453, 8962471
Fax: 88 02 8962457
E-mail: raihan@brother.com.bd
Website: www.brother.com.sg

Chittagong Liaison Office
IFCO Complex (5th Floor)
1147/A, East Nasirabad
CDA Avenue, Chittagong
Tel: 880-31-2550052
Fax: 880-31-655363

Narayanganj Liaison Office
Shopno Mahal
Road-2, House-2, Block-A
Afaznagar, Fatullah, Narayanganj
Tel: 88 02 7670531
Fax: 88 02 7670532
E-mail: nganj@brother.com.bd

রানা-প্লাজা

মোহাম্মদ হাসান
জেনারেল ম্যানেজার
ব্যাবিলন গ্রুপ

রানা-প্লাজা ধসে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে নানামুখী ব্যাখ্যা বাজারে চালু আছে। কেউ বলছেন, ১১১৪ জনের জীবন বাংলাদেশের চার মিলিয়ন পোশাক-শিল্পকর্মীর জীবনকে রক্ষা করে দিল। পোশাকশিল্পের জঞ্জাল পরিস্কার হয়ে নতুনভাবে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পকে বিশ্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে। এইখাতে সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পাবে। দুর্বল ও ছোট কারখানাগুলো বন্ধ হলেও বড় ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম কারখানাগুলো আরো বড় হবে।

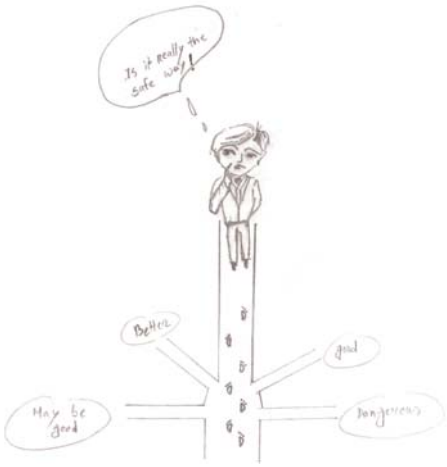

কেউ বলছেন, ঐ দুর্ঘটনা এ দেশের পোশাকশিল্পকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আট মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানকে অনিশ্চিত করে দিল। যেসব প্রতিষ্ঠান ধকল সহ্য করে টিকে থাকবে, তাদের মাধ্যমে অধিকতর কম মূল্যে পণ্য তৈরি করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। কাজের সরবরাহের ঘাটতির কারণে প্রস্তুতকারকদের মধ্যেও অনৈতিক-অযৌক্তিক প্রতিযোগিতার পুরো সুযোগ পুঁজিবাদের ধারকেরা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করবে।

ভবিষ্যৎ যাইহোক, এ শিল্পের বর্তমানটা যে ভালো যাচ্ছে না সেটা স্পষ্ট। রানা-প্লাজা পরবর্তী ঘটনায় সমস্যায় পড়েছে আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণি, যাদের কর্মসংস্থানের বিকল্প কোনো জায়গা এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। প্রায় দুইশত কারখানা বন্ধ, বড় বড় কারখানা থেকে শ্রমিক ছাঁটায়ের ফলে চল্লিশ হাজার শ্রমিককে বেকারত্ব (পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে) বরণ করতে হয়েছে। সকাল গড়িয়ে দুপুর পর্যন্ত, চাকুরির আশায় প্রতিদিন কারখানা গেটে শত শত মলিন মুখের করুণ দৃষ্টি প্রমাণ করে পোশাকশিল্পের বিকল্পহীনতা। গ্রামে ফিরে যাওয়ার ন্যূনতম সম্বলটিও তাদের নেই। এতসব মন্দের মধ্যেও শিল্পের জন্য ভালো দিকটি হলো শ্রমিক তার দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে- যা সার্বিকভাবে কারখানার উৎপাদনশীলতায় ইতিবাচক অবদান রাখছে। ক্রেতাগণের কম মূল্যে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা সত্ত্বেও শ্রমিকের দক্ষতা মালিকের মুনাফাকে আগের অবস্থায় রাখতে অনেকটাই সহায়তা করেছে। অথচ পূর্বে এ দক্ষতা বৃদ্ধির নানা কৌশল পরাজিত হলেও এবার শ্রমিক

নিজের চাকুরির স্বার্থেই সময়ের প্রয়োজনীয় কাজটি করে যাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় যা করার কথা, চাপে না পড়লে তা না করার সংস্কৃতি আমাদের যেন চিরন্তন।

অন্য ভালো দিকটি হলো শ্রমিকের কর্মসংস্থান পরিবর্তনের প্রবণতার (migration) হ্রাস। রানা-প্লাজা পরবর্তীতে এই (বদ) অভ্যাসটির যেন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য চাকুরির অপ্রতুলতাই এই শ্রমের স্থিতি অবস্থার বড় কারণ বলে অনেকেই মনে করেন।

তাজরিন ফ্যাশন, রানা-প্লাজা দুর্ঘটনা পূর্ববর্তী সময়ে কারখানা নিরীক্ষার মূল উপজীব্য ছিল সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স এবং তার সাথে পরিবেশগত বিষয়াদি। শ্রমিকের কাজের ঘরটি কারো-বিশেষ করে আমাদের ক্রেতাসাধারণের বিশেষ বিবেচনার বিষয় ছিল না। হতে পারে উন্নত বিশ্বে ক্রেতাদের মনে ভুলেও প্রশ্ন জাগেনি নিজের ঘরকে মানুষ কীভাবে অপরিকল্পিত, নিয়ম-বহির্ভূতভাবে তৈরি করতে পারে- যেটা একদিন তার নিজের উপরেই ভেঙে পড়তে পারে। ক্রেতাতরফে হয়তো এটাও ধারণায় ছিল না যে, ২০০৫ সালের স্পেকট্রাম সুয়েটার ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনা থেকে আমরা কোনো শিক্ষা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি। তাহলে হয়তো তাদের অডিট চেকলিস্টে ভবন নির্মাণ এবং অগ্নি-প্রতিরোধমূলক বিষয়গুলো আরও ব্যাপক এবং নিবিড়ভাবে আসতে পারত এবং রানা-প্লাজা ও তাজরিন ফ্যাশনের এ রকম বড় দুর্ঘটনা হয়তো এড়ানো যেত। আমাদের চাপ না থাকলে নিয়ম না মানার সংস্কৃতির পাশাপাশি শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা এবং কারখানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দু'টি ইতিবাচক বিষয় আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে এটা যোগ করা যায় যে, আমাদের মালিকগণও সেই সংস্কৃতির বাইরে নন। কারখানা ভবন এবং অগ্নি-প্রতিরোধমূলক বিষয়ে যেমন ফায়ার ডোর, হাইড্রেন্ট এবং স্প্রিংকলার সিস্টেমের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা কেউ অনুসরণ করেনি। আমাদের অতীত থেকে শিক্ষা না নেওয়ার সংস্কৃতির বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং ব্যবসার ধারাবাহিকতার স্বার্থে কারখানা ভবন নির্মাণ এবং অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিজেদের তদারকিতে মূল্যায়নের জন্য ইউরোপীয় ক্রেতাদের সমন্বয়ে 'অ্যাকর্ড অন ফায়ার এ্যান্ড বিল্ডিং সেইফটি' এবং অ্যামেরিকান ক্রেতাগণ 'এলায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেইফটি' নামে দু'টি তদারকি সংস্থা জন্ম নেয়। সংগঠন দু'টি বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের {ভবন কাঠামো (structural), বৈদ্যুতিক (electrical) এবং অগ্নি-নিরাপত্তা (fire safety)} বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ বিষয় নির্ধারণে নিরীক্ষা শুরু করে।

সেক্টরটি নিয়ে ব্যক্তিগত বিশেষ আগ্রহ এবং পেশাগত কারণে তাদের ইন্সপেকশনের বিষয় জানার সুযোগ ঘটে এবং অগ্নি-ব্যবস্থাপনার বিশেষ অনুসঙ্গ 'ফায়ার রেটেড ডোর' বিষয়ে আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির বিষয় তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করি। রানা-প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে এ দেশের পোশাকশিল্পের ক্ষতি সাধনের বিপরীতে নতুন ধরনের ব্যবসার বিস্তার ঘটে। কারখানাসমূহে প্রকৌশলীদের (বিশেষত সিভিল এবং

ইলেকট্রিক্যাল) কদর বাড়ে, রাতারাতি শত শত পরামর্শ (কনসালটেন্সি) সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। 'অ্যাকর্ড এবং বিজিএমইএ' তাদের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা প্রকাশ করে এদের বৈধতা দান করে। যে কয়টি পুরোনো এবং অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা এ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে অথবা না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পোশাক মালিকদের 'সস্তা খোঁজা' অর্থাৎ ন্যূনতম মজুরীর ন্যায় ন্যূনতম খরচে ব্যয়বহুল কাজটি করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা এবং নতুনদের সস্তা সরবরাহের প্রতিযোগিতা পুরোনোদেরকে পিছে ফেলে দেয়। সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সের ন্যায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও মালিকেরা ক্রেতাদের 'চাহিদা পূরণ' হিসেবে দেখছেন। শ্রমিকদের জীবন রক্ষা, কাজের উন্নত পরিবেশ তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। বাংলাদেশের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিএনবিসি (BNBC), অ্যাকর্ড ও এলায়েন্স- এদের নির্দেশনার ভিন্নতার ব্যাখ্যার দিকে না গিয়ে বাস্তব কিছু উদাহরণ পাঠকদের বিষয়টি অনুধাবনে সহায়তা করবে বলে মনে করি। ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকেই যে সকল কারখানায় অগ্নি-প্রতিরোধক দরজা স্থাপিত হয়েছে অথবা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখে, কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার এবং এই বিষয়ে পরামর্শ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কথা বলে আমার মনে হয়েছে 'ফায়ার ডোর' শ্রমিকদের জীবন রক্ষার চেয়ে মরণ ফাঁদ হিসেবে দেখা দিতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসহ কারখানা কর্তৃপক্ষ কারোরই এ বিষয়ে পূর্বাভিজ্ঞতা নাই অথবা সীমিত। একটি তৈরি ভবনের এই কাজটি করার ক্ষেত্রে কারখানার অভ্যন্তরে পরিবর্তন, পরিবর্ধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফায়ার ডোরের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন করে ৫ ইঞ্চি-১০ ইঞ্চি ইটের দেয়াল নির্মাণের মাধ্যমে ভবনে বাড়তি লোড চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত অংশে দেয়াল তোলায় এ্যাসেম্বলি (assembly) লাইন ব্যবস্থাপনায়ও অসুবিধা হচ্ছে। পূর্বের খোলামেলা এবং প্রশস্ত বাহির পথকে ফায়ার ডোরের কারণে সরু করে ফেলা হচ্ছে। শিল্প স্থাপনের জন্য নির্মিত ভবনের কোনো অংশে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ ব্যাপার। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা লোড ক্যালকুলেশন অত্যাবশ্যক, অথচ আইনগত এবং অত্যাবশ্যকীয় দিকটি ছাড়াই চলছে ফায়ার ডোর স্থাপনের আদেশ পালনের কর্মযজ্ঞ।

কথা হচ্ছিল একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এক প্রকৌশলীর সাথে, যিনি কয়েকটি কারখানায় ফায়ার ডোর ডিজাইন, সরবরাহ এবং স্থাপনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ভদ্রলোকের মতে, একটি কারখানায় যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখন অধিকাংশ মানুষই বেরিয়ে আসতে পারে। অল্পসংখ্যক মানুষ আটকা পড়ে। তার মতে, বর্তমান অবস্থায় ঘটনাটি ঘটবে তার উল্টো। সেই অল্পসংখ্যক লোকের জন্য একটি নির্দিষ্ট সিঁড়িকে ধোঁয়ামুক্ত করলেই শ্রমিকেরা সহজেই নেমে আসতে পারত। কিন্তু ভবনের সকল সিঁড়িকে ধোঁয়ামুক্ত দরজায় আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে অধিকাংশ মানুষকেই আটকে ফেলার বিপদে ফেলে দেয়া হচ্ছে। ভদ্রলোক আরো বলেন, সস্তা দাম আর সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানের স্বল্পতা

এক সময় বিপদের কারণ হতে পারে। এমন অনেক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা অবস্থাকে একটা সুযোগ ভেবে অল্প সময়ে কিছু কামিয়ে নেয়ার মানসিকতা থেকে এ ব্যবসায় এসেছেন। তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার দারুণ অভাব রয়েছে। একদিকে যেমন দরজা স্থাপনের সর্বোত্তম কৌশলটি তাদের জানা নেই, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে তাদের সেবা পাওয়া যাবে কি না, সেটা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকে।

কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারদের সাথে কথা বলে জানা যায়, পূর্বে প্রতিটি ফায়ার ড্রিলে কারখানায় সকল শ্রমিক নেমে আসতে যে পরিমান সময় (সাধারণত ২-৩ মিনিট) লাগত, বর্তমান অবস্থায় আরও বেশি সময় লাগবে। কোনো কোনো কারখানায় দরজার সাথে একটি অতিরিক্ত হুক জয়েনের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় সর্বক্ষণ খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু ফায়ার এলার্ম বাজার সাথে সাথে দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। দরজা প্রতিবার পুশ করে বের হতে বেশি সময় প্রয়োজন হবে। আতঙ্কে, হুড়োহুড়িতে দরজার সামনে একটি অনাহুত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তাদের মতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, মানসম্মত দরজা এবং নতুন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ফায়ার ডোর স্থাপনের বিষয়টি পূর্বেই পরিকল্পনায় রাখা- এসবের মধ্য দিয়ে এ ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস করার সুযোগ রয়েছে। ওয়্যারহাউসকে মূল কারখানা থেকে আলাদা রেখে, ওর্য়াক ইন প্রসেসকে কন্ট্রোলের মাধ্যমে এবং আগুনের উৎসগুলোকে চিহ্নিত করে অধিকতর ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে, যেখানে জীবনহানির ঝুঁকি কমে যাবে- যা শ্রমিক ও শিল্প উভয়ের স্বার্থেই জরুরি।

কু-আচরণে জীবন সংকটময়, তবুও কি তা শোধরাবার নয়!

মুহাম্মদ সাইফুল হক
এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, মার্কেটিং এন্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে মুখের উপর ভালো না লাগার কথা শুনেছি বহুবার। আমি সেই মানুষগুলোকে আজো খুব স্মরণ করি। পিছনের দিনগুলোকে রোমন্থন করলে মুহূর্তেই অনুভব করি আমার সেই বিব্রতকর সময়টিকে। তবে সবাই যে একই কারণে ভালো না লাগার কথা বলেছে, তা কিন্তু নয়। কেউ বলেছে সংকীর্ণতার কথা, কেউবা অক্ষমতা, কার্পণ্য,

কেউবা ব্যক্তিত্বহীনতা কিংবা চেহারার রুক্ষতা এমনি আরও কত কী? আসলে জীবনে চলার পথে যে যেটা আবিষ্কার করেছে, সে তাই বলে দিয়েছে। তবে আমার একটা গুণও মনে হয় আছে, তা হলো আমি এসব শুনে মন খারাপ ও বিব্রতবোধ করলেও তাতে অহেতুক প্রতিবাদ করে ঝগড়া বাধিয়ে দেইনি। তাইতো সেই মানুষগুলোর অনেকের সাথেই আমার আজো দেখা হয়, কথা হয়, কুশলাদি বিনিময় হয়, খানাপিনাও হয় কিংবা তারও কিছু বেশি। আজ আমার এক অতীত সহকর্মী ফোন করেছে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য। আমি তার জন্য একটা সুপারিশ করেছিলাম এবং তা তার কাজে লেগেছে। চুপে চুপে বলে রাখি, সেও কিন্তু একবার আমার সাথে বেশ রূঢ় আচরণ করেছিল তার ভাষায় তাকে অবমূল্যায়নের অভিযোগে- যে স্মৃতি আমি আজো ভুলিনি। তাই আজ কলম নিয়ে বসলাম জীবনের নানা বাঁকে আমার নিজের ও জানা কিছু মানুষের আচরণগত নানা সীমাবদ্ধতা ও তার পরিণাম তুলে ধরার জন্য।

সত্যি বলতে কি, আমাদের আচরণগত সমস্যাটা জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে সংকটাপূর্ণ করে তুলছে। আমরা নিজের সমালোচনা শুনতে পছন্দ করি না, কিন্তু সুযোগ পেলেই অন্যের সমালোচনা করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমালোচনাটা ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেই করি। আর যারা সমালোচনা করতে সিদ্ধহস্ত নয় তারা অন্যের খারাপ সমালোচনা শুনতে পছন্দ করে। প্রত্যেক মানুষই চায় জীবনের উন্নতি ও সফলতা, কিন্তু সাফল্যের জন্য যে গুণাবলী প্রয়োজন তার চর্চা করে না। এ বছর এপ্রিলের প্রথমদিকে আমি একটা বিরল প্রশিক্ষণ

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রশিক্ষক ছিলেন ব্যাবিলনের সম্মানিত পরিচালক জনাব এস এম এমদাদুল ইসলাম। তাঁর জাপান ট্রেনিংয়ের বিষয়বস্তুর কিছু নির্যাস নিয়ে, নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাবিলনের ইউনিট ইনচার্জদের সঙ্গে নিয়ে প্রশিক্ষণটা দিয়েছিলেন। আমরা প্রশিক্ষণার্থী ছিলাম এগার জন, যার মধ্যে একজন বিদেশিনিও ছিলেন। সেখানে তিনি জো-হারী উইন্ডো নামে একটি বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন। এতে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলোকে চারটা ভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। ১ম ভাগে- এমন সব বৈশিষ্ট্য যা ব্যক্তি নিজে জানে, অন্যরাও জানে; ২য় ভাগে- নিজে জানে না, কিন্তু অন্যরা জানে; ৩য় ভাগে- নিজে জানে, কিন্তু অন্যরা জানেনা এবং ৪র্থ ভাগে- নিজেও জানে না, এবং অন্যরাও জানেনা। এটি আমার কাছে খুব চমৎকার লেগেছে। জো-হারীর উইন্ডোতে নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। বিষয়টা মোটেও সহজ নয়। আসলে নিজের বৈশিষ্ট্যগুলোও যেন নিজের চোখ বা মনে সহজেই ধরা পড়ে না। বলছিলাম আচরণের কথা, এটা একটা সাধনার বিষয় এবং নিরন্তর চর্চার বিষয়। ভালো মানুষের উদাহরণ নিয়ে সব সময় আলোচনার বিষয়, উৎসাহ নেয়ার বিষয়। আমি মনে করি, সু-আচরণ সর্বদা প্রমিত কথা বলার থেকেও কঠিন। ভাষা ও উচ্চারণ শিখলে যেমন প্রমিত ভাষায় কথা বলা যায়, তেমনি কিন্তু চাইলে আচরণও আকর্ষণীয় করা যায়- তবে এতে চর্চা লাগে বহুলাংশে বেশি। তাহলে মানুষ কেন আচরণটা ভালো করে না, সামাজিক আদবকায়দার ধার ধারে না। আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যখন আমি যথাযথ আচরণ করিনি। যার কিছু আছে ব্যক্তিগত আবার কিছু আছে পেশাগত জীবনে। আমার জীবনে লক্ষ্য স্থির ছিল না। আমার কাছে এটাও ভালো, ওটাও ভালো- কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। আর তাই হয়তোবা অনেক কিছুতে অংশ নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু কোনোটাতেই বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারিনি। আজকাল পেশাগত কারণে অনেকের শালিস বা অভিযোগ শুনতে হয়। অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনা ও তা সমাধানের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর-ই নির্ভর করে এর সফলতা বা বিফলতা। অনেক সময়ই লক্ষ্য করি, কিছু মানুষ অল্পতেই বিরক্ত হয়। সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে না। অনেক মানুষ আছে যারা নিজেকে একটু জাহির করতে পছন্দ করে। তাই এখতিয়ার বহির্ভূত কথা, আচরণ ও অঙ্গভঙ্গি করে থাকে। কেউবা আবার প্রচ্ছন্ন এক ধরনের অহংকারে ভোগে এবং অন্যদের থেকে শ্রেয়তর ভাবতে গিয়ে নিজেদের কূপমন্ডুক করে রাখে। আজকাল মানুষের আচরণগত সমস্যায় বেশ অস্বস্তি বোধ করি। অনুভব করি- কেউ একজন অন্যের সমস্যা নিয়ে বলছে, অথচ তার নিজের মধ্যেই রয়েছে বহুবিধ সমস্যা ও আচরণগত ত্রুটি। পেশাগত কারণে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন স্তরের ও ধরনের মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত নানা বিষয়ে কথা হয়। তখন বুঝি, আর্থিক সফলতা বা পদ পাওয়া মানেই কারো শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠা নয়। আসলে মানুষের গুণের সাথে অর্থপ্রাপ্তির সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। তবে সাধারণত গুণী লোকেরা তাদের উন্নতির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে। মানুষের আরো একটা প্রবণতা হলো দুর্বলের উপর নিজের কর্তৃত্ব জাহির করা, এবং তা করতে গিয়ে সে অনেক অসংলগ্ন ও হাস্যকর আচরণ করে থাকে। আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি তখন আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে খেলছিলাম।

রাতে কলোনিতে বিদ্যুৎ ছিল না। এলোপাতাড়ি দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে অন্ধকারে একটি ছেলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে বেশ ব্যথা পেয়েছিলাম। তাৎক্ষণিক আমার মনে হয়েছিল সেই ছেলেটার জন্যই আমি ব্যথা পেয়েছি। আমি ছেলেটাকে চিনতাম- ওর মা অনেকের বাসায় কাজ করে। তখন রাগ দমন করতে না পেরে বেশ কষে একটি চড় দিয়েছিলাম ছেলেটিকে। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে আমাকে অভিসম্পাত করছিল। আমি সেই কথা আজো ভুলিনি। তবে পরে একদিন ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম অহেতুক তাকে মারার জন্য। এ রকম ঘটনা যে জীবনে একটিই হয়েছিল তা নয়, তবে সেগুলো এখন নিজেকে কেবল অস্বস্তিতেই ফেলে। আবার জীবনে এর উল্টো ঘটনাও আছে। এইতো সেদিন অফিসে আসার পথে, মিরপুর-১ নম্বর চত্বরের মোড়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় রাস্তা পার হচ্ছিল এক পথিক। সে হঠাৎ তেড়ে আসলো কেন আমি গাড়িটা সম্পূর্ণ থামাইনি তাকে রাস্তা পার হতে দিতে। কাছে এসে আমাকে দেখে নিছক ড্রাইভার নয় বুঝে জানিয়ে দিল, সে বিশাল ক্ষমতাধর লোকের ড্রাইভার, আর চাইলেই সে আমাকে গাড়িসহ উধাও করতে পারে। আমি তার কথা এড়িয়ে চলে এলাম। কিন্তু ফুটওভারব্রীজ ব্যবহার না করা একজন পথচারীর অকারণ হুমকি এড়িয়ে এসে আমি যে অন্তর্দহে ভুগেছি, তাও কিন্তু কম নয়। এভাবে আমি ঘরে বাইরে সর্বত্র এ রকম আচরণগত সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবি আর নিরন্তর তা দেখে জাতি হিসেবে নিজেকে ছোটই লাগে। আমরা কীভাবে আচরণের সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, তা নিয়ে কুলকিনারা করতে পারি না।

আমি এক দম্পতিকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। তাঁরা দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত। দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে সংসার জীবন শুরু করেছে। ভালোই চলছিল সংসার। কিন্তু এক দশকেরও বেশি সংসার করার পর কেন জানি একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলল। প্রায়শই ঝগড়া-ঝাটির কথা শুনতাম। সংসারের লোকজন থেকে শুরু করে প্রতিবেশী পর্যন্ত অবাক হয় তাদের এহেন আচরণের জন্য। একদিন শুনলাম তারা আলাদা হয়ে গেছে। পরে শুনেছি, ব্যক্তি হিসেবে তারা দু'জনেই বেশ সফল হলেও তাদের দু'জনের ব্যক্তিত্বের ধরনে পার্থক্য ছিল। ছোটখাটো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য একে অপরের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠত। আর তা থেকেই ঝগড়া এবং সংসার ভাঙার উদ্যোগ। যদি তারা পরস্পরের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকত, অকারণে সন্দেহ ও বিরক্তিতে না ভুগত, তাহলে দাম্পত্য জীবন বিচ্ছিন্নের এই ঘটনা ঘটত না। এবার একটি পেশাগত আচরণের সমস্যার কথা বলব। পোশাকশিল্পে চাপাচাপি একটি সাধারণ ঘটনা। যেমন ক্রেতা একটি অর্ডার দিয়েই চাপাচাপি করতে থাকেন, যাতে সেটি কম খরচে ও কম সময়ে পাওয়া যায়। আবার যিনি অর্ডারটি গ্রহণ করেন তিনিও বিভিন্ন বিভাগ বা ব্যক্তিকে চাপাচাপি করতে থাকেন যাতে সেটি সম্ভব হয়। কিন্তু এই চাপাচাপি করতে গিয়ে অনেকেই পেশাগত গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত কিছু অপ্রত্যাশিত আচরণ, অভিব্যক্তি ও কথা বলেন, যা অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ককেই কেবল বিনষ্ট করে। যতবার-ই বলি বা ভাবি না কেন

আমি আমার পেশাগত দায়িত্বটা ব্যক্তিগত রাগ-ক্ষোভ বা অভিমানের বাইরে রেখে পালন করি, কিন্তু তা বাস্তবে দেখতে পাই না। এইতো সেদিন একটি শিক্ষিত-সুরুচিবোধসম্পন্ন ছেলের বিরুদ্ধে তার আচরণগত সমস্যার অভিযোগ পেলাম। আমি তা পরীক্ষা করে দেখলাম অভিযোগটি সত্য। সে বেশ কয়েকটি ঘটনায় হঠাৎ রেগে যাওয়ার প্রমাণ দিয়েছে, যাতে তার ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ভীষণ হ্রাস পেয়েছে। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, বয়োজ্যেষ্ঠ যাদের সাথে সে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, পরদিন সে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছে, মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেছে। আমি তাকে আচরণগত সমস্যার এক নির্মম শিকার বলতে পারি। জানি না ভবিষ্যতে কখনো তার পেশাগত বা ব্যক্তিগত জীবনে আমার মন্তব্য প্রয়োজন হলে আমার কী বলা উচিৎ হবে।

এমনি হাজারো ঘটনা আছে আচরণগত সমস্যার কারণে বিশাল ক্ষতিপূরণের। এইতো আজকেই একজন পুলিশ কর্মকর্তার চাকুরি হারানোর খবর এল পত্রিকায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সাথে অহেতুক দুর্ব্যবহারের জন্য; ক্ষমতার বাইরে ক্ষমতা দেখানোর জন্য। প্রতিনিয়তই আমরা মূল্য দিয়ে যাচ্ছি আমাদের আবেগতাড়িত ভুল আচরণের কারণে। আমরা যদি বুদ্ধিদীপ্ত, বিবেকপ্রসূত, ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে প্রতিটি আচরণ দেখাই, কথা বলি, কাজ করি তাহলে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি, সফল হতে পারি এবং জাতি হিসেবে মর্যাদাশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। আমি জাতির এক নগণ্য মানুষ হিসেবে আজ শপথ নিচ্ছি যে, কারো সাথে ন্যায়-নীতি বহির্ভূত কোন আচরণ করব না, সকল মানুষের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখব। কে কে আমাকে সমর্থন করবে? সবশেষে বলব আমার কল্পনাতীত এক অভিজ্ঞতার কথা। বাবা-মা, মামা-মামি, ভাই, তাদের স্ত্রী-সন্তান ও আমার স্ত্রী-সন্তানসহ বিশাল পরিবারের এক বহর নিয়ে গত বছর আগস্টের প্রথমে, ঈদের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্কে। সাউথ আফ্রিকার সাফারী পার্ক দেখার পরও নিজের দেশের পার্কটিকে বেশ ভালোই লাগছিল স্বপরিবারে ঘুরতে। এখানে লক্ষ্য করলাম, পার্কে ঢোকার পর আবার আলাদাভাবে টিকিটের ব্যবস্থা পশু-পাখি দেখা বা তাদের পিঠে চড়ার জন্য। যাহোক, আমাদের বহর বড় হওয়ায় আমরা প্রতিটি ইভেন্টে একটি স্পেশাল রেট পাচ্ছিলাম। সব ঘুরে এবার যখন মাছের একটি চমৎকার খামারে ঢুকতে যাব, তখনই সমস্ত আনন্দ যেন বিশাল এক অস্বস্তি ও অনুশোচনায় রূপ নিল। ঘটনাটা খুবই সামান্য, কিন্তু তার ফল যে আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে তা ভাবিনি। টিকিট কাউন্টারে বসা ছিল দু'জন তরুণী। টিকিট কাটতে এসে তাদের একজনকে বললাম স্পেশাল রেট পাওয়া যাবে কি না বড় দর্শনার্থী দলের জন্য, তাতে সে খুব রূঢ়ভাবে না বলল। কথাটাতে অভদ্রতা লক্ষ্য করায় উদাহরণ দিলাম অন্যদের। তখন সে সরাসরি আমাকে ও আমার বাবাকে মিথ্যাবাদী বলল। এতে খুবই বিব্রত ও মর্মাহত হওয়ায় তার ভাষা সংযত করার পরামর্শ দিলাম। এতে যেন সে তেড়ে আসলো এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল ক'জন যুবক। এমন একটা পরিবেশ তৈরি করল যেন আমাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে

দেয়। এতে স্বপরিবারে ভীষণ অপমানবোধ করলাম এবং অনুশোচনায় ভুগতে থাকলাম পরিবেশ না জেনে এভাবে আসার জন্য। যাহোক, বিষয়টা কীভাবে কর্তৃপক্ষের নজরে আনা যায় ভাবতে লাগলাম। প্রজাপতির জন্ম বিস্তারের একটি স্পটে যেখানে কিছুক্ষণ আগে ঘুরে এসেছি, সেখানকার কর্তৃস্থানীয় এক ব্যক্তিকে জানাতেই তিনি আমাদের পক্ষ নিলেন এবং মাছের খামারের মালিকের নাম্বার দিলেন, যিনি কিনা সৌভাগ্যক্রমে পার্কেই অবস্থান করছিলেন। বিষয়টা অবহিত করতেই তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন অপেক্ষা করার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটে এলেন তরুণ সেই ভদ্রলোক। ঘটনা শুনে তিনি ভীষণ দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। আমাদের সবাইকে জোর করে তার স্পটে যেতে অনেকটা বাধ্যই করলেন। পরে আমি জোরাজুরি করলেও কোনো প্রবেশ ফি গ্রহণ করেননি। তবে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, তিনি সেই মেয়েটিকে সামান্য তিরস্কারও করলেন না। যার কারণে এতকিছুর পরেও মনের ভিতর অস্বস্তিটা থেকেই গেল। মনে প্রশ্ন জাগল আমাদের সমাজ কি মানুষের এসব খারাপ আচরণের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে?

ATTENTION FOR GARMENTS OWNER

TUAN CORPORATION

(GLOBAL APPAREL SOLUTION)

(IMPORTER, EXPORTER, INDENTOR AND MANUFACTURER)

INDENTING ITEM ACCESSORIES OF READY MADE GARMENTS INDUSTRY AS BELOW:

1-PVC SHEET
2-TISSUE PAPER
3-100% POLYESTER SEWING THREAD
4-METAL BUTTON
5-ZIPPER & SLIDER
6-RIBBON
7-BOTH SIDE ADHESIVE TAPE
8-DUPLEX BOARD CHINA QUALITY
9-COLLAR BONE
10-OPP GUM TAPE JUMBO ROLL ETC.

ADDRESS: 149/A, AIRPORT ROAD, BAITUSH SHARAF COMPLEX, 5TH FLOOR, SUITE-504, FARMGATE, DHAKA, BANGLADESH. PHONE: 88-02-8129676/9140534, FAX: 88-02-9117928 CELL PHONE: 88-01711-567740/88, 01713-116154, **E-MAIL: rising@dhaka.net, tuan@siriusbb.com**

AND

江苏联发纺织股份有限公司

JIANGSU LIANFA TEXTILE CO. LTD, CHINA

(ALL TYPE OF BEST YARN DYED FABRICS MANUFACTURER IN CHINA)

DHAKA OFFICE: 149/A, AIRPORT ROAD, BAITUSH SHARAF COMPLEX, 5TH FLOOR, SUITE-504, FARMGATE, DHAKA, BANGLADESH. PHONE: 88-02-8129676/9140534, FAX: 88-02-9117928, CELL PHONE: 88-01711-567740/88-01713-116154, **E-MAIL: redwan@lianfabd.com**

তোতলা সাকিবের গল্প

এ কে এম গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল
ব্যাবিলন গ্রুপ

অষ্টম শ্রেণির ছুটি হয়েছে আরো পনের মিনিট আগে। ছুটি মানেই সব ছাত্রের কাছে গরম গরম রুটি আর হালুয়া। সবাই রুটি আর হালুয়া নিয়ে চম্পট। স্কুলের মাঠে একটা মাছিও পাওয়া যায় না। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হলো। মাঠের ঠিক মাঝখানটায় যেখানে ক্রিকেট খেলার পিচ, সেই পিচের ওপর সাকিব বসে আছে। তার দু'পা সামনের দিকে ছড়ানো। পাশেই স্কুলব্যাগটা পড়ে আছে। ব্যাগটাকে দেখতে ঠিক একটা উল্টো লেডিবার্ড বিট্‌ল এর মতো লাগছে। শীতের বিকেল খুবই ছোট। টুপ করে সূর্য ডুবে যাবে। হু হু করে ঠান্ডা বাতাস বইছে। একটু একটু করে শীতও লাগছে। সাকিবের উচিত বাসায় ফিরে যাওয়া। কিন্তু তার মন খুব খারাপ। বাসায় যেতে মোটেও ইচ্ছা করছে না। মন খারাপ ক্লাসের ঘটনার জন্য।

আজ চতুর্থ পিরিয়ডে জলিল স্যার ক্লাসে আসলেন। গোপনে ছাত্ররা সবাই তাকে ডাকে জল্লাদ স্যার। জল্লাদ যেমন নিষ্ঠুর, তিনিও তেমন নিষ্ঠুর। তিনি ইংরেজি ২য় পত্র ক্লাস নেন। যথারীতি ক্লাসে ঢুকেই স্যার হুঙ্কার দিলেন, চুপ, সবাই চুপ। সবাই এমনিই চুপ, তবু স্যার হুংকার ছাড়বেন। এটা স্যারের স্বভাব। এই কে কথা বলে? ক্লাসে পিন ড্রপ সাইলেন্স চাই, পিন ড্রপ সাইলেন্স। পিন ড্রপ সাইলেন্স বোঝ? পিন ড্রপ সাইলেন্স মানে সবাই বোঝে। কারণ স্যার প্রতিদিনই একবার করে এর অর্থ বলেন। পিন ড্রপ সাইলেন্স মানে হলো পিনপতন নিরবতা। একটি পিন পড়লেই টুং টাং শব্দ শুনা যাবে এমন নিরবতা। সেই পিনপতন নিরবতার মাঝে স্যার সাকিবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, দাঁড়াও। সাকিব দাঁড়াল। সাথে সাথে ক্লাসে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল।

পড়া শিখেছ?

জ্ - জ্- জি স্যার।

বলে যাও। একদমে বলবে। দাড়ি কমা ঠিক রেখে বলবে।

ক্লাসের সবচে' ভালো ছাত্র শরীফ অতি উৎসাহী হয়ে বলল, স্যার, ইংরেজিতে তো দাড়ি নেই স্যার। ফুল স্টপ আছে।

স্যার বললেন, তুমি বেঞ্চের নিচে মাথা দিয়ে রাখ। যারা কথার কথা বোঝে না, তাদের

শাস্তি হওয়া উচিত।
সাকিব ভয়ে ভয়ে বলল, স্-স্-স্যার। লি-লিখে দেই।
স্যার খেঁকিয়ে উঠলেন। ফাঁকিবাজি কথা বলবা না। ডু হোয়াট আই সেড।
সাকিবের সবচে' বড় পরীক্ষা শুরু হলো। সে বলতে শুরু করল, ট্-ট্-ট্রী প্যা-প্যা-প্যা... লেন্টেশন.....
কী প্যা প্যা প্যা শুরু করেছ। তুমি কি তোতলা নাকি? স্যার হুংকার দিয়ে উঠলেন।
ক্লাসে চাপা হাসির রোল পড়ে গেল। ক্লাস ক্যাপ্টেন লায়লা নিজেকে সামলাতে না পেরে দাঁড়িয়ে বলল, জি স্যার। লক্ষ্মী তোতলা ও।
রাগ সপ্তমে চড়ার কথা শুনা যায়। কিন্তু জলিল স্যারের চেহারা দেখে মনে হলো তার রাগ সাড়ে সপ্তমে চড়ে গেছে। তিনি বললেন, লক্ষ্মী তোতলা মানে?
যাদের চোখ মৃদু ট্যারা, তাদের আমরা বলি লক্ষ্মী ট্যারা আর যারা মৃদু তোতলা তাদের আমরা বলি লক্ষ্মী তোতলা। ঠিক আছে না স্যার?
ঠিক আছে। কী ঠিক আছে জানো? তুমি একটা আস্ত গাধি। এই কথাটা ঠিক আছে। যত্তোসব।
লায়লা ভয় পেয়ে গেল। স্যার সাকিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোতলা বলে বেঁচে গেলে। না হলে তোমাকে আজ আচ্ছা প্যাদানি দিতাম।
সাকিবের কান্না পেয়ে গেল। সত্যি সত্যি পড়াটা ও খুব ভালো করে শিখেছিল। লিখেছেও না দেখে দু'বার। প্রথমবার লেখার পর দু'তিনটা ভুল পেয়েছে। পরে সেগুলো শিখে আবার লিখেছে। একটা শব্দও তার ভুল হবার কথা না। অথচ তাকে স্যারের বকা শুনতে হলো। ওর মুখে কথা আটকে যায় বলে সবাই ওকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে। যেসব স্যার ঠান্ডা মেজাজের তারা তাকে পড়াই ধরে না। বাংলা ক্লাসে নুরজাহান ম্যাডাম অন্য সবাইকে রিডিং পড়তে বলেন। সবাই গল্প কিংবা কবিতাগুলো পালা করে রিডিং পড়ে উচ্চস্বরে। একদিন ওর পালা আসলো। ও দাঁড়াতে যাবে এমন সময় ম্যাডাম ওকে বসিয়ে দিলেন। ওর পরের জনকে পড়তে বললেন। ক্লাসের সবার কাছে ওর একটা ডাক নাম আছে TS। এর মানে তোতলা সাকিব। সবাই এত নিষ্ঠুর কেন? কারো কোনো সমস্যা থাকলেই তা নিয়ে মজা করতে হবে?
চারিদিকে ঘন অন্ধকার নেমে আসছে। সাকিব এখনও স্কুলের মাঠে বসে আছে। শীতে কাঁপছে ও। এখন বাসায় যাওয়া উচিত। দূর থেকে রহমান স্যারকে দেখা গেল। তিনি এ স্কুলে নতুন এসেছেন। তিনি সাকিবদের কোনো ক্লাস নেন না। রহমান স্যার এদিকেই আসছেন ধীর পায়ে।

এই ছেলে এইদিকে আস। তুমি বাসায় যাওনি?
সাকিব চমকে উঠল। পেছনে তাকিয়ে দেখে রহমান স্যার।
কি ব্যাপার বাসায় যাওনি?
না স্যার।

কেন?
সাকিব চুপ করে রইল।
কী ব্যাপার কথা বল না যে? পরীক্ষায় ফল খারাপ করেছ?
না।
তাহলে? মন খারাপ?
সাকিব হ্যা সূচক মাথা নাড়াল।
মন খারাপ কেন? কোনো স্যার মেরেছে?
না।
তাহলে? মন খারাপ হবার একটা কারণ তো থাকবে তাই না?
সাকিব কোন কথাই বলতে পারল না। হয়তো কথা বলতে যাবে আর নতুন স্যারও তার তোতলামি সম্পর্কে জেনে যাবে। তারপর স্যারদের কাছে মজা করবে তাকে নিয়ে। সাকিব হঠাৎ করে দৌড় দিল। চরম বেগে দৌড়াতে শুরু করল সে। দৌড়ের গতিতে লক্ষ্যই করল না যে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে অনবরত। এর পরের দু'দিন সাকিব স্কুলে আসলো না। তৃতীয় দিন সাকিব ক্লাসে গেল দশ মিনিট দেরি করে। গিয়ে বসল সবচে' পেছনের বেঞ্চের কোণায়। সে এমন একটা জায়গা চায় যেখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। সবার আড়ালে থাকতে পারবে।
টিফিন আওয়ারে ক্লাস ক্যাপ্টেন লায়লা ওর কাছে এগিয়ে এল।
তোমাকে রহমান স্যার ডেকে পাঠিয়েছেন।

সাকিব বিনা বাক্যব্যয়ে শিক্ষকদের কক্ষে চলে গেল। রহমান স্যার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পত্রিকা পড়ছেন। সাকিব সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রহমান স্যারের সাথে সাকিবের যেসব কথা হলো তোতলানো অস্পষ্ট শব্দগুলো বাদ দিলে তা অনেকটা এমন–
স্-স্-সরি স্যার।
সরি কেন?
সেদিন যে ভোঁ-দৌড় দিয়েছিলাম।
রহমান স্যার হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, সরি বলার দরকার নেই। তোমার সাথে যা ঘটেছে তা আমি জানি। সেদিন জলিল স্যার ক্লাস শেষে অফিসে এসে বললেন, একটা ছেলের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটার কথা বলতে সমস্যা হয়। সবাই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আমিও রাগে খারাপ আচরণ করে ফেলেছি। কী করা যায়, বলেনতো রহমান সাহেব। এত ভালো একটা ছেলে।
কথাটা সাকিবের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো।
তোমাকে সবাই গোপনে TS ডাকে না?
সাকিব মাথা নাড়ল। এর অর্থ সে জানে TS মানে কি।
রহমান স্যার বললেন, তুমিও কাউন্টার এ্যাটাক শুরু করে দাও। কথায় আছে, ইটের বদলে পাটকেল। তুমি পাটকেল না মেরে ইটের বদলে ককটেল মারবে।

স্যারের কথায় সাকিব হেসে ফেলল।
কিন্তু কীভাবে স্যার?
তোমাকে তিনটা হোমওয়ার্ক দেব। করে নিয়ে আসবে।
কী হোমওয়ার্ক, স্যার?

১) ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে খুঁজে বের করবে তুমি ছাড়াও পৃথিবীতে কার কার তোমার মতো সমস্যা ছিল।
২) ক্লাসের সবার কাছে তোমাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করার প্রতিবাদে একটা চিঠি লিখবে। তারপর ফটোকপি করে সবার কাছে তা পৌঁছে দেবে।
৩) আজ থেকে তোমাকে তিনটা ওয়ার্কআউট দেব। আগামী এক মাসে ওয়ার্কআউটগুলো করবে। পারবে না?

পারব স্যার। সাকিবের চোখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল।
এখন যাও। মনে রাখবে তুমি যত চুপচাপ থাকবে স্ট্যামারিং তোমাকে আরো জেঁকে ধরবে।
সাকিব বন্ধুদের যে নাতিদীর্ঘ চিঠিটা লিখেছে তা এমন–

প্রিয় বন্ধুরা,
তোমরা নিশ্চয়ই টাইগার উডস, নিকোল কিডম্যান কিংবা মেরিলিন মনরোকে চেনো। এরা সবাই ছিলেন তোতলা। পৃথিবীতে তাদের নামের পাশে তাদের এ বাকক্রটির কথা লেখা থাকে না। লেখা থাকে তাদের কীর্তির কথা। আমি আমার প্রতিবন্ধকতার কাছে হার মানতে চাই না। প্রতিন্ধকতাকে পরিশ্রম দিয়ে জয় করতে হয়। প্রতিটা মানুষের মাঝেই কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে। কারো প্রতিবন্ধকতা দেহে। কারো প্রতিবন্ধকতা কথায়। আর কারো প্রতিবন্ধকতা আচরণে। একবার ভাবো তো তোমাদের মাঝে কারা কারা আচরণ প্রতিবন্ধী?
ইতি,
সাকিব।

চিঠি দেয়ার পর সবার মাঝে সাকিব চর্চা আরো বেড়ে গেল। একেই বলে হিতে বিপরীত। কিন্তু ততক্ষণে সাকিব যুঝতে শিখে গেছে। স্যারের ওয়ার্কআউটগুলো সে মন লাগিয়ে করছে।

স্যারের প্রথম ওয়ার্কআউট হলো প্রচুর রিডিং পড়া। বিশেষ বিশেষ কিছু অক্ষরে উচ্চারণের সমস্যা থাকার কারণে স্ট্যামারিং হয়। এ সমস্যা দুর করতে হবে। ব, ড, গ, প, ক, র এবং ট এই ক'টা অক্ষর ভালো করে আয়ত্ত করতে হবে। আর প্রতিদিন প্র্যাকটিসের পর নিজের কথা রেকর্ডিং করতে হবে। কতটুকু উন্নতি হলো তা বোঝার জন্য। দ্বিতীয় ওয়ার্কআউট

হলো জিহ্বার একটা ব্যায়াম। খুব অদ্ভুত। তবু বেশ উপকারী। তা হলো, চোয়াল প্রসারিত রেখে জিহ্বা মুখ থেকে বের করে একবার তা থুতনির সাথে লাগাতে হবে, আবার তা ভেতরে নিয়ে মুখের তালুর সাথে লাগাতে হবে। তৃতীয় ওয়ার্কআউট হলো, কারো কারো স্বরবর্ণ উচ্চারণেও সমস্যা থাকে, তাই স্বরবর্ণগুলো মানে এ, ই, আই, ও, ইউ এগুলো বারবার উচ্চস্বরে বলা।

বসন্তের এক সুন্দর সকালে জলিল স্যার অষ্টম শ্রেণির ক্লাসে আসলেন। সাকিব স্বলজ্জ ভঙ্গিতে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

কিরে কিছু বলবি? স্যারের কণ্ঠে মায়া ঝরে পড়ল। এমনিতে স্যার সবাইকে তুমি করে বলেন। অতি স্নেহ নিয়ে বলেছেন বলেই হয়তো তুই দিয়ে সম্বোধন করলেন।
জি স্যার ।
বল্ ।
ট্রি প্ল্যান্টেশন প্যারাগ্রাফটা বলতে চাই, স্যার।
সবাই অবাক হয়ে গেল। আজ মোটেও ট্রি প্ল্যান্টেশন পড়া না।
স্যার ওর কাছে এসে সবাইকে বললেন, সবাই চুপ। এই ছেলে এখন পড়া দেবে।
সাকিব দু'মাস আগের শেখা প্যারাগ্রাফটা স্পষ্ট উচ্চারণে বিরাম চিহ্ন ঠিক রেখে বলতে শুরু করল। প্যারাগ্রাফ বলা শেষ হলে জলিল স্যার আর ক্লাসের সবার বিস্মিত মুখ দেখে সাকিবের চোখে আনন্দে পানি চলে আসলো।
পরিশেষ: তার পরের দিন ক্লাসের অনেকেই সাকিবের দেয়া চিঠির জবাব দিল। বেশির ভাগ চিঠিতেই প্রায় একই কথা লেখা।

প্রিয় সাকিব,
কথার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারায় তোমাকে অভিনন্দন। এবার আমরাও চেষ্টা করব আমাদের আচরণ প্রতিবন্ধকতা দূর করতে। আর আগের সবকিছুর জন্য সরি।

ইতি,
তোমারই বন্ধুরা।

এ্যালোভেরা

এম এম তোফাজ্জল হোসেন
সিনিয়র ম্যানেজার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

একটা সময় ছিল যখন গার্মেন্টস মানেই ছিল বেশির ভাগ অশিক্ষিতদের জগৎ। পেটের দায়ে কাজ করতে আসা অসহায় লোকগুলো যেন কেনা দাস। সেখানে প্রায়ই মেয়েদের যৌন-হয়রানীর শিকার হতে হতো। মালিকপক্ষ মানেই ছিল শোষকগোষ্ঠী। যেখানে না ছিল ইজ্জত, না ছিল সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু দিন বদলে গেছে, শ্রমিক অনেক সচেতন হয়েছে, তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়েছে। আজ এই জগৎ আর সেই জগৎ নেই। সামান্য কর্মী হিসেবে কাজ করতে গেলেও সেখানে সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্র, বয়স নির্ধারণ সার্টিফিকেট, আই টেস্ট, ওয়েট, হাইট, রঙ্গিন ছবিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে হয়, আবার মেডিকেল চেকআপে অবশ্যই উত্তীর্ণ হওয়া চাই। আর একটু উঁচু পদে (স্টাফ পোস্ট) নিয়োগের জন্য শাখা ভেদে এইচএসসি থেকে ডিগ্রি, বিবিএ, এমবিএ, মাস্টার্স, ইঞ্জিনিয়ারিংও অগ্রগণ্য। তারপরও শিক্ষাগত যোগ্যতাই সবকিছু নয়, দিতে হয় ভর্তি পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষাও। কিছু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা আছে কি না তাও জানতে চাওয়া হয়।

এদিকে শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মপরিবেশ, মেডিকেল সেন্টার- সেখানে সেবাদানের জন্য নিয়োজিত রয়েছে ডাক্তার-নার্স। মহিলা শ্রমিকদের (০-৬ বছর বয়সের) সন্তানদের জন্য রয়েছে আধুনিক সুসজ্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণ শিশু যত্ন কেন্দ্র। মালিক ও শ্রমিকের সমন্বয় সাধনের জন্য আছে নির্বাচিত অংশগ্রহণ কমিটি (PC)। যেকোনো দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য আছে জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আবার অগ্নি-নিরাপত্তার জন্য রয়েছে অগ্নি-নির্বাপন টিম, উদ্ধারকারী টিম। বিভিন্ন সময় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য চলে ট্রেনিং, সেখানে আমন্ত্রিত প্রশিক্ষক (ফায়ার ব্রিগেড, বিজিএমইএ হতে আগত) প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। আরো রয়েছে যৌন-হয়রানী, শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, অভিযোগ নিষ্পত্তি, আইনগত অধিকার, সুদ, ঘুষ বা উপঢৌকন হতে বিরত থাকা, এইচআইভি (এইডস) থেকে রক্ষা-বিষয়ক সচেতনতা প্রশিক্ষণ, কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য পিপিই (Personal protective equipment) নামক বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের আয়োজন। মানবসম্পদ উন্নয়নে চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য রয়েছে এইচআরডি (Human resource development)।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধনী- ২০১০, ২০১৩) এর আলোকে শ্রমিকদের অধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করছে মালিক, শ্রমিক, উৎপাদন বিভাগ, কমপ্লায়েন্সসহ এই শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা যেমন- Accord ও Alliance এর মতো বিদেশি কোম্পানিগুলো।

এখনও হয়তো তুবা গ্রুপ ও তাজরীন গার্মেন্টসের মতো কিছু কোম্পানি রয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন এদের পাশাপাশি ব্যাবিলন গ্রুপের মতো সমমানের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। এসব গ্রুপে রয়েছে ঈর্ষনীয় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড (corporate social responsibility- CSR) যেমন- নিজস্ব কর্মীদের আধুনিক কর্ম-উপযোগী পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি তাদের সন্তানদের সুশিক্ষিত করার জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প, শারীরিক ও পারিবারিক যে কোনো বিপদে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বাত্মক সহায়তা করা, বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা। এছাড়া জনস্বার্থে সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণেও এ সেক্টরের ভূমিকা কম নয়। রক্তদান কর্মসূচি, হেলথ্ ক্যাম্প, দুর্যোগ পরবর্তী পুণর্বাসন, গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া এই কর্মসূচিগুলোর আওতাভূক্ত। এছাড়াও রয়েছে শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অত্যন্ত কাছ থেকে তাদের জীবনধারা দেখা এবং সাধ ও সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করার প্রয়াস। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এত কিছুর পরও অনেকেই এই সেক্টরকে মূল্যায়ন করতে পারছেনা, আবার অসহায় মানুষগুলোর দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতেও পারছে না তাঁরা। অথচ গত ২০১৩-২০১৪ইং অর্থবছরে দেখা গেছে- বাংলাদেশ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে ৩০.১৭ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, এর মধ্যে ২৪ মিলিয়ন ডলার অর্থ্যাৎ শতকরা ৮১.২০% আয় করেছে পোশাকশিল্পখাত থেকে। শুধু কি তাই??? বাড়িওয়ালা থেকে শুরু করে ঝালমুড়িওয়ালা পর্যন্ত সবার ভাগ্য যেন অপ্রত্যাশিতভাবে এই শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে অক্টোপাসের মতো। আজ যেন সবাই সবার সাথে চক্রাকারে মিশে গেছে। এরপরও এরাই বেশি অবহেলিত, উপেক্ষিত। অনেকে এখনও উপহাস করে বলে- এ যোগ্যতা নিয়ে গার্মেন্টসেও কাজ করতে পারবি না। আবার গামেন্টসে চাকুরি করে, এই কথা শুনলে অনেক ছেলে বা মেয়ের বাবা-মাকে তাদের ছেলেমেয়ে বিয়ে দিতে হিমশিম খেতে হয়। সম্মানজনক সততার সাথে একমাত্র এই সেক্টরেই রয়েছে প্রতিমাসে ২-৫ লক্ষ টাকা বেতনধারী কর্মকর্তা। অসম্ভব সুপ্ত প্রতিভাধারী শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করে এই সেক্টরে, যারা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান তথা দেশের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। তারাই ভাবছে এই শিল্পের মাধ্যমে দেশ ও দশের উন্নয়নের কথা, তাদের ভিতর থেকেই আসছে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন চিন্তাধারা। তাই আর নয় অবহেলা, সময় এসেছে গার্মেন্টস শিল্পকে সঠিকভাবে মূল্যায়নের। বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো শিল্পটিকে সঠিক মর্যাদা দেয়া এবং এর সাথে জড়িত সকলকে সম্মান দেয়ার এখনই সময়। তাই আমার মনে হয়, এই সেক্টরকে সম্মান করতে না পারি ক্ষতি নাই, তবে অসম্মান করা উচিৎ না।

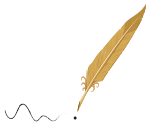

জন্মদাত্রী ‘মা’

মোঃ ফরহাদ হোসেন
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল
ব্যাবিলন গ্রুপ

বিধাতার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এক নারী “মা,”
তুমি করেছ আমায় জন্মদান
বুঝি না কীভাবে সাজাব তোমার প্রশংসা,
স্মরণ করে বহুবিধ অবদান।

আমার অসুস্থে রাত জেগে সেবা করেছ, খাবার দিয়েছ মুখে তুলে
করেছ শাসন-আদর, দিয়েছ শিক্ষা-শান্তি তোমার হৃদয়খানি খুলে।

তোমারি কাছে গচ্ছিত আছে মা- সন্তানের অনেক সুখ
হজ্জের সাওয়াব মিলে সুদৃষ্টিতে দেখলে একবার তোমার মুখ।

মা তুমি এমনই এক উজ্জ্বল সৃষ্টি এ বিশ্ব-ভুবনে
যখনই দেখি তোমার ঐ মুখ- দুঃখ থাকে না মনে।

তোমারি লালনে, তোমারি গুণে জীবন হয়েছে আমার ধন্য
আমি জীবন দিতে পারি মাগো, শুধু তোমারি জন্য।

হতে পারি আমি কবি-সাহিত্যিক, জজ-ব্যারিস্টার কিংবা প্রেসিডেন্ট দেশবরেণ্য
তবুও মা আমার কাছে তুমি অতুলনীয়-অনন্য, তোমার তুলনায় আমি নগন্য।

দোয়া কর মাগো হতে চাই তোমার খাঁটি সন্তান
দিতে চাই তোমায় সেবা আর প্রকৃত সম্মান।

ভালোবেসে চেয়েছি তোমায়

মোঃ সোহেল রানা
জুনিয়র সুপারভাইজার, ফিনিশিং
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

আমি শুধু চেয়েছি তোমায়
ঝরে যাওয়া হাসনাহেনার মতো নয়,
ফুটন্ত গোলাপের মতো।

আমি শুধু ভালোবেসেছি তোমায়
রাতের আঁধারে অমাবশ্যার মতো নয়,
জোছনার আলোর মতো।

আমি শুধু ভালোবেসে চেয়েছি তোমায়
সাগরের বুকে জেগে উঠা আইলা,
সিডরের মতো নয়,
নদীর বুকে বয়ে যাওয়া ঢেউয়ের মতো।

আমি শুধু ভালোবেসে চেয়েছি তোমায়
চৈত্রের খরা নয়, বৈশাখের ঝড় নয়,
বর্ষায় ঝরে পড়া টিপ টিপ বৃষ্টির মতো।

আমি শুধু ভালোবেসে চেয়েছি তোমায়
রাজপথে মানুষের রক্তে রাঙানো
চিত্রের মতো নয়,
শিল্পীর তুলিতে আঁকা
মনের মাধুরী মেশানো ছবির মতো।

আমি শুধু ভালোবেসে চেয়েছি তোমায়
মানুষের বুকে নীরব আঘাতে
হৃদয়ের স্পন্দনের মতো নয়,
ভালোবাসার ছোঁয়ায় ফুলের বুকে
প্রজাপতির নীরব স্পর্শের মতো
ভালোবেসে চেয়েছি তোমায়।

বিনাশে-অবিনাশে

এস এম আরিফ রাজ্জাক
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

জোনাকির জ্যোতিতে কি খোঁজ?
বিদীর্ণ তমা?
ঝঞ্ঝায় বোধের লুপ্তি
আর আমার প্রতিবিম্ব
স্তম্ভিত আয়নায়।
শুধু দেখি আমি
আমায় আমাতে
ইলিশের চোখের মতো
হিম ও নির্লিপ্ত
বোধ লুপ্ত আমি আমাতে।
জর ও অজরের দ্বন্দ্বে
জ্যোতি আর
তমার রিরংসায়
ছেড়া আকাশ
আমার জানালায়
অজস্র আহত নক্ষত্রের
আর্তনাদ, শাপ-শাপান্তে
হিমায়িত বাতাস।
ঘুম হতে জেগে উঠি
হাড়হিম আতঙ্কে
শ্বাসকষ্টে।
এই আমি
সেই আমি বেশ আছি
ভেজা ঈগলের মতো
বিস্মৃত দুর্গ অলিন্দে
বিনাশে ও অবিনাশে।

কে তুমি ছুঁয়ে যাও
বোধের হৃদপিণ্ড
বার বার প্রতিবার
আড়ালে- ধোঁয়াশার ওপারে
কুয়াশার প্রবরণে
মায়া না কায়া?
ছুঁয়ো না আমায় ভুলেও
সিক্ত হবে কষ্টের
ঘোর বরষায়
ভেসে যাবে
রক্ত প্লাবনে
শাপিত হবে প্রমিত
আকাশের দীর্ঘশ্বাসে
আহত নক্ষত্রের অভিশাপে।

এইত আমি বেশ আছি আমাতে
কষ্টের কোলাজে
হিরণ্য মায়ায়
পাথুরে চোখে না দেখে
আমাতে আমি।
এই আমি বেশ আছি
আমি আর আমার কায়া
নিরন্তর অন্তরঙ্গ সংলাপে
সূর্যাহত চেতনার
নির্মাণে ও বিনির্মাণে
আমাতে আমি
ও আমার ছায়া
বিনাশে অবিনাশে।

মায়াবিনী

রোজিনা আক্তার
প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার
ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

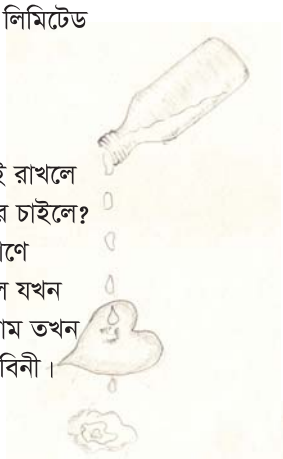

মায়াবিনী
ও চোখে যদি বিষই রাখলে
তবে কেন মায়াভরে চাইলে?
আমার চোখের কোণে
মায়াভরে চেয়েছিলে যখন
নিমিষেই ভেবেছিলাম তখন
তুমিই আমার মায়াবিনী।

কখনও মুক্ত বিহঙ্গ
কখনও রঙিন প্রজাপতি
কখনও বা রংধনুর সাজে
ভালোবাসার ডানা মেলে দিয়েছিলাম-
তোমার সীমাহীন সীমানায়।

শেষে দেখলাম
ওসব তো দূরের কথা
মেঘ হয়েও ঠাঁই করে নিতে পারিনি।

ভালোবাসাটুকু আমার
তোমার অসীম আকাশে
বৃষ্টি হয়েই ঝরে গেল অঝোরে
আমার হৃদয় জমিনে।

ইচ্ছা

এস এম মাহমুদ
এ্যাসোর্ট ম্যান, ফিনিশিং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

ইচ্ছা করলে হয় না কিছুই
আবার ইচ্ছা করলেই হয়,
অলস লোকের ইচ্ছা শুধু
কল্পনাতেই রয়।

দিনে-রাতে অলসেরা
কত ইচ্ছা করে-
একটাও তার হয় না পূরণ
আফসোস করে মরে।

ইচ্ছাপূরণ হওয়ার সিঁড়ি
নিয়মিত সাধনা,
এই সিঁড়ির যাত্রী হলে
ছোট সে রবে না।

কর্মগুণে মস্তবড়
জ্ঞানী লোকে কয়,
অলস বলে ভাগ্য থাকলে
সকল কিছুই হয়।

আমার প্রিয় ব্যাবিলন

শ্রী দিপু রায়
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি এ্যাস্যুরেন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

বাবার নিকট অফিস প্রিয়,
মায়ের নিকট বাড়ি।
মামার নিকট ভীষণ প্রিয়
নিউ মডেলের গাড়ি।

আপার প্রিয় কসমেটিক আর-
ভাইয়ার প্রিয় ডায়েরি।
বুড়ো দাদার ভীষণ প্রিয়-
এক বাঁকা লাঠি খয়েরী।

নানীর প্রিয় পান-সুপারি,
ফুপুর প্রিয় ঘটি।
আর আমি প্রিয় ব্যাবিলনে
সুখে করি চাকরিটি।

ডিজিটাল ভালোবাসা

শেখ জয়নাল আবেদীন (জনি)
জুনিয়র সুপারভাইজার, সুইং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

আগের মতো এখন আর নাই ভালোবাসার সিস্টেম
ডিজিটাল যুগে আসছে নতুন নতুন আইটেম।

মজনু নাই, ফরহাদ নাই, নাই চন্ডীদাস
ভালোবাসার জন্য কেউ হয় না দেবদাস।

লাইলী নাই, শিরি নাই, নাই রজকিনী
ভালোবাসার ভিখারিণী পার্বতীকেই চিনি।

কৃষ্ণ নাই, ইউসুফ নাই, নাই শাজাহান
ভালোবাসার জন্য কেউ দেয় না নিজ প্রাণ।

রাধা নাই, জুলেখা নাই, নাই মমতাজ
ভালোবাসার জন্য কেউ আর ছাড়ে না সমাজ।

আর ব্যাবিলনকে ভালোবেসে সবাই হলো ধনী
সবার চেয়ে অধিক ধনী আমি সালসা জনি।

JUKI

JUKI Smart Solutions
Innovate Your Business with JUKI

We bring you Mind & Technology

JUKI is thinking about tomorrow when everyone smiles.
Lineup of environment-friendly sewing machines

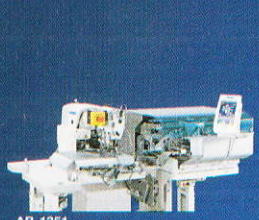
AB-1351

DDL-9000B Series

DLN-9010A

AMS Series

JUKI ECO PRODUCTS

Every machine that clears our 38 environmental checkpoints is certified as a JUKI ECO PRODUCT.

LH-3500A Series

AC-172N-1790

MF-3620 Series

APW-895 , APW-896

MF-7200D Series

JUKI's major environmental efforts in the design and manufacture of industrial sewing machines

Environmental vision

The Juki group has established ENVIRONMENTAL PRINCIPLES and ENVIRONMENTAL ACTION GUIDELINES to be observed in daily working activities.
To address environmental issues as positively as we can, we have also established an ECO MIND declaration. JUKI promotes various environment-conserving activities through reductions in environmental loads, resource saving, energy saving, and recycling. We refine and carry out these activities with a highly committed ECO MIND.

ECO MIND

Development of environmentally considerate products

[JUKI ECO PRODUCT certification system] JUKI applies a set of 38 strict environmental checkpoints through the various stages of the product life cycle to certify the environment-friendliness of its products. Every product that clears these checkpoints is certified as a JUKI ECO PRODUCT.
Four checkpoints play an especially important role in the environmental performance of our products: green procurement, power consumption during operation, power consumption during standby, and the consumption amount of oil and grease. Every JUKI product must clear the target values for these checkpoints.

Efforts in green procurement and handling of chemical substances

[Juki group green procurement guideline]
To ensure environment-friendly products for customers, JUKI procures and manages its components in compliance with a voluntary set of standards far stricter than the EU REACH Regulations and RoHS Directives

Environment management

[Obtained ISO14001 certification]
Industrial sewing machines are assembled at manufacturing facilities certified by ISO 14001, the standard for environment control, and delivered to customers.

For more information about JUKI's environmental efforts, please visit our website at http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html.

JUKI BANGLADESH LTD.

Dhaka Office:
Sharif Plaza (4th Floor)
39, Kemal Ataturk Avenue
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
Tel. : 9884505, 9884524, 9887083
Fax : 880-2-9884368
E-mail : jbl@jukidhk.com

Chittagong Office:
Delwar Bhaban (4th Floor)
104 Agrabad C/A
Chittagong, Bangladesh
Tel. : 031-711948, 718791-2
Fax : 031-721170
E-mail : jblc@jukictg.com

Narayangonj Office:
Zarina Manson (1st Floor)
154, B. B. Road, Narayangonj-1400
Bangladesh
Tel. : 880-2-7644829,7644859
Fax : 880-2-9884368
E-mail : jblngonj@dhaka.net

ব্যাবিলন কথকতার গৌরবময় দশ বছর-

সাইটেক ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট

এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছ ও অভিনন্দন ...

GFFE

KING BRAND

BSTI BDS-825/1991

FIRE EXTINGUISHER.

নির্দেশনাবলী ঃ

- সঠিকভাবে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র- ব্যবহার শিখুন।
- নিয়মিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সমূহ পরিস্কার পরিছন্ন রাখুন।
- প্রতিমাসে কমপক্ষে ১ বার ড্রাই পাউডার যন্ত্র ঝাকিয়ে রাখুন এবং মিটারের কাটা সবুজ অংশে আছে কিনা দেখুন।
- ব্যবহৃত/ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে দ্রুত রিফিলিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

সাইটেক ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট

২৯২, ইনার সার্কুলার রোড, (শতাব্দী সেন্টার),
লেবেল-২, এফ-২৩, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
ফোন ঃ ৭১৯২৯১২, মোবাঃ ০১১৯৯-৮৩৬১৮৬
E-mail : Citechfirewali@gmail.com

We are

"GLORY GROUP"

take challenge
on Industrial Sweing Machine
After Sale Service
& Spare Parts Back up.

GLORY GROUP:
GLORY TRADE CENTRE LTD.
SOUTH EAST EXIM LTD.
GLORY EMBROIDERY.
SPEED EMBROIDERY
SOUTH CORPORATION.
GLORY SERVICING CENTRE.

CORPORATE OFFICE:
MEHERBA PLAZA,
33, TOPKHANA ROAD, 4TH FLOOR
DHAKA-1000, BANGLADESH.
Email: <glory@dhaka.net>, info@glorytradebd.com
Tel # 9554346, 9557324-5, Fax # 880-2-7171820

MALIBAGH OFFICE:
JAHIR MENSION,
476/C, DIT ROAD(4TH FLOOR),
MALIBAGH, DHAKA-1219, BANGLADESH
Email: <southeastb@dhaka.net>
Tel # 58313056, Fax # 880-2-9344643.

We congratulate Babylon Group on
10th publication of Babylon Kathokata

Accident May Happen
Protection You Must Ensure

Call :

Bangladesh General Insurance Company Ltd.

Head Office: 42, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone : 9550379, 9564731, PABX : 9555073-74, 9563056-58, 9566125
FAX : +88-02-9564212, E-mail : bgic@citechco.net
Web: http://www.bgicinsure.com, Cable : BGIC, G.P.O. Box No. 3519

First General Insurance Company In Private Sector.
Service is our Strength

INCOMPARABLE CHEMICALS
We congratulate Babylon Group on
10th publication of Babylon Kathokata
denge
www.dengekimya.com
Textile Chemicals & Dyes
The Good Always Wins
Country Representative:
Auxicolour
Bangladesh
House#13(1ST Floor), Road#17,
Sector#11, Uttara Model Town,
Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:880-2-8991006,
Mobile:+8801713302884
Fax:+88028991006
Email: sharif@auxicolour.com
Web: www.auxicolour.com

Digital Printing
Billboard Rent
PVC Media Print
Signboard
Inkjet Print Mat

blue sky DIGITAL

Mou Ban super Market, 123,kakrail Road, Shantinagar,
1st Floor, Room No: 109-110, Dhaka-1217.Bangladesh.
Cell: 0172-55 20 602, 01720-12 44 04, 0174 68 90 708
E-mail: Blueskydigital14@gmail.com

Bluesky Media

Press Printing
PVC Baner Print
ECO Digital Print
Gift Items Supplier

Address :
Ayesha Shopping Complex
(1st Floor), Room # 204/205
Malibagh, Dhaka-1217
Bangladesh.

Tel : 934-6904
Fax : 934-6904
Mob : 017255-20602, 01191-335791
e-mail : softnetbluesky@gmail.com

ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

শরীয়াহ্ ভিত্তিক বীমার জগতে এক অনন্য নাম

অগ্নি, নৌ, মোটর, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিবিধ বীমার
সর্বোত্তম সেবা প্রদানে সারা বাংলাদেশে রয়েছে

আমাদের ৩৮টি শাখা।

ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড
ISLAMI INSURANCE BANGLADESH LIMITED

ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

(সহযোগিতা ও কল্যাণের প্রতীক)

প্রধান কার্যালয়

রূপায়ন তাজ (৩য় তলা)
১, ১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৮৩১৭৩৫৩ পিএবিএক্স ঃ ৮৩১৭৩২০, ৮৩১৭৬৭১, ৮৩১৭৭৩৭ ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৩১০৩২
ওয়েবঃ www.islamiinsurance.com ই-মেইলঃ islamiinsurance@gmail.com

সোনালী অতীতের সাড়ে-ছয়টি মাস

এস এম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

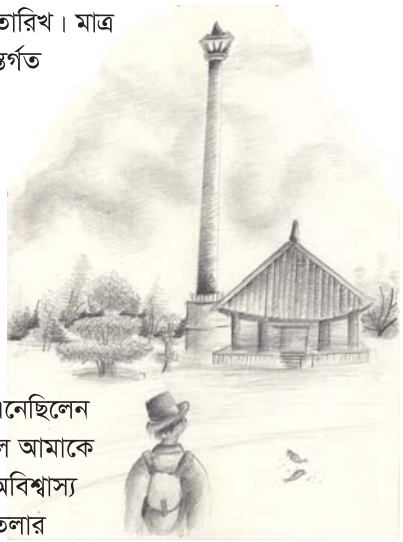

স্বপ্নের দিনটি ছিল ১৯৭৯ সালের মে মাসের ২ তারিখ। মাত্র ক'মাস আগে মাদারীপুর মহকুমা (তখনকার) অন্তর্গত কালকিনি থানা সদরের বাজারে হাত দেখে এক জ্যোতিষী বলেছিলেন, বিদেশে যাবার কপাল নিয়ে আমি জন্মাইনি। বিদেশ যাবার স্বপ্ন আমি দেখতাম একথা অবশ্য ঠিক নয়। তারপরও আমার কপালে সে সুযোগ জুটেই গেল ক'দিন পরেই। একদিন মাদারীপুর থেকে আনা একটা বাংলা দৈনিকে দেশ গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের তাকলাগানো এক নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল। আমার এক স্থানীয় বন্ধু পত্রিকাটি এনেছিলেন এবং বিজ্ঞাপনটি দেখেছিলেন। বন্ধুটির ধারণা ছিল আমাকে গাঁথার জন্যই বড়শিটি ফেলেছে দেশ কর্তৃপক্ষ। অবিশ্বাস্য ধরনের মোটা বেতন, বিদেশে প্রশিক্ষণ–রুই-কাতলার উপযোগী এইসব প্রলোভন আমার মতো চুনোপুটির জন্য যে নয় সেটা বোঝার মতো মস্তিষ্কের সুস্থতা আমার ছিল। কাজেই ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাবার খরচটি আমি করব না– এই সিদ্ধান্ত তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বন্ধুটি নাছোড়বান্দা। তিনি নিজেই দরখাস্ত লিখে তাতে আমার সই নিয়ে পোস্ট করে দিয়েছিলেন। এরপর লিখিত পরীক্ষা, ভাইভা-ঢাকায় গিয়ে এসব হয়েছিল ঠিকঠাক মতো।

দেশ গার্মেন্টস-এ সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত এক ঝাঁক তরুণের সাথে জীবনে প্রথম বিমানে চড়ে কলকাতা-ব্যাংকক-হংকং-টোকিও হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সউলে অবতরণ। এরপর বিশালাকারের এক বাসে চেপে প্রায় ছ'ঘন্টায় দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দরনগরী পুছান।

প্রথম বিমানে চড়া, বিলাসবহুল হোটেলে রাত্রিযাপন, বিশাল বিশাল বিমানবন্দর-টার্মিনাল-শুল্কমুক্ত বিপণী, তাকলাগানো চোখ- ঝলসানো সব অভিজ্ঞতা আমাদের সবার জন্য। ঢাকা থেকে উড়ে এসে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করি যখন তখন সন্ধ্যা নেমে গিয়েছিল। অশোক এয়ারপোর্ট হোটেলে আমাদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা ছিল। সুসজ্জিত কক্ষ, বাহারি লবি, সুবিশাল খাবার ঘর, রাতের খাবার খেতে খেতে অদূরে দণ্ডায়মান বাদকদলের বাজনা শোনা- এগুলো সব আমাদেরকে যেন এক স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। দামী

হোটেলে অবস্থান যে এতটা বিলাসিতা ধারণা ছিল না।

পরেরদিন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে উড়ে ব্যাংকক পৌঁছে বিরতি। সে সময়টাতে আমাদেরকে বিমান থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্ট টার্মিনালের ভেতরটা ঘুরে দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সে আরেক অভিজ্ঞতা! হরেক রকমের চকোলেট, দুনিয়াসেরা সব সুগন্ধি, মদ, ঘড়ি, ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র ও আরো কত কী!

হংকং বিমানবন্দরে (কাইটাক এয়ারপোর্ট) অবতরণের সময় একটা মজার বিষয় লক্ষ্য করেছিলাম। নেমে রানওয়ে ধরে দৌড়াবার সময় বিমানের ডানদিকের পাখাটি ক্ষণিকের জন্য হংকং হারবারের পানি ছুঁয়ে গিয়েছিল যেন। হারবার ঘেঁষেই তৈরি করা হয়েছিল রানওয়েটি। হংকং-এ অবতরণের পর বিমান থেকে বের হবার অনুমতি পাইনি আমরা।

টোকিওর নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার সময় দারুণ পুলক অনুভব করেছিলাম। আমাদের সেই সময়টাতে জাপানের স্বপ্ন দেখেনি এমন ক'জন ছিল তরুণদের মধ্যে?

সৌভাগ্য আর কাকে বলে! নারিতায় কুড়ি ঘন্টার বিরতি। স্বল্পকালীন অবস্থানের অনুমতির আনুষ্ঠানিকতা সেরে দৃষ্টিকাড়া, মন ব্যাকুলকরা ঝক্‌ঝকে শুল্কমুক্ত বিপণির সারির ভেতর দিয়ে হেঁটে এক সময় একটা ওভারব্রিজ অতিক্রম করে নারিতা রেস্টহাউজে পৌঁছাটা ছিল যেন এক স্বপ্নভ্রমণ।

রেস্টহাউজ শুনে বিভ্রান্ত হবেন না। আদতে নারিতা রেস্টহাউজটি ছিল ন্যূনপক্ষে একটা চারতারা মানের হোটেলের মতোই। দীর্ঘকাল আগের কথা, তাই আজ আর বিস্তারিত মনে নেই। তবে বাহারি কারুকাজ করা পুরু গালিচা বিছানো লবি, করিডোর পেরিয়ে আমার জন্য বরাদ্দ কক্ষটিতে প্রবেশ করে মন জুড়িয়ে গিয়েছিল তা বেশ মনে আছে। রঙিন টেলিভিশন ঐ প্রথম দেখা।

রেস্টহাউজের পালোকপোরা বালিশে মাথা রেখে, নরম বিছানায় গা এলিয়ে সে রাতে খুব ভালো ঘুমিয়েছিলাম তা বলতে পারি না। পরদিন সকালে নাস্তা সেরে বলতে গেলে সারাদিনটাই আমাদের হাতে। তা সত্ত্বেও বাইরে গিয়ে আশপাশটা ঘুরে দেখার অনুমতি আমাদের ছিল না।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সউল এর ফ্লাইট ছিল বিকেলের দিকে। এক ঘন্টার কম সময়ের উড্ডয়ন শেষে বেলা থাকতেই পৌঁছে যাই সেখানে আমরা। আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য অবশ্য দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দরনগরী পুছান বা বুছান। একই নগরীর নামের দু'রকম উচ্চারণ।

যাহোক, একটা বড় বাসে করে আমাদেরকে রওনা করে দেয়া হলো পুছানের উদ্দেশে। অন্ধকার নেমে আসায় রাস্তার দু'ধারের দৃশ্য দেখার তেমন কোনো সুযোগ আমাদের থাকল না।

দেউ কোম্পানির পুছানে অবস্থিত তাদের পোশাক-প্রস্তুত কারখানা ও কাপড়ের ডাইং-ফিনিশিং মিল-কারখানা এলাকায় পৌঁছাতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ছেলেদের থাকার জায়গা করা হয়েছিল একটি গির্জাকে সদ্য রূপান্তরিত করা ডরমিটরিতে। কাঠনির্মিত লম্বাটে ধরনের আয়তাকার ঘরটির মাঝখানে টানা ফাঁকা জায়গা। তার দু'ধারে উপরে-নিচে আলাদা আলাদা বিছানা পাতা ঘুমাবার জন্য। উপরের বাংকে ওঠার জন্য দুই পাশে দুইজোড়া কাঠের মই। আমার জায়গা খুঁজে নিলাম উপরেই একধারে। পলিয়েস্টার কাপড়ে মোড়া ফোমের বিছানা আর একইভাবে তৈরি বালিশ। মোটেও আরামদায়ক নয়। মাত্র গতরাতে নারিতা রেস্টহাউজের বিলাসী বিছানা ছেড়ে আসা তরুণদের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল তাদের প্রতি চরম দুর্ব্যবহারের মতো। আমাদের কেউ কেউ প্রতিবাদ জানিয়েছিল সিনিয়রদের কাছে। লাভ হয়নি কোনো তাতে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে কোনোদিনই মাথার নিচে পাইনি পলিয়েস্টার কাপড়ে মোড়া পিচ্ছিল ফোমের বালিশটিকে।

আমাদের সাথে আসা ষোলটি মেয়ের জন্য থাকার ব্যবস্থা ছিল অন্যত্র। দেউ কমপ্লেক্সের মধ্যেই- কিন্তু রাস্তার অপর পারে।

পরেরদিন সকালে একসাথে তিন হাজার মানুষ বসে খেতে পারে এমন এক বিশাল ডাইনিং হলে গিয়ে ডিম-পাউরুটি-জেলি দিয়ে নাস্তা সারলাম আমরা। নাস্তা শেষে এক সময় আমাদের সবাইকে দেউ'র সেলাই কারখানা ঘুরে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হলো। কৃত্রিম চামড়া কেটে সেলাই করে বড় বড় লাগেজ-ব্যাগ তৈরি হচ্ছে এমন একটা সেলাই-কারখানার ভেতর দিয়ে আমাদের লাইন করে ঘুরে দেখাবার কথা আজো ভালোই মনে আছে আমার। আরো মনে আছে যে ফ্যাক্টরিতে কর্মরত অসংখ্য নারী ও পুরুষ কর্মী আমাদের দিকে চেয়েও দেখেনি। পরে জেনেছি এটা ওদের কঠিন শৃংখলাবোধের এক চর্চা। অবাক হয়েছিলাম খুব; মোটের উপর ওদের জন্য আমরা একদল বিদেশিতো ছিলাম!

দেউ কোম্পানির এই বিশাল কারখানাসমষ্টির ভেতরকার যোগাযোগ পথের দু'ধারে জন্মানো চমৎকার সব ফুলবাগান মন জুড়িয়ে দিত। পরবর্তীতে সুযোগ পেলেই আমরা পালা করে বিশাল বিশাল গোলাপী-সাদা-লাল গোলাপ ফুটে থাকা ঝোপের সাথে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছি অনেক। পরে অবশ্য দেখেছি এদের সর্বত্রই ফুলের চর্চা দারুণ।

বাংলাদেশী প্রশিক্ষণার্থীদের তৃতীয় ও শেষ দলটি পৌঁছে যাওয়ার পর আমাদের তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সচরাচর দরকার হয় এমন কিছু কোরীয় ভাষা-জ্ঞান, দেশটির

সংস্কৃতি ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস– এসব প্রথম দিনেই সম্পন্ন হয়েছিল।

এরি মধ্যে আমাদের সবাইকে গাঢ় চকোলেট রঙের পলিয়েস্টার কাপড়ে তৈরি ইউনিফর্ম দেয়া হয়েছিল। ওগুলোর রং-ডিজাইন-মাপ কিছুই পছন্দ হয়নি আমাদের কারো। ছেলেদের ভেতর থেকে কেউ কেউ গাঁই-গুই করেছিল বটে কিন্তু সুবিধে হয়নি। সবাইকেই ঐ পোশাক মেনে নিতে হয়েছিল। দেউ'র কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদেরকেও একই ধরনের পোশাক পরতে হতো।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট তখন মিঃ পার্ক চুং হী। প্রাক্তন এই সামরিক কর্মকর্তা ১৯৬১ সাল থেকে দেশটির ক্ষমতায়। এই একনায়ক তখন কোরিয়ার নন্দিত প্রেসিডেন্ট। তিনি তাঁর লৌহশাসনের মাধ্যমে ঘুমন্ত ও পিছিয়ে পড়া এক জাতিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন নিজের পায়ে– উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন দেশটিতে। তাঁর শাসনামলে দেশটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঈর্ষনীয়; আর ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে দেশটির সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্র তখন বাকি দুনিয়ার কাছে এক বিস্ময়! কাকতালীয়ভাবে আমাদের কোরিয়া অবস্থানকালেই অক্টোবরের ২৬ তারিখে এই লৌহমানব আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তৎকালিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁর শেষকৃত্যে। ডরমিটরির সাদাকালো টেলিভিশনের পর্দায় সেই ঘটমান দৃশ্য দেখেছি আমরা তাৎক্ষণিক।

দেউতে অবস্থানের একমাসের মধ্যে একদিন আমাদের প্রশিক্ষকদের একজন, মিঃ ইউ (ইংরেজী ভালো জানতেন এমন একজন) এলেন আমাদের মেয়ে সহ-প্রশিক্ষণার্থী মিস নাজমার কাছে। তিনি নাজমাকে বললেন, তার দেউ তথা দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণের উপর এসময়ের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখে দিতে। তিনি জানালেন সেই লেখাটি তারা দেউ'র মাসিক পত্রিকায় ছাপবেন। নাজমা বাংলায় লিখলেন সেটি এবং ক'দিন পরে আমাকে লেখাটি দিয়ে বললেন ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে দিতে। আমি আমার সাধ্যমতো করলাম। পরে অনুবাদটি মিঃ ইউর কাছে জমা দেয়া হলো। মিঃ ইউ তার সহকর্মী প্রশিক্ষক মিঃ রীকে সংগে নিয়ে তাৎক্ষণিক পড়তে বসলেন সেটা। আমি কাছে দাঁড়িয়ে একটা ভয় মিশ্রিত কৌতুহল নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। পড়তে পড়তে হঠাৎ এক জায়গায় এসে দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠলেন তারা। লজ্জায় আমার চেহারা তখন লাল। কী ভুল লিখলাম যা তাদের হাসির উদ্রেক করেছে? বিব্রত হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম চেহারায় বোকা বোকা ভাব করে।

– তুমি 'মিঃ হী' লিখেছ পার্ক চুং হী- কে উল্লেখ করতে গিয়ে– মিঃ ইউ মুখ তুলে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন। লিখতে হতো 'মিঃ পার্ক।' সে যাহোক আর সব ঠিক আছে। ভুল শুধরে নিলাম মনে মনে। আমরা আমাদের রীতি অনুযায়ী 'মিঃ নুরুল কাদের খান' কে 'মিঃ খান' বলে উল্লেখ করলে ভুল হয় না। কিন্তু কোরিয়ানরা মিঃ কিম বাঙ জু কে মিঃ কিম

বলবে, মিঃ জু নয়। শিখলাম।

একদিন দেখলাম নাজমার লেখাটি তার রঙিন ছবিসহ দেউ'র মাসিক ঘরোয়া পত্রিকার চলতি সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। রচনাটি অবশ্যই কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা। তাও ভালো লাগল খুব। নাজমা খুশি, আমিও খুশি। কোথাও কোথাও 'দেশ গার্মেন্টস', 'বাংলাদেশ', এসব ইংরেজীতে লেখা থাকায় আমাদের সবারই ভালো লাগল।

প্রশিক্ষণের জন্য কোরিয়ায় প্রায় সাড়ে ছয়মাস অবস্থান ছিল অন্ততঃ আমার জন্য স্বপ্নে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহের মতো। যেন একটি রঙিন ছায়াছবি যার একটি সাধারণ চরিত্রে আমিও রূপদান করে গিয়েছি।

প্রায় দেড় মাস ধরে তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণে আমাদেরকে নানান বিষয়ের সাথে সেলাই ও সেলাই-মেশিন সম্পর্কিত খুঁটিনাটি অনেক কিছু শেখানো হয়েছে। এরি মধ্যে দেউ'র এক কারখানা থেকে মেশিন ইত্যাদি এনে এক জায়গায় ক্ষুদে একটা ফ্যাক্টরি সাজানো হয়েছে আমাদের হাতে-কলমে পোশাক তৈরি বিদ্যা রপ্ত করাবার জন্য। কাপড় কাটার জন্য টেবিল থেকে শুরু করে দরকারি সবজাতীয় সেলাই-মেশিনের পরে তৈরি পোশাক ইস্ত্রী করে ভাঁজ করার টেবিলসহ সবি ছিল মিনি ফ্যাক্টরিটিতে।

বলতে গেলে প্রায় প্রতি রোববারই আমাদের জন্য বাইরে বেড়াবার ব্যবস্থা ছিল। দেউ কোম্পানিরই তৈরি বড় বড় বাসে করে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হতো পুছানের দর্শনীয় জায়গাগুলোতে। বাসের সাউন্ড সিস্টেমে বাজত গানের ক্যাসেট। ইলেকট্রিক অর্গান ছিল কোরিয়ানদের ভীষণ প্রিয়। অর্গানের অপূর্ব সব বাদন আমাদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা আচ্ছন্ন করে রাখত। সেই সব আজো সুখস্মৃতি হিসেবে অম্লান আমার হৃদয়ে। জন ডেনভারের কান্ট্রি সং আমি দেউ'র বাসেই প্রথম শুনি।

রোববারে বেড়ানোর জায়গাগুলোর অন্যতম ছিল বিভিন্ন গাছ-গাছালি ও সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠসম্বলিত পার্ক, চিড়িয়াখানা, সোনালী বালির সমুদ্র-উপকূল, বৌদ্ধমন্দির, সুউচ্চ পাহাড়চূড়ায় উঠে যাওয়া কেবলকার, ইত্যাদি। হেউন্দে সী-বীচের পাড়ে একে একে ধেয়ে আসা ঢেউয়ের মধ্যে হাঁটু ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সমুদ্রের নোনা পানির ত্বক-জুড়ানো শীতল আলিঙ্গন উপভোগ করেছি।

পঁয়ষট্টি শতাংশ পাথুরে ভূমির শীতপ্রধান এই দেশটিতে সরলবর্গিয় বৃক্ষরাজীর সমাহার-হেমন্তে সেই সব বনজ-প্রান্তরে হলুদ, কমলা ও লালের যে প্রদর্শণী হয়েছিল তা আমাদের তরুণ মনের উপর দিয়েও নানা বর্ণের তুলির আঁচড় বুলিয়ে দিয়েছিল। পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে উৎসারিত স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানির ধারা নেমে এসে ছোট্ট খরস্রোতায় পরিণত হয়েছে

কোথাও কোথাও। ছোটোবড় নানান আকৃতির উপলখন্ডের বাঁধা উৎরিয়ে এখানে ওখানে ঘূর্ণী তৈরি করে, আবার কোথাও সফেন ঊর্মি তৈরি করে বয়ে চলেছে। সেই বরফ-শীতল স্রোতধারায় পা ডুবিয়ে কাছিমের পিঠের মতো জেগে থাকা কোনো পাথরস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছি আমরা। কখনো কখনো ঐসব প্রাকৃতিক ঝর্ণার সুমিষ্ট শীতল পানি আকন্ঠ পান করেছি পরম তৃপ্তি ভরে। দেউ'র ডাইনিং হলের খাবার পানি আসত পাইপ বেয়ে প্রায় ফুটন্ত গরম হয়ে। জীবন রক্ষার্থে ঐ পানি পান করতে হতো আমাদেরকে– তৃপ্তি সহকারে আকন্ঠ পানের পানি সেটা ছিল না।

স্বভাবে বদরাগী হলেও এদেশের পুরুষগুলোকেও দেখেছি দারুণ কর্মঠ ও শৃঙ্খলা মেনে কাজ করার ক্ষেত্রে যেন দায়বদ্ধ। মাঝে মাঝে এদেরকে দেখে মনে হতো এরা যেন সামরিক বাহিনীর সদস্য। ঊর্ধ্বতনদের প্রতি এদের ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ দেখে এর ভিন্ন কিছু মনে হতো না। প্রতিবেশী দেশ জাপানের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সাফল্যকে কোরিয়ানরা দারুণ ঈর্ষার সাথে দেখত। আর সেই ঈর্ষাবোধ থেকে জন্ম নেয়া কর্মস্পৃহা নিয়ে খাটত সবাই নিজেদের দেশটিকে জাপানের কাতারে নিয়ে যেতে দ্রুত। ফলশ্রুতিতে কি হয়েছে তা আজ আমরা সবাই জানি।

যেসব রোববারে দেউ'র আয়োজনে আমাদের বাইরে বেড়াবার কর্মসূচী থাকতনা, সে সব দিনে আমরা নিজেরাই দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তাম আশেপাশের জায়গাগুলোতে। কখনো পায়ে হেঁটে, আবার কখনোবা বাসে চেপে। রাস্তার পাশে দোকানগুলোর পার্টিশানের আড়ালে বসবাস করত পরিবারের সদস্যরা, আর সামনের দিকটাতে রাস্তামুখ করে পসরা সাজিয়ে মনিহারি দোকান। দোকানি বৌটি হয়তো তার বাচ্চা সামলাচ্ছে ঘরের ভেতরে আড়ালে সামনে দোকান খোলা রেখে। তাই বলে বিক্রি বন্ধ থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পণ্যের গায়ে দাম লেখা আছে– আপনি একটি পেন্সিল ও রাবার কিনবেন তো কৌটোতে পয়সা রেখে নিয়ে যান আপনার জিনিস। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম– কোনোদিন কি সম্ভব এমনটা আমাদের দেশে?

বাসে করে বামিল ডং নামে একটা জায়গায় যেতাম আমরা মাঝে-মধ্যে। অনেকটা আমাদের চকবাজারের মতো জায়গাটা। অনেক ধরনের পণ্যের সাথে থানকাপড়ও বিক্রি হতো সেখানে। বেশ সস্তা মনে হওয়ায় আমরা অনেকেই কাপড় কিনেছি সেখান থেকে। মুখচেনা হয়ে যাওয়ায় একসময় ওরা দোকানিরা আমাদেরকে দূর থেকে দেখেই বলত- নো কাকা জোসেয়। ওদের ভাষায় 'কাকা জোসেয়' মানে হলো- দাম কমাও। প্রথম দিকে আমাদেরকে বেশ খাতির করলেও 'কাকা জোসেয়'-এর মাত্রাধিক প্রয়োগে একসময় তা দোকানিদের মধ্যে বিরক্তির সঞ্চার করেছিল। সেই বাজারে হাঁটতে হাঁটতে দেখেছি স্থানীয় মানুষদেরকে পথ-পার্শ্বের ফেরিওয়ালা থেকে শিশু অক্টোপাস কিনে খেতে সস্ দিয়ে- কাঁচা। চ্যাপ্টা ধরনের সামুদ্রিক মাছের শুট্‌কী খেতে দেখেছি বাচ্চাদেরকে মায়ের কোলে চড়ে–

যেন আমসত্ত্ব খাচ্ছে।

একবার পুছান টাওয়ারে গিয়েছিলাম আমরা সবাই বেড়াতে। তালগাছের মতো একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুউচ্চ স্তম্ভটার নীচে ছিল একটা বড়সড় বৃত্তাকার ফুল-বাগান। খাটো করে কাটা রঙ-বেরঙের পাতাবাহারের ঝোপ ও ফুলে ঠাসা বাগানটির মাঝখানে শোভা পাচ্ছিল ঘন্টা-মিনিটের কাঁটাওয়ালা এক বিশাল ঘড়ি। কাঁটা চলছিল শরীরে ঝোপঝাড় ও ফুলসমেত। ১৯৭৯ সালে সে এক মজার অভিজ্ঞতাই ছিল। দিনটি রোববার হওয়ায় নানান দেশের পর্যটকদের ভীড় ছিল জায়গাটিতে। হঠাৎ কোথা থেকে এক বিশালদেহী নিগ্রো এগিয়ে এল আমার দিকে হাত বাড়িয়ে। লম্বায় লোকটা ছয়ফুট দুই-তিন ইঞ্চির কম হবে না। সাথে তার আকারে বেমানান কোরিয়ান বান্ধবী। আলাপে জানলাম যে কালো চামড়ার দৈত্যটি আসলে আমেরিকান মিলিটারির একজন সদস্য। পুছানের আমেরিকান আর্মির ঘাটির কথা আগেই শুনেছিলাম। সেই মার্কিন সৈনিকটির নাম আজ আর মনে নেই। বেশ কিছুক্ষণ গল্প হয়েছিল তার সাথে এবং বিদায় নেবার আগে সে আমাকে ক্লাবে ডিনারের দাওয়াতও দিয়েছিল। সেই দাওয়াত অবশ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।

হঠাৎ একদিন শুনলাম পাশের এক শহরে প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক গোল্ডকাপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আর তাতে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশও। অনেক বলে কয়ে দেউ কর্তৃপক্ষকে রাজি করানো গেল যে আমরা সবাই বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা ম্যাচটি দেখতে যাব। আগেরদিন রাত জেগে বানানো হলো বিভিন্ন মাপের ব্যানার ও বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা আমাদের প্রশিক্ষণ ফ্যাক্টরিতে। এ কাজে কোরিয়ান প্রশিক্ষকরাও সাহায্য করেছিলেন আমাদেরকে। যতখানি মনে আছে পুছান থেকে বাসে করে দুই-আড়াই ঘন্টায় পৌঁছে গিয়েছিলাম ডেগু শহরে। বিশাল বিশাল ইলেক্ট্রনিক স্কোর-বোর্ড, গাঢ় সবুজ রঙের মাঠের প্রান্ত ঘেঁষে উপবৃত্তাকার ইট-রঙা এ্যাথলেটিক ট্র্যাক, গ্যালারিতে লাল-সবুজ-হলুদ-নীল বর্ণের আসন– এসব মিলে আধুনিক এই স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে মন জুড়িয়ে গিয়েছিল। মনে মনে নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছি অসংখ্যবার। আজো পরিষ্কার মনে আছে গ্যালারিতে একসাথে বসে থাকা শতাধিক বাংলাদেশীর হাতে নিজ দেশের জাতীয় পতাকার আন্দোলন বাংলাদেশী দলটির সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মুহূর্তের জন্য হলেও থমকে দিয়েছিল তাদেরকে বিস্ময়, গর্ব ও আনন্দে। বাংলাদেশ জিতেছিল সেদিন শ্রীলঙ্কা দলকে হারিয়ে।

প্রশিক্ষণ শেষ পর্যায়ে। একদিন বেশ ঘটা করে আমাদেরকে রাজধানী সউল নিয়ে যাওয়া হলো বেড়াতে। সেখানে তখন ঠান্ডা পড়ে গিয়েছে বেশ। পর্যাপ্ত গরম কাপড় না থাকায় শীতে ঠক ঠক করে কেঁপেছি দিনের বেলাতেও। এক সহ-প্রশিক্ষণার্থী মধুসূদন তার কৃত্রিম চামড়ার জ্যাকেটটি পরতে দিয়েছিলেন আমাকে। ওটা নাহলে সউল শহরে হেঁটে ঘুরে দেখা সম্ভবই হতো না আমার পক্ষে সেদিন। নভেম্বরের সোনালী রোদে সাজানো গোছানো

অত্যাধুনিক রাজধানী শহরটিকে অপরূপ ও ঝলমলে লাগছিল। সুন্দর একটা মসজিদের সামনে থামা হয়েছিল কিছু সময়ের জন্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ ও ধর্মবিশ্বাসহীন জনগোষ্ঠীর দেশটির রাজধানীতে এত সুন্দর একটা মসজিদ দেখে আমাদের বেশ ভালো লেগেছিল। সম্ভবত সউলেই আমাদেরকে দেউ'র একটি ভারী শিল্প-কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে তারা বুলডোজার ও মাটি খোঁড়ার যন্ত্রের মতো ভারী নির্মাণ যন্ত্রাদি বানাত। বিশাল এলাকা জুড়ে লাইন করে সাজিয়ে রাখা ঐসব যন্ত্রপাতিকে প্রাগৈতিহাসিক দৈত্য-দানবের মতো লাগছিল।

রাতে আমাদের সম্মানে ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে ফ্রাইড-রাইসের মধ্যে ঝিনুকের মাংস থাকায় আমরা অনেকেই খেতে পারিনি সেই রাতে। আমাদের রাত্রি-যাপন হয়েছিল ইওথ বান্দো হোস্টেলে। পরেরদিন ট্রেনে করে আমাদের পুছান আসার পালা। সউল স্টেশনের অদূরে বিশ-বাইশতলা উঁচু দেউ কোম্পানির প্রধান কার্যালয় দূর থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের।

দেশে ফেরার প্রস্তুতি চলছে এমন একদিন সেই মিঃ ইউ আবার এলেন লেখার জন্য। এবার আমাকে বলা হলো লিখার জন্য। প্রশিক্ষণ শেষ- কাজেই এই দেশটি, তার মানুষজন, প্রকৃতি, আমাদের প্রশিক্ষণ- এসবের উপর তখন কত কিছুইনা লিখা যায়! লিখলাম আমি। মিঃ ইউ লেখা পড়ে বেশ খুশিই হলেন বলে মনে হলো। আমাকে এক সবুজ মাঠে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হলো বেশ ক'টি। লেখাটির সাথে আমার ছবিও ছাপা হবে– বেশ দারুণ উত্তেজনাকর একটা অনুভূতি। কিন্তু পত্রিকা বের হতে হতে আমরাতো বাংলাদেশে! মিঃ ইউ-কে অনুরোধ করলাম আমার জন্যে পত্রিকার একটা কপি পাঠাতে বাংলাদেশে। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি তা করবেন- পত্রিকা বের হলে একটি কপি আমার জন্য দেশ গার্মেন্টস-এর অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।

সেই পত্রিকার কপি আমি পাইনি কোনোদিনই। সেই না পাওয়ার কষ্টটি আমি আজো ভুলতে পারিনি। দেউ'র সেই মাসিক পত্রিকা আমার মনে অলক্ষ্যে ব্যাবিলন কথকতার বীজ বুনে দিয়েছিল সেই সময়।

১৬ই জুলাই

অনিক সঞ্জয় বড়ুয়া
মেডিক্যাল অফিসার
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

সেদিন ছিল শুক্রবার। ১৬ জুলাই ২০১০। মেডিক্যালের ২য় পেশাগত পরীক্ষার লিখিত সবে শেষ হলো। বাকি আছে কঠিন মৌখিক পরীক্ষা এখনো। মেডিক্যাল হসপিটালের সামনের দোকানে সকাল সকাল নাস্তা করতে আসলাম। একটা পরোটা খেয়ে দ্বিতীয়টাতে হাত দিলাম, তখনই ফোন আসলো একটি অচেনা বাংলালিংক নাম্বার থেকে। রিসিভ করতেই এক লোক বলতে লাগল, আপনি কি রেলির ভাই? আমি বললাম-জি বলছি। আপনার ভাই বর্তমানে পঙ্গু হাসপাতালে আছে। এক্সিডেন্ট করেছে। শুনে কেমন যেন লাগল। তখনও খুব একটা বিস্মিত হলাম না। কারণ মেডিক্যালে প্রতিদিন ভুরি ভুরি এক্সিডেন্টের রোগী দেখতে দেখতে অনেকটা মানসিকভাবে শান্ত হয়ে গেছি। তবুও আপন ভাই বলে কথা, জিজ্ঞেস করলাম- খুব কি সিরিয়াস? লোকটি বলল- আমি উনাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি। আপনি তাড়াতাড়ি আসেন। আমি আর চিন্তা না করে আমার ভাইয়ার মোবাইলে ফোন দিলাম। সে ফোন রিসিভও করল এবং খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, ভাই আমি হসপিটালে। তুই তাড়াতাড়ি আয়। আমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, এখনই আসছি। ফোন রেখে সবার আগে গেলাম আমার মামার বাসায়। ছোট মামাকে নিয়ে চলে গেলাম পঙ্গু হাসপাতালে। তখনও বাবা-মাকে ব্যাপারটা জানাইনি। হাসপাতালে গিয়ে দেখি, ভাই আমার স্ট্রেচারে শুয়ে আছে। বাম পায়ের পুরোটা ব্যান্ডেজ করা। ইমার্জেন্সিতে ডাক্তারের সাথে কথা বললাম। ডাক্তার বললেন, প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছি, এখন এক্সরে করাতে হবে। আরো বললেন, ওকে শুইয়ে এক্সরে করাতে হবে, দাঁড়িয়ে করাতে পারবে না। কারণ তার বাম রানের হিপ জয়েন্ট ডিসলোকেশন এবং হাঁটুর নিচের টিবিয়া ফিবুলা পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে। আমি ভাবলাম এত বড় দুর্ঘটনা, কিন্তু ভাইটার চোখে মুখে কোনো কান্না, ব্যথা বা ভয়ের চিহ্নই দেখলাম না। আমার দেখা এই প্রথম একজন যে কিনা এত বড় দুর্ঘটনার পরও এতটা নির্বিকার। আমার খুব কান্না পেল। ডাক্তারের কথা থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম যে দুর্ঘটনাটা কত বড়।

ভাইয়ার পুরো লাইফটাইতো পরিবর্তিত হয়ে গেল। সেতো আর আগের মতো হাঁটতে, দৌড়াতে পারবে না। ভাইয়া স্কুল লাইফে দৌড় প্রতিযোগিতায় সব সময় ফার্স্ট হতো।

ক্রিকেটেও খুব ভালো একজন অলরাউন্ডার ছিল। চট্টগ্রামে অনূর্ধ ১৯ এ খেলার সুযোগও পেয়েছিল সে। সবইতো শেষ চোখের পলকে। ডাক্তার বললেন, এখনই এক ব্যাগ 'ও পজেটিভ' ব্লাড লাগবে। তোমার ভাইয়ের অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে। আমি বললাম- স্যার আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট, স্যার বললেন- খুব ভালো, তাহলেতো কথাই নেই। তোমার ভাই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। কথাটা শুনে খুবই ভরসা পেলাম। বললাম স্যার, আমার রক্তের গ্রুপও ও পজেটিভ। স্যার মজা করে বললেন, বি পজেটিভ টু ডোনেট ব্লাড। সাথে সাথে আমিও হাসলাম। পরে আমার এক ব্যাগ রক্ত ঝুলিয়ে দিলাম ভাইয়ার বেডের পাশে। রোগীর বেডে তখনো খুবই স্বাভাবিক শুয়ে আছে ভাইয়া। জিজ্ঞেস করল, মা-বাবা কি জানে? বললাম আরেকটু পরে জানাব, এখন না। ছোট মামাও তাই বলল।

আর কয়েকদিন পরই শুরু হবে আমার মৌখিক পরীক্ষা। এদিকে ভাইয়ার এত বড় দুর্ঘটনা, ভাবতেই পারছিলাম না কী হচ্ছে এসব। ভগবান কি আমার আসল পরীক্ষা নিচ্ছেন? মনটা হঠাৎ করেই ভেঙে গেল। ভাবছিলাম, পরীক্ষায় পাস না করলে ফাইনাল ইয়ারে উঠতে পারব না। যেভাবে হোক পরীক্ষার জন্যও ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে। কিন্তু কীভাবে? হাসপাতালে যে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাবা মা দু'জনই চট্টগ্রামে। দু'জনই চাকুরিজীবী। ছোট মামাও চাকুরী নিয়ে ব্যস্ত। আর মেডিক্যালের ব্যাপারগুলো আমি যতটা ভালো বুঝব, তারা ততটা বুঝবে না। সাত দিন পরই ফরেনসিক মেডিসিন বিষয়ের মৌখিক। মাথা পুরোটাই নষ্ট আমার। এখনো এক পাতাও রিভিশন করতে পারিনি। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দরখাস্ত করলাম, যাতে আমার ভাইবাটা সবার শেষে নেয়া হয়। বিভাগীয় প্রধানের দয়ায় শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হলো। পরীক্ষাটা শেষ দিনেই হবে আমার।

এর মধ্যে বাবা-মা চলে আসলেন। তাদের ছেলে বেডে শুয়ে কষ্ট পাচ্ছে। এ এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য যা না দেখলে বোঝানো যাবে না। সব বাবা-মা হয়তো এমনটিই করবে তাদের বুকের ধনকে এভাবে দেখলে। দুর্ঘটনার দুই দিন পর সিনিয়র সার্জন ও সার্জারি অধ্যাপক ডাঃ গনী মোল্লাহ স্যার আসলেন ভাইয়াকে ফলোআপ করতে। আমি বেডের পাশে পাটি বিছিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়ছিলাম। ক্যাবিন তখনো পাইনি। হঠাৎ একঝাঁক ডাক্তার দেখে আমি তড়িঘড়ি করে উঠে পড়লাম বই খাতা সব ওভাবেই রেখে। গনী মোল্লাহ স্যার বললেন, রোগীর অপারেশন এক সপ্তাহ পরে করতে হবে, এখন কোনো সিরিয়াল নাই। সরকারি হাসপাতালের এই একটাইতো বড় সমস্যা। সিরিয়াল পাওয়া যায় না। ততদিন ভাইয়াকে এন্টিবায়োটিক দেয়া হবে। গনী মোল্লাহ স্যার হঠাৎ ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ফরেনসিক মেডিসিন বই কার? আমি বললাম, স্যার আমার। সাতদিন পর মৌখিক। স্যার চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন ভাইয়ের এ অবস্থায় তোমার পড়াশোনায় মন বসছেতো। বললাম স্যার কী করব, উপায় নেই পড়তেতো হবেই। পাশ করতে হবে যতই ঝড় আসুক। স্যার বললেন, Best of luck. স্যার তো ভালোভাবেই

জানেন মেডিক্যালে ৬০ ভাগ নম্বর নিয়ে প্রতিটা বিষয়ে পাশ করা কতটা কঠিন।

ঠিক সাত দিন পর ভাইয়ার অপারেশন আর সেই দিনই আমার ভাইবা। পুরো ঘটনাটাই লীলা-খেলা মনে হচ্ছিল। ভাইবা দিলাম। এক প্রকার Miracle বলা যায়- ভাইবা অসম্ভব রকমের ভালো হলো আমার। ভাইবা শেষ করেই দৌড় দিলাম বাসস্ট্যান্ডে এবং এক বাসেই পঙ্গু হাসপাতাল। এসে দেখি তখনো ভাইয়া অপারেশন রুমের বাইরে অপেক্ষা করছে। আরো বেশি বিরক্তিকর পরিস্থিতি। আসলেইতো এটা সরকারি হাসপাতাল! সকাল দশটার অপারেশন দুপুর গড়িয়ে গেল। এখনো সিরিয়াল আসছে না। যাইহোক, শেষমেষ অপারেশন শেষ হলো। তখন বিকাল চারটা। তার পরের দিনই কেবিন পেয়ে গেলাম। ওখানে শিফট করলাম। এর পরদিন থেকে খালি দিন গোনা, কবে সুস্থ হবে। এর মধ্যে কেটে গেল প্রায় এক মাস। ততদিনে পরীক্ষাও শেষ। এবার হাসপাতাল থেকে Discharge এর পালা। Discharge letter পেয়ে আমরা মহাখুশি, এবার বাড়ি যেতে পারব কিন্তু ফলোআপে আসতে হবে ১৪ দিন পর এবং নিয়মিত ড্রেসিংতো অবশ্যই। যাইহোক, ইতিমধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক চললেও টেনশন পেয়ে বসেছিল পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে। সব বিষয়ে পাশ অথবা ফেল। অবশেষে রেজাল্ট পেলাম ফোনের মাধ্যমে। এক বন্ধু ফোন করে বলল, তুই পাশ করেছিস। কথাটা শুনে বিশ্বাস হচ্ছিলনা আমার। রেজাল্ট দেখার অপেক্ষায় মন আনচান করছিল। পরের দিন নোটিশ বোর্ডে রেজাল্ট দেখে নিজেকে আসলেই এলিয়েন ভাবতে শুরু করলাম। তাছাড়া বন্ধুরাও জানত যে ঠিক কতটুকু কষ্টের ফসল ছিল এই রেজাল্ট। এভাবে এত বছর পর আবার ঘুরে ফিরে আসলো সেই ১৬ই জুলাই, ভাইয়ার দুর্ঘটনার দিন। যথারীতি রাত বারটার পর ফেসবুক এবং ফোনে সবাই Wish করতে লাগল আমাকে। আমিও অনেক খুশি, কারণ দিনটা যে ছিল আমার জন্মদিন। পাশাপাশি জীবনের না ভোলা কষ্টেরও একটি দিন এবং অবশ্যই অবশ্যই চাইব এমন খুশির দিন যেন কম মানুষের জীবনে হয়। যা প্রতিনিয়ত স্মৃতির খাতায় ভাস্বর হয়ে থাকবে।

শংখ সংগম

হাসান মোঃ আশরাফুল হক
এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি ছোটবেলা থেকেই ভীষণ আকর্ষণ ছিল আর আকর্ষণের ডালপালা মেলেছিল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়। তখন আমরাও নতুন, সিলেট শহরও ছিল দুর্দান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। আমরা বন্ধুরা প্রত্যেক সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হলেই ঘুরতে যেতাম বিভিন্ন স্থানে। চট্টগ্রাম, বিশেষ করে বান্দরবানে ঘুরতে যাবার বীজ-বোনা তখন থেকেই। প্রথম সুযোগটা আসতে আসতে অনেকদিন কেটে গেল। ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাস। তারিখটা মনে নেই। সম্ভবত ১৮ তারিখ ছিল। আমি বসেছিলাম ধানমণ্ডি শংকর প্লাজার সামনে। সন্ধ্যা ৭:৩০। বন্ধু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসমেট অন্তর কল করে বলল, ওরা বান্দরবান যাবে, আমি যাব কি না। আমিও তখন আমার প্রথম চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। তাই চিন্তা না করেই বললাম যে, আমি যাব। আধ ঘন্টার মধ্যেই বাসায় গিয়ে ব্যাগ রেডি করে রাত ৮:৩০ এ কল্যাণপুর থেকে শ্যামলী পরিবহনের বাসে করে রওনা দিলাম বান্দরবানের পথে। সাথে আমি ও আমার তিন বন্ধু অন্তর, অনিক ও আপন। অন্তর সবসময়ই ভ্রমণপাগল, বাসে উঠে ভ্রমণ প্ল্যান ব্যাখ্যা করল। আমাদের টার্গেট ছিল দুর্গম নাফাখুম ঝর্ণা। বন্ধু অন্তর অনলাইন থেকে নাফাখুম যাবার বর্ণনা ও কিছু ছবি প্রিন্ট করে এনেছিল। ছবি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম দারুণ একটা যাত্রা হবে।

যথাসময়ে বাস ছাড়ল। পথে যাত্রাবিরতি ও জ্যাম পেরিয়ে আমরা যখন বান্দরবান শহরে পৌঁছালাম তখন সকাল ৬:০০ টা। আমাদের পরবর্তী টার্গেট হলো থানচি। থানচির বাস কোন স্থান থেকে ছাড়ে আমরা জানতাম না। তাই কথা বলে রিক্সা নিয়ে আমরা বাসস্ট্যান্ডে চলে এলাম। এতদিন পর জায়গাটার নাম আমার মনে নাই। যে বাসটার টিকেট কাটলাম সেটা ছাড়বে সকাল ৯:০০ টায়। হাতে অনেক সময়, তাই নাস্তা করতে চলে এলাম। এখানে এসে পরিচয় হলো আরো দু'টো ছেলের সাথে- ডাঃ জায়েদ ও ডাঃ সানী। ওরা তখনো ডাক্তার হয়নি। পড়াশোনা করত ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে। কথা বলতে বলতে জানলাম ওরা আমাদেরই ব্যাচমেট এবং ওরাও নাফাখুম যাচ্ছে। তো গন্তব্য যেহেতু এক, আমরা ছয়জন মিলে একটা গ্রুপ হয়ে গেলাম।

থানচি একটি দুর্গম থানা শহর যার দূরত্ব বান্দরবান শহর থেকে ৯০ কিলোমিটার। যেতে হবে বাসে করেই এবং সময় লাগবে ৫ ঘন্টার মতো। রাস্তাটা বেশ দুর্গম। অনেকটা মরুভূমির বালিয়াড়ির মতো উঁচু এবং নিচু, আঁকা-বাঁকা। বাস যখন চলবে তখন রাস্তার অনেক বাঁকেই আপনার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। সরু রাস্তার একপাশে পাহাড় এবং অন্য পাশে খাদ। তবে ড্রাইভারগুলো অনেক ভালো। আমি চিন্তা করছিলাম, আমাদের ঢাকা শহরের ড্রাইভারগুলো যদি এইসব রাস্তার চালক হতো তবে হয়তো প্রতিদিনই দুর্ঘটনার সংবাদ পত্রিকায় আসত।

যাইহোক, রাস্তার দু'পাশের সৌন্দর্য বর্ণনা করার ভাষা নেই আমার। আমি নিশ্চিত যে রাস্তার এইসব বিপজ্জনক বাঁকের কথা আপনি ভুলেই যাবেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে।

আফসোস ছিল একটাই, বাসে করে যাবার কারণে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আমরা দেখতে পারিনি। অনেক ইচ্ছা ছিল একটু নেমে দেখি। পথে অনেক ছোট ছোট উপজাতীয়দের বাজার, বিভিন্ন আঞ্চলিক ফল, ওদের নিজেদের বোনা কাপড়। যদি নিজেদের ম্যানেজ করা গাড়ি থাকে তবে কিনে নিতে পারেন প্রিয়জনদের জন্য এসব কাপড়, চেখে নিতে পারেন পাহাড়ি ফল।

বিকেল চারটার দিকে থানচি পৌঁছালাম। শীতের দিন বলে সন্ধ্যা নেমে এসেছে বলে মনে হলো। আমাদেরকে যেতে হবে রিমাক্রি বাজার। যাত্রাপথ নৌকায়।

রিমাক্রি বাজার যেতে হলে আপনাকে প্রথমে বিজিবিতে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আপনার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার, পরিবারের কারো মোবাইল নাম্বার ইত্যাদি। আমাদের একটু তাড়াহুড়ো করতে হলো। সন্ধ্যা হয়ে গেলে বিজিবি সাধারণত যেতে দেয় না, কারণ নদীপথ অনেক দুর্গম। আর আমরাও রাতটুকু থানচিতে থাকতে চাইছিলাম না। রেজিস্ট্রেশন করে বের হতে এক ঘন্টার মতো লাগল। নৌকা ভাড়া করতে গিয়ে দেখলাম, ভাড়া নির্দিষ্ট করা আছে বিজিবি থেকে। সাথে নৌকার চালকও। তাই ওরা চাইলেও আপনার কাছ থেকে বেশি টাকা নিতে পারবে না বা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রতি নৌকায় সর্বোচ্চ ছয়জন যাত্রী এবং দুইজন নৌকার মাঝি যেতে পারে। আসা-যাওয়ার ভাড়া ৩৫০০ টাকা। যদি আপনি আরো বেশিদিন সেখানে থাকতে চান তবে প্রতিদিনের জন্য আপনাকে ১০০০ টাকা করে অতিরিক্ত দিতে হবে। আর রিমাক্রি বাজার থেকে যদি আরো অন্য কোনো দর্শনীয় স্থান দেখতে যেতে চান, তবে আপনাকে আলাদাভাবে ভাড়া ঠিক করে নিতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, এই নৌকার সাথে আপনি আপনার পরিচিত নৌকা মেলাতে পারবেন না। দৈর্ঘ্যে ১০-১২ ফুট এবং প্রস্থে মাত্র ৩ ফুটের মতো। কেন নৌকার এই মাপ সেটা বুঝতে পারলাম ভ্রমণ শুরু করার পর।

আমরা একজন মাত্র মাঝি পেলাম যে যেতে রাজি হয়েছিল। তার কারণও ছিল, অত্যন্ত দুর্গম পথে ২/৩ ঘন্টা রাতের বেলার যাত্রা, সাথে ডাকাতির ভয়ে কেউ যেতে রাজি হয় না। আমাদের সময় ছিল কম তাই দেরি না করে যাত্রা শুরু করে দিলাম। প্রথম প্রথম একটু ভয় করেছিল নৌকার ব্যালান্স নিয়ে। সরু নদী, সাথে তীব্র স্রোত আর বড় বড় পাথর মাঝে মাঝেই আমাদের শ্বাস আটকে দিত। মনে হতো এই বুঝি পাথরে ধাক্কা খেয়ে নৌকা চৌচির হয়ে গেল। পানি ছিল খুবই কম। কোথাও কোথাও তো মাত্র এক ফুট। আর পানির নিচে অবশ্যই পাথর ছিল, কোথাও মাটি দেখিনি। কোথাও কোথাও পাথর দিয়ে নৌকার পথটা অনেক সরু ছিল, যার কারণে স্রোতও ছিল অনেক তীব্র। মাঝিগুলো অনেক অভিজ্ঞ ছিল, তাই অনেকবার ডুবতে ডুবতেও বেঁচে গিয়েছিলাম। ওদের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম, বর্ষা মৌসুমে যখন পানি বেশি থাকে তখন যাওয়া যায়না তীব্র স্রোত আর পাথর না দেখা যাওয়ার কারণে।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। আমাদের ভরসা ছিল টর্চলাইট। দীর্ঘ আড়াই ঘন্টার যাত্রায় আমরা শুধু একবার থেমেছিলাম চা খাবার জন্য আর বিশ্রাম নেবার জন্য। মাঝে মাঝে নৌকা থেকে নেমে হাঁটতে হয়েছিল পানি কম থাকার কারণে।

দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রা শেষে আমরা যখন রিমাক্রি বাজারে পৌঁছালাম ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আমরা সবাই কাহিল। মাঝি আমাদেরকে বলল, রিমাক্রি বাজারে অনেক কটেজ পাওয়া যাবে থাকার জন্য। ওরাও এখন পর্যটক সামলাতে অভ্যস্ত। যে কটেজে উঠলাম সেখানেই খাবার ব্যবস্থা হলো রাতে। জুমের চালের ভাত, বন্য মুরগী আর মিষ্টি কুমড়োর একটা সবজি। আমাদের কাছে যার প্রত্যেকটিই ছিল অমৃতের মতো। পেট পুরে খাবার পর বিল আসলো একশত টাকা করে প্রতিজন। আমাদের কাছে অনেক সস্তা মনে হয়েছিল। তবে ভুলেও ওদিকে যাবার পর মুরগী ছাড়া অন্য কিছু খাবেন না। নয়ত শূকরের মাংস খেতে হবে গরু মনে করে।

রাতে আমাদের থাকার জন্য বিছানা, বালিশ আর কম্বল দেয়া হয়েছিল। তবে বুঝতে পারিনি সেখানে শীত এত তীব্র হবে। সারারাত আমরা শীতে কেঁপেছি, ঘুমাতে পারিনি।

সকালে উঠে নাস্তা করে আমরা একটা গাইড ঠিক করেছিলাম ছয়শত টাকা দিয়ে। গাইড বিজিবি কর্তৃক নির্ধারিত আর গাইড ছাড়া আপনি যেতেও পারবেন না। গাইডের টাকা পরিশোধ করে আমরা ছয়জন রওনা হয়ে গেলাম। গাইডের কথা মতো আমরা ড্রেস পরিবর্তন করে থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট পরে নিলাম ও ব্যাগে করে খাবার পানি ও গোসলের কাপড় নিলাম।

যাত্রা ছিল পুরোটাই হাঁটা পথ। কখনো টিলা, কখনো জঙ্গল, কখনো নদীর পাড় ধরে,

কখনো বা নদীর এপার থেকে ওপার হয়ে হাঁটতে হচ্ছিল। কখনো হাঁটু পানি, কখনোবা কোমর পানি দিয়ে হাঁটতে হয়েছিল। পানির নিচে মাটি ছিল না। শ্যাওলাঢাকা পাথর ছিল। এত পিচ্ছিল পাথর যে আমাদেরকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে হাঁটতে হয়েছিল। বোতলের পানি শেষ হবার পর পাথরের গর্তে জমা হওয়া পানি ছিল আমাদের ভরসা।

যাত্রাপথের সৌন্দর্য আর আমি বর্ণনা করলাম না। শুধু এটুকু বলতে চাই, যাত্রাপথের আড়াই ঘন্টা যে কখন কেটে গেল তা টেরই পাইনি। যাত্রা শেষে যখন নাফাখুম ঝর্নার সামনে আসলাম তখন আমাদের ক্লান্তি বলতে কিছু রইল না। সমান্তরাল একটা পথ বেয়ে গড়িয়ে আসা পানি নিচে পড়ছে, মোটামুটি পঞ্চাশ ফুট নিচে। যেখানে পানি পড়ছে সেখানে ছোট একটা লেকের মতো হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা সেখানে নামার কোন উপায় ছিল না। চারদিকে পাথর ঘেরা। লেকের পানির উপরিভাগ থেকে ভূমি পর্যন্ত পাথর প্রাকৃতিকভাবেই তাক তাক করে বিছানো আছে, তবে এত পিচ্ছিল যে নামার সাহস পাইনি। পাথর গড়িয়ে পানির যে স্রোত আসছিল, হাজার বছরের ব্যবধানে তা সরু নালার মতো হয়েছিল। দেড় ঘন্টা সেখানেই আমরা পানিতে ভিজলাম।

এবার ফেরার পালা। আবার সেই হাঁটাপথ, তারপর রিমাক্রি বাজার তারপর নৌকা দিয়ে থানচি থানা। রাতটা এবার আমরা থানচি থানায় এক উপজাতীর বাসায় কাটালাম। রাতের খাবার খেলাম হোটেলে। সকালবেলা বাসে করে বান্দরবান ফিরলাম। বাসের টিকেট পেলাম সন্ধ্যায়। হাতে ছিল ৪ ঘন্টার মতো সময়। একটা গাড়ি ভাড়া করে আমরা চলে গেলাম আশপাশের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে। বিশেষ করে স্বর্ণমন্দির ও নীলাচলের কথা মনে থাকবে অনেক দিন।

পুণরায় যখন বাসে ঢাকার ফিরতি পথ ধরি, অনেক ক্লান্ত ছিলাম তখন। কিন্তু চোখে তখনো ভাসছিল গত তিন দিনের সৌন্দর্যমন্ডিত বান্দরবানের শংখ অববাহিকার থরে থরে সাজানো সৌন্দর্য। বারবার মনে হচ্ছিল আবারও ফিরে আসতে হবে বান্দরবানে- আরো অনেক বেশি সময় নিয়ে।

আয় ও শিশুশ্রম

এ এইচ এম সামিউল বাশার রাজা
সিনিয়র অফিসার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

মিরপুর-১২ টু মিরপুর-১ ছেড়ে যাওয়া লেগুনা বা হিউম্যান হলার নামে পরিচিত যানবাহনে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ আসা-যাওয়া করে। এই যানগুলোতে লেখাপড়া করে মানসিক/ মনুষ্যত্ব বিস্তার করতে না পারা কিছু শিশু বা বালক কাজ করে যাচ্ছে ভাড়া উত্তোলনকার্যে। এমন একজনের সাথে কথা বললাম, যে ভাড়া উত্তোলনে কর্মরত ৮ বছরের বালক। সে প্রত্যেক দিন ৩০০/ ৪০০ টাকা আয় করে।

বালকটিকে দেখে ঈর্ষা জাগল মনের চিলেকোঠায়। আমরা যারা লেখাপড়া করে জজ-ব্যারিস্টার হচ্ছি, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সিস্টেমে পড়ে ২৭ বৎসরের আগে লেখাপড়া শেষ করতে পারছি না। বালকটির সাথে তুলনা করতে গেলে বৎসরে গড়ে ৪৮,০০০ টাকা হলে ১৯ বৎসরে ৯,১২,০০০ টাকা খরচ করেছি লেখাপড়ার জন্য। মনে রাখা ভালো এটা শুধুই খরচ, বিনিয়োগ বললে ভুল হবে। পরবর্তী হিসেব শুনলে হয়তো মস্তিষ্ক বিগড়ানোতে ভুগতে পারেন। পুরোপুরি বালক না হয়ে ওঠা শিশুটি ৪০০ টাকা করে আগামী ১৯ বৎসরে ১৩,৬৮,০০০ টাকা আয় করবে। লেখাপড়ার জন্য তার কোনো খরচ নাই। বাকি হিসেবটা আপনাদের জন্য রেখে দিলাম। যদিও বালকটিকে সংসারের ঘানি টানতে হচ্ছে অতি দরিদ্রতার জন্য। লেখাপড়া না করা বালকটির শিশুশ্রম আইনের দৃষ্টিতে বৈধ না। ভেবে দেখুন, শিশুটির আয় দিয়ে দুইটা ছেলের লেখাপড়া করা যাবে অনায়াসে। আট বৎসরের বাচ্চার থেকে যে পিতা-মাতা এত সুবিধা পায়, সাথে কাঁচা টাকার গন্ধ, সে কি লেখাপড়ার বিশাল খরচ সামলে কখনো ছেলেকে লেখাপড়া করিয়ে খরচ বাড়াবে, যেখানে সংসার চলাটাই দায়?

নীল আকাশে সাদা ঘুড়ি

জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা
ওয়েলফেয়ার অফিসার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

ক'দিন ধরে প্রচণ্ড শীত। যদিও ঢাকা শহরে এতটা শীতের দাপট বোঝা যায় না। তারপরও মাঝে মাঝে শৈত্যপ্রবাহ খেয়াল করা যায়। এখন এমনি একটা সময়। সকালে বিছানা ছাড়তে ভীষণ আলসেমি লাগে। কিন্তু ঐ যে কর্মব্যস্ততা- জীবনকে টেনে হিঁচড়ে তুলে নেয়, আর শুধু মনে হয় কবে শুক্রবার আসবে, অলস সকালকে আঁকড়ে ধরে ঘুমাব। টানা ছয় দিন প্রতীক্ষার পর প্রত্যাশিত দিনটি আসে। ভাবি, মজা করে ঘুমাব, কিন্তু ঠিক উল্টোটা ঘটে। খুব সকালে ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখি, আমার ছোট ফুটফুটে মেয়েটি আমার গলা জড়িয়ে হাসছে। আমি অবাক হয়ে ওকে বলি- এত সকালে তুমি উঠে গেলে কেন বাবা? ঘুমাও। সে আহ্লাদিকণ্ঠে বলে- আজ তোমার ছুটির দিন না! আমি ঘুমাব কেন? তোমার সাথে মজা করব না! তারপর আর কি ঘুম চোখে থাকার স্পর্ধা রাখে? ঘুম উধাও। অতঃপর ওর সাথে খুনসুটি, ওর যা অভ্যাস-বিভিন্ন প্রশ্ন করা আর আমার কাছ থেকে উত্তর আদায় করা। দিনের বেলা সূর্য ওঠে কেন? রংধনুর এত রং কোত্থেকে আসে- ইত্যাদি সব নানান প্রশ্নের ঝুড়ি- যার উত্তর দিতে আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত হই। হব না কেন, সপ্তাহে একটা মাত্র ছুটির দিন। ঘর-সংসার সামলাব নাকি ওর প্রশ্নের উত্তর দিব। এই বিরক্তি আবার ওর কাছে প্রকাশের কোনো উপায় নেই, তাতে ওর আবার অভিমান হয়। এভাবে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মধ্যেও আমাকে বলে- মা, তুমি গান শুনবে না? ছুটির দিন চ্যানেল আই এর গানে গানে সকাল শুরু গানের অনুষ্ঠানটি দেখি, বাদ দেই না। আমার মেয়ে মনে হয় আমার এ অভ্যাসের কথাটা বুঝে গেছে। হয়তো তাই আমায় মনে করিয়ে দেয়। আমিও আর লোভ সামলাতে না পেরে দ্রুত রিমোট হাতে টিভি চালু করি। ভেসে আসে-

মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই।
সাগর বলে রইনু চুপে আমিতো আর নাই...

অসাধারণ। মেঘ-রাত-সাগর- তাদের অনুভূতির এমন প্রকাশ! গানটা শেষ হতে না হতেই বিরতি, মিডিয়ার যা অভ্যাস। আমরাও বিজ্ঞাপন বিরতি পেলে অন্য চ্যানেলে ছোটাছুটি করি।

বিভিন্ন চ্যানেলে ঘোরাঘুরি করছি। হঠাৎ থমকে যাই, স্ক্রলবারে লেখা- রংপুরে পেট্রোল বোমায় শিশুসহ পাঁচজনের মৃত্যু, অনেকে হাসপাতালে ভর্তি, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। নিরপরাধ মানুষেরা রাজনীতির নির্মম বলি! একরাশ ঘৃণায় মন তেতো হয়ে যায়। চ্যানেল বদল করি। হঠাৎ আমার মেয়ে বলে- আম্মু ও আম্মু আমি কার্টুন দেখব। আমি চ্যানেল ঘুরাই। কার্টুন নেটওয়ার্কে টম এন্ড জেরি পেয়ে মেয়েতো ভীষণ খুশি। সে আমাকে বারবার তার কার্টুনের দিকে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে বর্ণনা দিয়ে বলছে- মা দেখো, টম কীভাবে জেরিকে ধরছে আর জেরি কীভাবে পালাচ্ছে এবং টমকে ধরার বুদ্ধি করছে। ওর মন খুশি রাখার জন্য হু হ্যা করছি বটে, কিন্তু মনের ভিতরে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলপাড় করছে। আসলে আমাদের দেশটাকে নিয়েও টম এন্ড জেরি খেলা চলছে। অথচ এ দেশকে আমরা আমাদের পরিবারের মতো সুন্দরভাবে সাজাতে পারি।

হঠাৎ আমার মুঠোফোনে একটা অপরিচিত নাম্বারের ফোন বেজে ওঠল। আমি হ্যালো বলতেই ওপাশ হতে- ম্যাডাম, আমি নুর নাহার। কেমন আছেন? আমি বললাম- ভালো আছি কিন্তু এত সকালে তুমি? কোনো সমস্যা? না ম্যাডাম, সমস্যা না। সমস্যা ছাড়া কি ফোন দিতে পারি না, আপনারাইতো আমাগোর সব, আপনি ছাড়া কি আর আইজকা এত দামি খাট চোখে দ্যাখতাম! তাছাড়া গত দুই দিন আমাগোর ফ্লোরে আপনাকে দেখি নাইতো, ভাবলাম অসুখ হইল নাকি? কেমন আছেন- তাই ফোন করা। ও আচ্ছা তাই বলো, আমিতো ভাবছি কোনো সমস্যা হলো নাকি। না না আমি ঠিক আছি। সুস্থ আছি। তোমার খবর কী বলো?

নুর নাহার আমার কলিগ। একজন গার্মেন্টস শ্রমিক। তার জীবনের গল্প কষ্টের এবং সংগ্রামের। কারখানায় কাজ করে চলছে সংসার। গার্মেন্টসগুলো না থাকলে নুর নাহারের মতো আরো অনেকের জীবন উইপোকার আহার হতো। এখন গার্মেন্টস কারখানাগুলো তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ব্যাবিলন নুর নাহারকে ঘুমানোর জন্য একটা খাট দিয়েছে- তারই কথা বলছিল নুর নাহার।

একজন কল্যাণ কর্মকর্তা (ওয়েলফেয়ার অফিসার) হিসেবে শ্রমিকদের ভালো-মন্দ দেখা, ওদের অভিযোগ নিষ্পত্তি, অধিকার নিশ্চিত করা, তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতাবোধ তৈরি করা, মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা- ইত্যাদি কাজগুলো আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। প্রতিদিনের এ কাজগুলোকে আমি ভালোবাসি। বেশি ভালো লাগে যখন কোনো শ্রমিকের সমস্যার কথা শুনে তার পাশে দাঁড়াতে চাই আর ব্যাবিলন সেখানে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে যায়।

শীতার্ত মানুষের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ, টর্নেডো আক্রান্তদের মানবিক সহায়তা, মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং অন্যান্য পারিবারিক সংকটে

সহায়তাদানসহ ইত্যাদি সিএসআর কার্যক্রমের সাথে ব্যাবিলন পরিবারে যুক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একটি কর্মসূচি। শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। আমরা যারা ওয়েলফেয়ার অফিসার রয়েছি, তারা ফ্লোরে কর্মরত অধিকতর অসহায় শ্রমিকদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। তাদের আর্থিক প্রয়োজনীয় বিষয়টিও বাদ যায় না। সরেজমিন যাচাই করে এ সকল শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনভেদে কারো জন্য খাট, কারো জন্য শেলফ/ র‍্যাক, কারো জন্য গরু/ গাভি কিংবা ছাগলের সুপারিশ করা হয়। কর্তৃপক্ষ চাহিদা যাচাই করেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শ্রমিকদের ঘুমানোর জন্য খাটের ব্যবস্থা হয়। কারো জন্য টেলিভিশন এবং কারো জন্য গাভির ব্যবস্থা হয়।

নুর নাহার হলো তাদেরই মধ্যে একজন অসহায়- যে মাটিতে ঘুমাতো। ব্যাবিলন তাকে একটি খাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেই খুশিতে আপ্লুত নুর নাহার আমাকে ফোনটা করেছিল। ওর সরল ভাবনায় ও ভেবেছে খাটখানা মনে হয় আমার জন্যই পেয়েছে। আমি বা আমরা এখানে মাত্র মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছি। এর জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই ব্যাবিলনকে। এই উদ্যোগের কল্যাণেই জানতে পেরেছি শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই কী দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। কী অল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, থাকতে পারে ওরা! কত বিচিত্র ওদের গল্প!

টুম্পার আহত পাখি

রাবেয়া খাতুন
অফিসার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

যাইসনা টুম্পা যাইসনা, তোর মায় আইসা পড়ব। তোরে কিন্তু মারব। কে কার কথা শোনে, পাখির গানের সুর কানে এসেছে, সে আর ঘরে থাকবে না। বই খাতা ফেলে রেখে পাশের বাসায় দে ছুট। সেখানে শুরু হয়েছে স্টার জলসায় বোঝে না সে বোঝে না সিরিয়াল। এই নাটকে নায়িকার নাম পাখি। তাকে টুম্পার ভীষণ পছন্দ। মা রেশমা, দাদির আদরে সাত বছরের টুম্পা আচার-

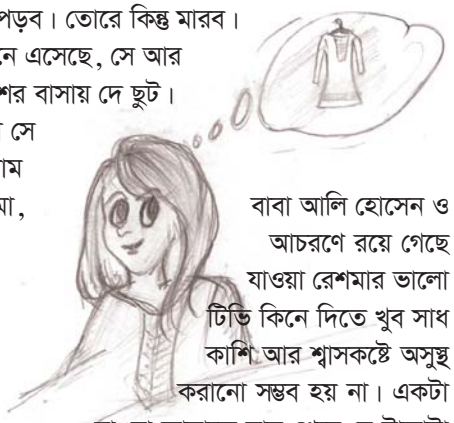

আরো ছোট। অন্যের ঘরে টিভি দেখতে লাগে না। আদরের মেয়েটাকে একটা জাগে। কিন্তু অভাবের সংসার। হুপিং স্বামীকে দিয়ে বেশি কিছু স্কুলভ্যানে চারটি বাচ্চা নিয়ে বাবা আলি হোসেন ও আচরণে রয়ে গেছে যাওয়া রেশমার ভালো টিভি কিনে দিতে খুব সাধ কাশি আর শ্বাসকষ্টে অসুস্থ করানো সম্ভব হয় না। একটা যাওয়া আসাতে মাস শেষে যে টাকাটা আসে তা বাসা ভাড়াতেই চলে যায়। গার্মেন্টসে চাকুরির সর্বনিম্ন বেতন দিয়ে বাড়তি চাহিদা পূরণ তো দূরের কথা, চার সদস্যের তিনবেলা খাবার জোটাতেই রেশমার বড্ড হিমশিম খেতে হয়। কিন্তু টুম্পা তা বুঝতে চায় না। ভিনদেশি সিরিয়াল দেখতে দেখতে তার দৃষ্টি থেমে গেছে ঐ উচ্চাভিলাসী মানুষগুলির দামি গহনা আর বাহারি পোশাকের মধ্যে। তার পছন্দের নায়িকা পাখির ড্রেসের মতো তারও ড্রেস থাকতে হবে। তাইতো রেশমা বাসায় ফিরতেই পাখি ড্রেস- পাখি ড্রেস বায়না করে মাকে পাগল করে ফেলে। মা পাগল হলেও বাবার মন এতটুকু নরম হয় না। আর স্বামী না চাইলে কোনো ইচ্ছাপূরণ করা রেশমার সাধ্য নাই। কারণ চাকুরিজীবী স্ত্রীদের টাকার উপর বেতন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে স্বামীদের হস্তক্ষেপ। আর রেশমার মতো মেয়েরা আল্লাহর পরেই স্থান দিয়েছে স্বামীকে। তারা জানে স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত। তাকে কষ্ট দেওয়া মানে বেহেশত থেকে বঞ্চিত হওয়া। তাইতো শেষ কয়েনটা পর্যন্ত স্বামীর হাতে তুলে দেয় রেশমা। কিছু ব্যতিক্রমী স্ত্রী আছে, যারা চায় নিজের টাকা নিজে খরচ করতে। আর অমনি সেখানে পড়ে বাঘের মতো থাবা। এমনি হিংস্র থাবা 'হয় ছাড় না হয় মর।' স্ত্রী জীবনের ভয়ে টাকাটাই ছেড়ে দেয়। পৃথিবীতে যা কিছু মন্দ তার পরিপূর্ণতায় ধ্বংসের রূপ নেয়। এ ধরনের স্বামীরা যেহেতু ধ্বংস কিংবা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, সেহেতু মন্দের পূর্ণতা এখনো হয়নি। মনে হয় কিছু স্বামী আজও ভালো আছে। তবে আলি হোসেন ভালোর কাতারে পড়ে না। সে ঠিকই মাস শেষে রেশমার সব টাকা নিয়ে যায়।

বাবা যতই কঠিন হোক, ঈদের সময় একটা নতুন জামা না দিয়ে পারবে না। তখনই পাখি ড্রেস কিনে দেয়া হবে, মা মেয়েকে এই সান্ত্বনা দেয়। টুম্পা বন্ধুদের সঙ্গে পাখি ড্রেসের গল্প আর নিজেকে প্রিয় নায়িকা পাখি কল্পনা করে দিন পার করতে থাকে। একটা সময় অপেক্ষার

দিন ঘনিয়ে আসে। বাবা-মা মার্কেটে যায় নতুন জামা কেনার জন্য। এবারের ঈদে বাজারে অসংখ্য পাখি ড্রেসের সমাহার। তার মধ্য থেকে টুম্পার পছন্দের ড্রেসটি সে খুঁজে পায়। আনন্দে লাফাতে লাফাতে বলে, আমি এইডা নিমু। দোকানদারের কাছে দাম জিজ্ঞেস করতেই আলি হোসেন মাথায় হাত দেয়। জামাটার দাম দুই হাজার টাকা। সে মেয়ের হাত ধরে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। এরপর যতগুলি জামা তাকে দেখানো হয় ঐ জামা থেকে তার চোখ নড়েনি এতটুকু। একটা সময় আলি হোসেন জামা না কিনেই রাগ করে বাসায় ফিরে আসে।

জানুয়ারি মাস। বেতন হাতে পাবার আগেই কোনোভাবে রেশমা জেনে ফেলে তার পাঁচশ টাকা বেতন বেড়েছে। সেতো অনেক খুশি। তবে এবার সে কঠিন হবে, এই পাঁচশ টাকার কথা স্বামীকে জানাবে না। মনে মনে হিসাব করল, প্রতি মাসে পাঁচশ টাকা জমালে এক বছরে ছয় হাজার টাকা। তারপর ভালো কাজ করলে আগামী বছর যদি আবার কিছু বেতন বাড়ে, তাহলে আরো বেশি জমাতে পারবে। এভাবে পাঁচ বছরে অনেক টাকা হবে। ভেবেই হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় হয়। খুশিতে যেন আত্মহারা।

বাঙালি নারী স্বামীকেই একমাত্র পরম বন্ধু ভাবে। স্বামীরা যত পাষণ্ডই হোক, তাদের প্রতি স্ত্রীদের হৃদয়ে উপচে পড়া দরদ। তাই এত খুশির খবরটা তার কাছে গোপন রাখতে কিছুতেই পারছে না। বলা না বলার দ্বিধাদ্বন্দ্বে ঘুমও আসছে না। এপাশ ওপাশ করতে করতে এক সময় সব গোপনীয়তার মুখোশ খুলেই ফেলে। অভাবের সংসারে বাড়তি এক টাকাকেও মনে হয় কোটি টাকার স্বর্গীয় সুধা। আলি হোসেন শুনে খুব খুশি হয়। বাড়তি টাকা না দেয়ার প্রস্তাবে কোনো দ্বিমত পোষণ করে না। এতে রেশমা আরো বেশি আবেগি হয়ে বলে, এক বছরের টাকা দিয়া আমার টুম্পারে কানের রিং বানাইয়া দিমু। অমনি মোচড় দিয়ে টুম্পা বলে উঠে, লাগবে না রিং, আমার পাখি ড্রেস কিনা দিবা। কিরে তুই ঘুমাইস নাই?- তিনজনেই অট্টহাসিতে ঘরখানা মুখরিত করে তুলে। বাবা-মা হাসতে হাসতেই বলে, হ মা, এইবার দিমু।

ঘুম যখন ধনীদের পিছনে ছুটোছুটি করে ব্যর্থতায় আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে, তখনই গরিবের সামান্য পাওয়ার আনন্দের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে। তারা যখন বিছানায় গিয়ে চোখ বন্ধ করে, ঘুম তখন তাদের দু'টি চোখের পাতায় আশ্রয় খুঁজে নেয়। সমস্ত ক্লান্তি দূর করে ঘুম তাদের এনে দেয় একরাশ প্রশান্তি। কথায় বলে ঘুমের শান্তি গরিবের চোখে। সকালে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ না পেলে হয়তো জাগতেই পারত না রেশমা। চোখ মুছতে মুছতে দরজা খুলে রেশমা বলে, এত সকালে কি মনে করে কইরা খালাম্মা? খালাম্মা বলে, সকালে ছাড়া কি তোমাকে পাওয়া যায়? কত রাতে বাসায় ফেরো, তখন আমি আসতে পারি না। শোনো রেশমা, এ মাস থেকে তোমাদের রুম ভাড়া পাঁচশ টাকা বাড়ানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে রেশমার সমস্ত আলস্য দৌড়ে পালায়। শিরা-উপশিরা শক্ত হয়ে রক্ত চলাচল করে ঊর্ধ্বগতিতে। তার মনে হয় এক্ষুণি বাড়িওয়ালার গলা টিপে ধরে। কিন্তু কী করে সম্ভব? বাড়িওয়ালা তো আগেই ভাড়াটেদের গলা চিপে রেখেছে। কিছু বললেই বলে বাসা ছেড়ে দাও। সমস্যার কথা

জানালে বলে, ভালো লাগলে থাক না লাগলে চলে যাও। রেশমা এ কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই রাগান্বিত স্বরে বলে ফেলে, এই ঘরে পাঁচশ টাকা বাড়ালে থাকমু না, চইল্লা যামু। বাড়িওয়ালা বলে, ঠিক আছে। সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। পরের দিন থেকে রেশমা বাসা দেখতে শুরু করে। আল্লাহর সৃষ্টিতে বৈষম্য আছে কিন্তু বাড়িওয়ালাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই। সবাই সমান। রেশমা কোথাও কম ভাড়ায় বাসা খুঁজে পায় না। নিরাশ হয়ে বাড়িওয়ালার কাছে আবার ফিরে যায়। বিনয়ের সাথে বলে, খালাম্মা দু'শ টাকা কম নেওয়া যায় না? বাড়িওয়ালা শিক্ষিত মেয়ে। রেশমার মতো সরল মেয়েকে বোঝানো কঠিন কিছু নয়। সে নরম গলায় বলে, দ্যাখো রেশমা বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাসের দাম বেড়েছে, বাজারেও সবকিছুর দাম বাড়ছে ঊর্ধ্বগতিতে। তার কথায় মনে হয় রেশমার বোধ হয় বাজার করে খেতে হয় না। কোনো বাক-বিতর্কে না যেয়ে বাসায় ফিরে আসে রেশমা।

ইদানিং রেশমার মনটা খুব খারাপ থাকে। এখন আর টুম্পার বায়নাকে সহ্য হয় না বরং সিরিয়াল দেখে দেখে এ ধরনের বায়না করা শিখেছে বলে তাকে টিভি দেখা বন্ধ করে দেয়। শাশুড়িকে কঠিনভাবে নির্দেশ দেয়, টুম্পা যেন আর টিভির ঘরে না যায়। বিদেশি চ্যানেলগুলি এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, যার চাপে দেশি চ্যানেলগুলি একেবারে কোণঠাসা হয়ে আছে। ছেলে-বুড়ো-নারী-পুরুষ সব বয়সের মানুষ ঝুঁকে পড়েছে বিদেশি চ্যানেলগুলির প্রতি। ঠিক যেন হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার সুরে যে যেখানে থাকুক না কেন তার পছন্দের সিরিয়ালটি শুরু হলেই ছুটে যায় টিভির সামনে। আর টুম্পাতো বাচ্চা মেয়ে, সে কি আর বাধা-নিষেধ মানতে চায়। তার পছন্দের সিরিয়ালটি সে ঠিকই চুরি করে দেখে নেয়। রেশমা বুঝতে পেরে একদিন বেদম পিটুনি দেয়। কিন্তু কষ্ট পায় নিজেই বেশি। কাঁদতে কাঁদতে অফিসে যায় রেশমা।

মেঘের কোলে রোদ হাসে- এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এতদিনের বিষন্ন মনটা সতেজতা ফিরে পায় আরেকটা খুশির খবরে। ওয়েলফেয়ার অফিসার সবাইকে জানাচ্ছিলেন, এ মাসেই ছুটির টাকা দেয়া হবে। এ ছুটিটা হলো বাৎসরিক, যা প্রত্যেক কর্মীর আঠার দিনের কাজের জন্য একদিন পাওয়া যায়। যদি সে ভোগ না করে তাহলে বছর শেষে কোম্পানি তাকে বেতনের সমপরিমান টাকা দিয়ে দেয়। রেশমার মেঘাচ্ছন্ন মুখখানায় রোদের ঝিলিক। এ টাকার কথা কাউকে সে এবার জানাতে চায় না। এখানে বাড়িওয়ালারও কোনো হস্তক্ষেপ নেই। সুতরাং এই টাকা দিয়ে কিনবে টুম্পার পাখি ড্রেস। মনের খুশিটা সে প্রকাশ করতেও চায় না। স্বাভাবিকভাবেই বাসায় ফেরে। ঘরে ঢুকে দেখে মেয়েটা তার শুয়ে আছে। আদর আর স্নেহভরা হাতটি মাথায় রাখতেই চমকে ওঠে। মায়ের পিটুনি আর পছন্দের সিরিয়াল না দেখতে পাওয়ার মানসিক কষ্টে জ্বর এসে পড়েছে। সারারাত মেয়ের চিন্তায় ঘুম আসে না তার। একমাত্র মায়েরাই সন্তানের সামান্য অসুস্থতায়ও বড় বড় দুশ্চিন্তা করে বসে। একটু সাধারণ জ্বরকেও টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ডেঙ্গু এমনকি মৃত্যুকেও কল্পনা করে ফেলে। ভাবতেই রেশমার গা শিউরে ওঠে। কীভাবে তার মেয়েটা সুস্থ হবে? জামা কিনে দিলে কি ভালো হবে? সারা জীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে একমাত্র মেয়ের একটা

আবদার পূরণ করতে পারবে না? এটা হতে পারে না। নানা প্রশ্নের ভীড়ে রক্তে তার বিদ্রোহ সঞ্চারণ হয়। সে এবার কারো কথা শুনবে না। কালই মেয়ের জামা কিনে আনবে।

পরের দিন অফিসে গিয়ে তার সুপারভাইজারের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা ধার নেয়। একটু আগেভাগে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মার্কেটের উদ্দেশে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, কোনো গাড়ি পাচ্ছে না, কারণ সেদিন ছিল বিরোধীদলের ডাকা হরতাল। আর সময় নষ্ট না করে হাঁটা শুরু করে রেশমা। ঘন্টাখানেকের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেয়ে যায় সেই কাঙ্খিত ড্রেস। সে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বাসার উদ্দেশে ছুট দেয়। মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। রাস্তায় এসেই গাড়ি পেয়ে যায়। অমনি দৌড়ে উঠে পড়ে। গাড়িতে বসে রেশমা ভাবছে, জামাটা পেয়ে টুম্পা অনেক খুশি হবে। হয়তো জ্বরও ভালো হয়ে যাবে। আর কখনো তাকে টিভি দেখতে নিষেধ করবে না। কিছুদিন যাক, এবার সে মেয়েকে একটা টিভি কিনে দিবে। আজ নিজেকে বড্ড আত্মনির্ভরশীল মনে হচ্ছে। সে পরনির্ভরশীল না হয়ে ইচ্ছা করলেই অনেক কিছু করতে পারবে। ভাবতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস।

হরতালের দিন রাস্তায় গাড়ি খুব কম থাকে। ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি চলছে খুব দ্রুতই। মাঝপথে এক যাত্রীকে নামাতে গাড়িটি গতি ধীর করে। হঠাৎ বাইরে থেকে দুশমনেরা ছুড়ে মারে একটা পেট্রোল বোমা। আগুন আগুন চিৎকার করে জানালা দিয়ে রেশমা ছিটকে পড়ে রাস্তার পাশে। পথচারীদের সাহায্যের আগেই পুড়ে যায় তার শরীরের ৭০ শতাংশ। অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রেশমাকে। ব্যাগের মধ্যে খুঁজে পাওয়া আইডি কার্ডে অফিসের নম্বরে ফোন করা হয়। অফিস মাধ্যমে বাসায় খবর পৌঁছাতেই আলি হোসেন পরিবারসহ ছুটে যান সেখানে। ততক্ষণে রেশমাকে নেয়া হয়েছে ইমার্জেন্সিতে। এক হৃদয়বান পথচারী অর্ধপোড়া ব্যাগ দু'টি রেশমার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। কাগজের ব্যাগটিতে টুম্পা লাল কিছু দেখতে পায়। হাতে নিয়ে খুলতেই দেখে সেই পাখি ড্রেস। জামাটাও পুড়ে গেছে ত্রিশ শতাংশ। আহত পাখিটির ডানা দু'টি ধরে বুকের সাথে বিছিয়ে নেয় টুম্পা। দু'চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে তার পাখি। পোড়া জায়গাটাতে হাত দিয়ে বারবার পরিস্কার করছে। তা দেখে দাদি এসে আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে বলে, কাইন্দোনা বুজান ফের আইন্না দিব বাপে। টুম্পা রাগে দুঃখে জামাটা ছুড়ে ফেলে বলে, লাগব না, আমি মায়ের কাছে যামু। মেয়েটা মা-- আ-- আ-- বলে চিৎকার দিয়ে ছুটে যায় ইমার্জেন্সি বিভাগের দিকে।

আকাঙ্খা

মোঃ নুরুজ্জামান
প্যাকিং ম্যান, ফিনিশিং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

কতটা চাইলে তোমায় পাওয়া যাবে
কতটা কাঁদলে তুমি হাসবে।

কতটা দূরে গেলে তুমি কাছে আসবে
কতটা কষ্ট পেলে তুমি ভালোবাসবে।

কতটা নিশ্চুপ হলে তুমি সাড়া দিবে
কতটা নিঃশেষ হলে তুমি আমার হবে।

কতটা পর হলে তুমি আপন হবে
কতটা ভাঙলে তুমি সৃষ্টিতে মাতবে।

কতটা ভালোবাসলে তুমি আমার হবে
কতটা চাওয়া পূরণ করলে তুমি ধন্য হবে।

তারেই ভালোবাসি

মোঃ কবিরুল ইসলাম
প্রাক্তন ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

একটা মাটির পরী মনের গ্রহে
বন্দি করে রাখি,
ভালোবাসার ইশারাতে
ছলে বলে ডাকি।

লাল পরী- নীল পরী সে যে
হার মানাবে রূপে,
তারি প্রেমে জ্বলছে হৃদয়
পুড়ছি ধূপে ধূপে!

দেখতে ভীষণ, চাঁদ মাখা মুখ
মায়াবী তার হাসি,
হয়নি বলা হাতটি ধরে
তারেই ভালোবাসি।

মিষ্টি যে তার মুখের ভাষা
দৃষ্টি নজরকাড়া,
তার মায়ার টানে গেছি ফেসে
মন পড়েছে ধরা।

উদাস উদাস মন যে আমার
পোষ মানানো দায়,
বলিস সখি পাইলে তারে
মন শুধুই তারে চায়।

ভালোবাসি ভালোবাসি
মিছিল হৃদয় জুড়ে,
বৌ বানিয়ে আনব তারে
আমার ছোট্ট ঘরে।

আশার আলো ব্যাবিলন

মোঃ আবু ইনাম চৌধুরী
সুপারভাইজার, মেইন্টেনেন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

প্রদীপ হয়ে সৃষ্টি যার
দৃষ্টিভরা স্বপ্ন লহর।
করিয়াছ জয় বিশ্বকে আজ
দেখছে জগতবাসি,
সবাই মিলে তাইতো মোরা
বড়ই সুখে আছি।

হয়েছ মহান দিয়েছ ঠাই
করেছ মোদের ঋণী,
তাইতো মোরা সবাই মিলে
তোমার আদেশ মানি।

গর্বে মোদের বুক ভরে যায়
কেমনে তোমায় ভুলি,
হৃদয়ভরা শক্তি নিয়ে
সঠিকপথে চলি।
মনে আশার প্রদীপ জ্বেলে
দূর করো সব গ্লানি।

লড়ব মোরা এক হয়ে
গড়ব আলোকিত ব্যাবিলনকে।
কষ্টে যখন চলছে জীবন
থাকি তোমার পানে চেয়ে,
দুঃখ দিবে মুছে তুমি
আশার আলো হয়ে।

ভালোবাসি

জাহানারা আক্তার
জুনিয়র প্যাকার, ফিনিশিং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

আমি আলোকে ভালোবাসি
অন্ধকারকে নয়।
আমি তাজা ফুলকে ভালোবাসি
শুকনো ফুলকে নয়।

আমি নির্জনে বসে কাঁদতে ভালোবাসি
কাঁদাতে নয়।
আমি সবার মুখে হাসি ফোটাতে ভালোবাসি
ভাসাতে নয়।

আমি সত্যকে ভালোবাসি
মিথ্যাকে নয়।
আমি ব্যাবিলন আদর্শকে ভালোবাসি
অন্য কাউকে নয়।

কল্পলোকের গল্প

ইথার আক্তারুজ্জামান
জুনিয়র অফিসার, মার্কেটিং এন্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

আচ্ছা, তোমার কি সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে...
কড়েতে কড়ে বন্দি করে স্মৃত চকচকে নোনাবালির তীরে দু'জনে দাঁড়িয়ে,
কীভাবে সূর্যাস্তের হাওয়ায়, হাঁটুতে জোছনা নামাতাম!!

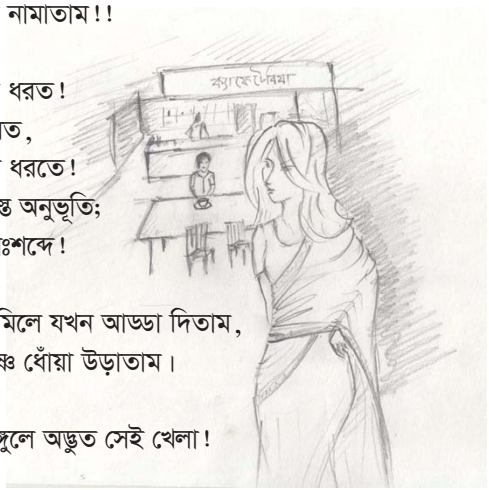

আঁধারগুলো যতই আমাদের কাছে আঁকড়ে ধরত!
সমুদ্রের গর্জনগুলো যতই ক্রমশ চেপে আসত,
তুমি ততই আমার কড়েগুলোকে শক্ত করে ধরতে!
হঠাৎ লেপটে দিতে শুভ্র হাতে তোমার সমস্ত অনুভূতি;
আমার বুকের ঠিক মধ্যখানে! অনেকটা নৈঃশব্দে!

শেষ বিকেলে ক্যাফেটেরিয়াতে সব বন্ধুরা মিলে যখন আড্ডা দিতাম,
মুগ্ধ হয়ে তোমার চোখেতে গরম চায়ের উষ্ণ ধোঁয়া উড়াতাম।
ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি জমা করে...
টেবিলের নিচে খেলতাম বুড়ো আঙ্গুলে আঙ্গুলে অদ্ভুত সেই খেলা!

একদিন তো ওদের কাছে প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিলাম,
অল্পের জন্য কোনোমতে, দু'জনে 'লাল পিপড়ার' কথা বলে রক্ষা পেলাম!

আচ্ছা! তুমি কি এখনো সেই নীল জামদানিটা পরো,
আরে, হ্যাঁ! সেই শাড়িটা! যেই শাড়িটা কেনার জন্য,
আমি নয় নয়টি মাস প্রাইভেট ফাঁকি দিয়ে টাকা জমিয়েছিলাম,
বিশ্বাস করো! আমার এতটুকুও কষ্ট হয়নি,
আমার কাছে মনে হয়েছে যে, সেদিন একটি যুদ্ধ জয় করেছিলাম!!

হঠাৎ! তুমি!
কেমন করে যেন, হারিয়ে গেলে... সাথে সাথে হারিয়ে গেল সকল স্বপ্ন

পানসে করে দিয়ে গেলে আমার সব অনুভূতিকে,
মজিদ মামার হোটেলের সিঙ্গারার দামে বিক্রি হয়ে গেল সব ইচ্ছেগুলো,
সমুদ্রের তীরের নোনা বালিগুলোকে আমার কাছে মনে হতে লাগল,
কখনো ধুলো কখনো বা স্তব্ধ ফেলে আসা স্মৃতির জ্বলন্ত মরীচিকা!!

জানি!
তুমি আর আসবে না!
আচমকা ছড়াবে না পেছন থেকে শিউলি কিংবা বকুল!
তবু তুমি বেঁচে রয়েছ আমাতে,
একটি কল্পলোকের গল্প হয়ে!!

সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ

মোঃ নুর তাপস
সিনিয়র অফিসার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

মাঠভরা পাকা ধান
দেখে জুড়ায় আমার প্রাণ।
বাতাসে দুলছে অঘ্রান
হৃদয়ে জাগে নতুন গান।
চাষির গানের মধুর সুর
মন ভেসে যায় অনেক দূর।
ধানে ধানে ভরা দেশ
সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ।

আকলিমাদের স্বপ্ন ভাঙার গল্প

উম্মে সালমা ডালিয়া
ম্যানেজার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

খুবই হত দরিদ্র ঘরে জন্ম আসমার। বাবা বাউল গান করে। সংসারের প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করে না। প্রায়ই গান গাইতে নিজের গ্রাম থেকে অনেক দূরে চলে যায়। বাড়িতে তার চার সন্তান ও স্ত্রী আছে। রয়েছে বৃদ্ধ বাবা-মা। কারো প্রতিই সে তেমন কোনো টান অনুভব করে না। আসমার বাবার নিজের কোনো জমিজমা নেই। শুধু বসতবাড়ির জন্য একটু জায়গা। আসমার মা আকলিমা এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে সংসার চালায় অতি কষ্টে। চার ভাইবোনের মধ্যে আসমাই বড়। তারপরে একটা ভাই এবং আরো দু'টো বোন। সবার ছোট বোনটা হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার বয়স তখন মাত্র ছয় মাস। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটে না যেখানে, সেখানে চিকিৎসার খরচ কোথায়? জ্বর এবং শ্বাসকষ্টে ভুগে বিনা চিকিৎসায় একদিন মেয়েটা মারা যায়। কোলের বাচ্চাটাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে আকলিমা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। একটু শোক কাটিয়ে আকলিমা গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দেয়ার পরিকল্পনা করে। পাশের বাড়ির অনেকেই ঢাকা শহরে কাজ করে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে। আকলিমাও তাই স্বপ্ন দেখে একটু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের।

একদিন আকলিমা সেই অদেখা সুখের খোঁজে স্বামী সন্তানদের নিয়ে শহরে পাড়ি জমায়। গ্রাম সম্পর্কীয় বোন জুলেখা গ্রাম থেকে কাজের লোক এনে শহরের বাসায় বাসায় কাজের জন্য সাপ্লাই দেয়। তারই সহায়তায় আকলিমা ঢাকায় আসে এবং এক বাসায় ছুটা কাজে লেগে যায়। বসবাসের জন্য বস্তিতে একটা ছোট্ট ঘরও জোগাড় করে দেয় জুলেখা। কাজের বাসাটা ভালোই পেয়ে যায় আকলিমা ভাগ্যক্রমে। এরপর সে আরো কয়েকটা বাসায় পার্টটাইম কাজ নেয়। এভাবে সংসারটাকে সচল রাখার জন্য প্রাণপন কাজ করে যায় আকলিমা। কিন্তু কিছুদিন পর নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে কাজের একটা বাসা ছেড়ে দিতে হয়। সংসারকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বড় মেয়ে আসমাকেও এক বাসায় লাগিয়ে দেয় কাজে। কিছুতেই কাজের বাসায় মন বসে না আসমার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে সারাক্ষণ কান্না করতে থাকে। আসমার জন্ম গরিব ঘরে হলেও ওর ছিল অনেক স্বপ্ন। কাজের বাসার বাড়িওয়ালার মেয়েটা যেভাবে চলাফেরা করে, যেভাবে সাজগোজ করে, সেভাবেই থাকতে ইচ্ছে করত তার। কিন্তু সেটাতো আর বাস্তবে সম্ভব না। এক বছর এ বাসায় কাজ করার পর

ঈদের সময় মায়ের কাছে চলে আসে আসমা। মাকে বলে ওকে আর কাজের বাসায় না পাঠাতে।

আকলিমা প্রথম এই শহরে এসে যে বাসায় কাজে ঢুকেছিল সে বাসার ছোট ছেলেটা বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী। ছেলেটার বউয়ের নাম নুপুর। নুপুর আকলিমার মেয়ে আসমাকে অনেক আদর করত। মফস্বলের মেয়ে নুপুর বেশ সুন্দরী ও শিক্ষিতা। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নুপুরকে এমন স্বামীর সংসার করতে হচ্ছে। নুপুর তার এইসব না বলা কষ্টের কথা ওর থেকে বয়সে অনেক ছোট আসমার সাথে শেয়ার করে মনটা হালকা করে। নুপুর খুব গাছ ভালোবাসে। অনেক গাছ তার টবে। নানান জাতের ফুলগাছসহ ক্যাকটাসের নানান প্রজাতি তার সংগ্রহে। এই গাছ আর আসমাই তার সঙ্গী। নুপুরের সাথে থাকতে থাকতে আসমা ভুলে যায় তার বর্তমান অবস্থা। সে সব সময় নিজেকে নুপুরের জায়গায় ভাবে। স্বপ্ন দেখে এরকম একটা পরিবারে বসবাস করবে সে। একসময় নুপুরের কথা বলা, পোশাক, পছন্দের খাবার, সখ সবই আসমার ভালো লাগত।

আসমারা যে বস্তিতে থাকে সেখানকার অনেক মেয়ে গার্মেন্টসে কাজ করে। ওরা মোটামুটি ভালোভাবেই চলতে পারে। আকলিমা তাই একদিন ওদের সাথে কথা বলে। আকলিমার একার আয়ে সংসার আর চলে না। ঐ মেয়েরা তাদের গার্মেন্টসের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে মাসের প্রথম তারিখে আসমাকে নিয়ে যায় তাদের অফিসে। অফিসের কর্তাব্যক্তিরা আসমাকে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে হেলপার পদে নিয়োগ দিয়ে দেয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আসমা তার কাজে দক্ষতার পাশাপাশি সুপারভাইজারসহ সহকর্মীদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলে। দক্ষতা দিয়ে অল্প দিনেই অপারেটর হয়ে যায়। সেই সাথে তার বেতনও প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। আসমা তার বেতনের পুরো টাকাটাই তার মাকে দিয়ে দেয়। আকলিমার সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। আকলিমা এবার তার ছেলেটাকে পড়ালেখা শেখানোর জন্য গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় তার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে। মনে অনেক আশা ছিল, আসমাসহ তিন ছেলেমেয়েকেই পড়ালেখা শিখাবে। কিন্তু সেটাতো আর হলো না। অভাবের কারণে আসমাকে অনেক আগেই রোজগার করতে নেমে পড়তে হয়েছে।

যাহোক, মা মেয়ের রোজগারে আকলিমাদের সংসারে অল্প অল্প করে সুখের বাতাস বইতে শুরু করে। এরই মাঝে একদিন আসমা অফিসে গিয়ে জানতে পারে তাদের অফিসের পিকনিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। যারা গান ও নাচ করতে পারে তারা সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আসমা তার বাবার গানের প্রতিভাটা পেয়েছিল। সে মোটামুটি গাইতে পারে। তাই সে নাম লেখায় অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য। অডিশনে খুব একটা ভালো করতে পারে না। যারা নির্বাচক ছিলেন তারা ওর গায়কি শুনে বুঝতে পারেন, ওর গলায় সুর আছে। দেখতে দেখতে অনুষ্ঠানের দিন ঘনিয়ে আসে। আসমার মধ্যে প্রচণ্ড ভয় আর দুশ্চিন্তা কাজ করতে থাকে, আসলেই সে ভালো করতে পারবে কি না, সবার এত চেষ্টা বিফলে যাবে কি

না। শেষ পর্যন্ত আসমা অনুষ্ঠানে বেশ ভালো করে। সবাই ওর গানের খুব প্রশংসা করে। অনুষ্ঠানে সে প্রথম পুরস্কার পায়। আসমা তার মাকেও নিয়ে এসেছিল তার অনুষ্ঠান দেখানোর জন্য। আকলিমাও অনেক খুশি মেয়ের এ সাফল্যে। আগে সে গান গাওয়া পছন্দ করত না। কিন্তু এখন তার ভালোই লাগে যে তার মেয়ে ভালো গান গায়।

এভাবে বেশ কয়েক বছর আকলিমাদের ভালোভাবেই কেটে যায়। আসমার অফিসের অধিকাংশ লোক এখন আসমাকে চেনে শিল্পী হিসেবে। ওর সাথে অনেকের সখ্যতা গড়ে ওঠে। অনেক ছেলেই ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আসমা তার সঙ্গী নির্বাচনে ভুল করে বসে। যে ছেলেটার সঙ্গে ওর সম্পর্ক তৈরি হয় সে ছেলেটা মোটেই ভালো না। এর আগেও সে অনেক মেয়ের সর্বনাশ করে এখানে এসেছে। ঐ ছেলের স্বভাবই মেয়েদের সাথে সম্পর্ক করা এবং একসময় তাদেরকে ফেলে পালিয়ে যাওয়া। যাহোক, আসমাকে তার সহকর্মীরা অনেক বুঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ও তাদের কথায় কান না দিয়ে ঐ ছেলেকেই বিয়ে করে ফেলে। আসমার স্বামী অকর্মণ্য। বছরে তিন মাস কাজ করলে ছয় মাস বসে থাকে। আসমাকে বিয়ে করে সে একেবারে কাজ ছেড়ে দেয়। বিয়ের পরপরই সে আসমাকে চাপ দিতে থাকে আলাদা থাকার জন্য। আসমার তখন দিশেহারা অবস্থা। একদিকে বাবা-মা-ভাই-বোন অন্যদিকে স্বামী। যদি সে আলাদা বাসা নেয় তাহলে তার মাকে সে কোনো সাহায্যই করতে পারবে না। আর আসমা যদি টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে আকলিমার আর এই শহরে থাকা সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত আসমা স্বামীর কথাই রাখে। আলাদা বাসা ভাড়া নেয়।

যে আশা নিয়ে আকলিমা সন্তানদের নিয়ে শহরে এসেছিল সে আশা আর পুরণ হয় না। মেয়ের সুখের কাছে নিজের সুখ বিসর্জন দিতে হয়। ফিরে যেতে হয় তাকে আগের কষ্টের ভুবনে। এভাবেই আকলিমাদের স্বপ্ন-ভঙ্গ হয় প্রতিনিয়ত...।

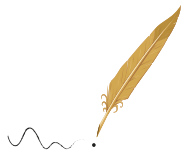

স্বপ্ন

মোঃ তানভীর হক সরকার
অফিসার, এইচআর এন্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

ঢাকার এক প্রখ্যাত হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান জাহাঙ্গীর সাহেবের মন আজ সকাল থেকেই প্রচণ্ড ভালো। একটু আগে তার সহকর্মী মেডিসিন বিভাগের আজিজ সাহেবের সাথে কথা হয়েছে। ছেলেটা এবারও মেডিক্যালে চান্স পায়নি। পাবে কীভাবে? গবেট একটা।
খরশব ভধঃযবৎ ষরশব ংড়হ- মনের আনন্দে তার মুখ দিয়ে ইংরেজি বেরিয়ে যায়।

আজিজ সাহেবের ছেলের ব্যর্থতা নিজের মেয়ের সাফল্যকে আরো বেশি মহত্ত্ব দান করে। গাইনী বিভাগের প্রধান রাকিব সাহেব তার দূরসম্পর্কের ভায়রা হয়। ফোন করে তাকে সুখবরটা জানালেন। আজিজ সাহেবের ছেলের খবরটাও বাদ গেল না আলাপচারিতায়- আজিজ সাহেবের ছেলেটা তো এবারও টিকল না। আমার এষামনিতো একবারেই টিকে গেল। শুধু শুধু আজিজ সাহেব ছেলেটার দুই বছর নষ্ট করে এতগুলো টাকা গচ্চা দিলেন। এষামনিকে তেমন কোচিং টোচিংয়ে দেইনি। বেসিকটা আসলে ভালো। আর সব উপরওয়ালার ইচ্ছা- গলায় আত্মতৃপ্তির সুর জাহাঙ্গীর সাহেবের। (ভেতরে ভাবেন অন্যকথা। তিন তিনটা কোচিংয়ে পেপার ফাইনাল, সাবজেক্ট ফাইনাল, মডেল টেস্ট আর বাসায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিতে তিনটা আলাদা টিচার। তিনটাই উগঈ'র। চান্স না পেয়ে যাবে কোথায়!)

ফোন ছেড়ে অন্দরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হাঁক ছাড়লেন- এষার মা, চল আজকে বাইরে খেতে যাই।
এষা ভেতর থেকে জবাব দেয়- বেশি বাড়াবাড়ি করো না তো বাবা। এখনোতো ওয়েটিং এ আছি।
তো কি হয়েছে মা। সিরিয়াল বেশি দূরে তো নেই। হয়েই যাবে।
১ম ওয়েটিংয়ের রেজাল্ট দিবে এক সপ্তাহ পর। তখন না হয় সেলিব্রেট করব।
সে এখন পর্যন্ত ফেসবুকে স্ট্যাটাসও দেয়নি।

জাহাঙ্গীর সাহেব নিজে ঢাকা মেডিক্যালের (উগঈ) ছাত্র ছিলেন, তাই তার স্বপ্ন ছিল মেয়েকেও উগঈ তে পড়াবে। যাইহোক, এখন নিচের সারির মেডিক্যাল পেলেই খুশি।
স্বপ্নটা পুরোপুরি না হোক, আংশিক তো পূরণ হচ্ছে। মেডিক্যাল বলে কথা।

কলিংবেলের শব্দ শুনে জাহাঙ্গীর সাহেব দরজার দিকে এগিয়ে যান। দরজা খুলে দেখেন ড্রাইভার রহমত দাঁড়িয়ে।
আজকে আবার ছুটি টুটি চেয়ে বসো না। রাতের দিকে একটু বেড়াতে যেতে হবে।
না না স্যার, আমার পোলাটা আপনার লগে একটু দেখা করতে চায়।

জাহাঙ্গীর সাহেবের মনে পড়ে, মাস দুয়েক আগে রহমত হাজারখানেক টাকা চেয়েছিল। ছেলে নাকি চেয়ে পাঠিয়েছে। তিনি দিয়েছিলেন। ছেলে নাকি হাসপাতালের ফরম নিবে বলেছিল। জাহাঙ্গীর সাহেব অতটা গা করেননি। মনে করেছিলেন হয়তো কোনো অসুখ-বিসুখের জন্য সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাবে। খরচাপাতির জন্য হয়তো টাকা দরকার। তাই কথা না বাড়িয়ে টাকা দিয়েছিলেন। ঢাকায় এনে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাথে সান্ত্বনা বাণী। যদিও জাহাঙ্গীর সাহেব ভালোভাবেই জানেন যে ঢাকায় এলে ঝামেলাটা তার উপরেই এসে পড়বে।
স্যার, পোলাটা আপনারে একটু সালাম জানাইতে চায়। একটু দোয়া নিব।
তোমার ছেলে এসেছে নাকি।
জি স্যার। এক্কেবারে চইলা আইছে। বড় হাসপাতালে ভর্তি হইব।

এবার জাহাঙ্গীর সাহেব কিছুটা বিরক্ত হলেন। আজকাল গ্রামের মানুষেরা একটু অসুখ-বিসুখ হলেই শহরের বড় হাসপাতালে ভর্তি হতে চলে আসে। অথচ এখানে চিকিৎসা করাতে যে টাকা-পয়সা লাগে তা ওরা বুঝতে চায় না। আর যখন টাকার জন্য চিকিৎসা পায় না তখন ডাক্তারকে গালমন্দ করে। এই ছেলেও বোধ হয় সেইরকমই। ছেলেটিকে কোনো সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে হবে। তারপর নিজের পরিচয়টুকু জানিয়ে দিতে হবে। ডাক্তারি জগতে তার নামের প্রসার বেশ ভালোই। আজ সেটার প্রভাব খাটাতে হবে।

বিরক্ত গলায় রহমতের ছেলেকে পাঠিয়ে দিতে বলে জাহাঙ্গীর সাহেব সোফায় গা এলিয়ে বসেন। আজকে রাতে ডিনারটা কোথায় করবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। আরেকটা কাজ আছে। একটা প্রাইভেট মেডিক্যালের এডমিশন কমিটির সভাপতি তার বন্ধু-মানুষ। যদি ওয়েটিং লিস্ট থেকে না হয়...।

স্যার, আসসালামুআলাইকুম।
ছেলেটা খোলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে একটা সাধারণ শার্ট আর একটা কালো প্যান্ট। পায়ে একজোড়া সস্তা চামড়ার সেন্ডেল। মাথার চুল ডান দিকে সিঁথি করে আচড়ানো। গায়ের রং শ্যামলা বর্ণের। কিন্তু যে জিনিসটা প্রথমেই চোখে পড়ে ওর তা হলো প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ।
ও আচ্ছা, আসো আসো। নাম কি তোমার?
স্যার, জাবেদ- ছেলেটি একটি মিষ্টি হাসির সাথে উত্তর দিল।

তোমার বাবার কছে সব শুনেছি। তো তুমি ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি হয়ে যাও। সরকারি হাসপাতাল তো। ওরা তোমাকে ভালোভাবেই দেখবে।
জি স্যার, আগামী রবিবারেই ভর্তি হয়ে যাব।
খুব ভালো। তো তোমার শরীরের অবস্থা এখন কেমন?
আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি, কিন্তু স্যার ভিতরে ভিতরে একটু টেনশন কাজ করছে আর কি।
টেনশন! কিসের টেনশন? তোমার সমস্যাটা কি বলতো শুনি। ডাক্তারসুলভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন জাহাঙ্গীর সাহেব।
ছেলেটি দ্বিধায় পড়ে গেল এবং সংকোচের সাথে বলল,
না স্যার, নতুন কলেজে ভর্তি হব তো তাই নিয়ে একটু টেনশনে আছি
কলেজ! কোন কলেজ? এবার জাহাঙ্গীর সাহেবের অবাক হওয়ার পালা।
স্যার, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ। ৬০তম হয়েছি স্যার। ছোট থেকেই আমার একটা স্বপ্ন ছিল, ডাক্তার হব। জাবেদের গলাটা ভারী হয়ে আসে, নিজে নিজে পড়েছি। বাবাকে বুঝতেও দেইনি। উনিতো এখনও জানেন না কোথায় ভর্তি হচ্ছি। শুধু জানেন তার ছেলে ডাক্তার হচ্ছে। তাই সকলকে বলে বেড়ায় আমি নাকি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি। ছেলেটার চোখ ছল ছল করছে। ফরম কেনার টাকা সময়মতো যোগাড় হয়নি। আপনি না থাকলে...।
বাকি কথাগুলো আর জাহাঙ্গীর সাহেবের কানে যায় না। তার কান তখন ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে।

ছেলেটাকে বিদায় করে খাবার ঘরে গেলেন জাহাঙ্গীর সাহেব। প্রচণ্ড পিপাসা। ফ্রিজের ঠান্ডা পানি দরকার। এষা তার পাশে এসে দাঁড়াল।
বাবা, তিনজনের জন্য গুলশানের পিৎজা হাটই ভালো হবে। এরপর আইসক্রিম খেতে বনানী।
জাহাঙ্গীর সাহেব কোনো জবাব দিলেন না। তার চোখের কোণে পানি জমতে শুরু করেছে।
তিনি আজ একটি কঠিন সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে। তার স্বপ্নটুকু কেন যেন ধূসর মনে হচ্ছে।

জলছবি

মোঃ জোবায়দুল ইসলাম
ম্যানেজার, সেলস এন্ড মার্কেটিং
একেএইচ ওয়াশিং লিমিটেড, একেএইচ গ্রুপ
প্রাক্তন সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার, ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড

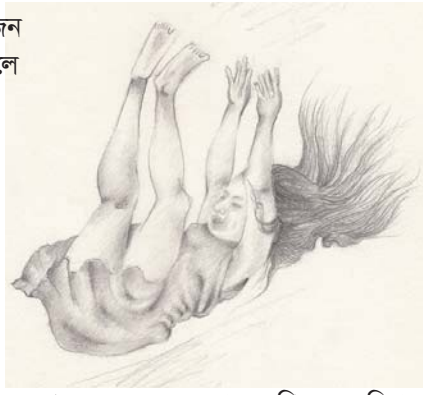

নারিকেলবাড়ি গ্রাম। আছাবুদ্দি এ গ্রামের একজন ভূমিহীন দিনমজুর। অন্যের ভিটেয় কুড়েঘর তুলে বৃদ্ধা মা-স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনোমতে বেঁচে আছে আছাবুদ্দি। একসময় তার বেশ কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল। পিতা বেঁচে থাকতে জনৈক মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে জমি চলে যায়, খালাসী বন্ধক রাখে। পিতার মৃত্যুর পর আর সে জমি ফেরত পায়নি। আছাবুদ্দি জানে- পাবেই বা কি করে, 'পাইতে গেলি লড়তে হইব গায়ে গতরে জোর থাকতে হইব, ট্যাহা-পয়সা থাকতে হইব।' কতদিন কত গ্রাম্য মাতুব্বরের কাছে গিয়েছে, বিচার চেয়েছে। কি লাভ! বহু দেন-দরবার করেও জমি ফেরত পায়নি। আছাবুদ্দি উপরওয়ালার কাছে বিচার দেয়, 'তুই আমারে দুনিয়াতে ঠকাইছোস, কেয়ামতের দিন, যেদিন আল্লাহ তর গলায় ঐ জমি ঝুলাইয়া দিব, সেদিন বুঝবি।' এটুকুই তার সান্ত্বনা। অবশেষে বিধবা মা-স্ত্রী-সন্তান নিয়ে পথে নামে সে।

ভোরের কুয়াশা ঢাকা প্রকৃতি। আছাবুদ্দি ঠেঙ্গাজাল ঘাড়ে নিয়ে ছুটছে- সাথে দু'সন্তান, হযরত আর প্রতিবন্ধী ছেলে। তার নাম গ্রামের অনেকেই জানে না, সবাই ডাকে পাগলা বলে। হযরত বড়, পাগলা ছোট। নদীতে মাছ ধরছে, বুড়ি তিস্তার শীতল বাতাস আর কুয়াশায় ছেলে দু'টি কাঁপছে। পাগলা উহ্ আহ্ শব্দ করে তার বাবাকে বোঝায় সে ঠান্ডায় কাঁপছে। 'শক্ত হ, শক্ত হ, দেখবি বেবাক সহ্য হইয়া গেছে। বাঁচতে হলি আগে পেটের ক্ষিদা, এই পেটের ক্ষিদার জন্যই আমগো জীবন চলা।' কি শীত আর কি বৃষ্টি। এখন তাদের কাছে কোনোকিছু হাড়কাঁপানো শীত নয়, কোনোকিছু অবিরাম বৃষ্টি নয়- খালি মাছ ধরো, আরো বেশি মাছ, পেটের ক্ষুধা নেভানো আর জীবন চলা। সহজ-সরল মানুষগুলোর বুড়ি তিস্তার সাথেই বাঁধানো স্থবির জীবন। মেয়ে বেদেনা। স্কুলে দু'এক শ্রেনী পড়ে আর যাওয়া হয়নি। দেখতে ফুটফুটে সুন্দরী। কিশোরী বয়স না পেরুতেই একদিন বিয়ে হয়ে গেল তার আদরের মেয়েটির। মেয়ে তার স্বামী ঘর-সংসার নিয়ে সুখে থাকবে- এ প্রত্যাশা প্রত্যেক বাবা মায়ের। আছাবুদ্দির সময়ের যেটুকু সঞ্চয় তার সবটুকুই দিয়ে দিল মেয়েকে তার ঘর সাজাতে।

বেদেনার কপালের লিখন কেন যে এমন হলো? স্বামীর প্রতিদিনের নির্যাতন আর যৌতুকের দায়ে বাবার ঘরে ফিরে আসলো বেদেনা। না, আর ফেরা হয়নি স্বামীর ঘরে। স্বামীও নিরুদ্দেশ, কোথায় গেছে কে জানে? বেদেনা বাবার গলা জড়িয়ে কাঁদে আর কাঁদে- 'বাবা

আমাক নিয়া ভাইব না, আমিও তোমার লগে মাছ ধরতে যামু, মাঠে কাজ করমু।' বেদেনা নিস্তব্ধ সময়ের ঘরে শরীরের আঘাতের চিহ্নগুলোতে হাত বুলায়, চোখের জল ফেলে, যদি তার নিষ্ঠুর স্বামীটা আবার ফিরে আসে, কেন আসবে না- জীবনটা যে তার সাথে বিনা সুতায় বাঁধা, কোন এক মায়ার তারে বাঁধা।

দিন যায়।

বেদেনার শরীরের সৌন্দর্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়ে কিছু লম্পট ধনী মহাজনের। এবার রক্ষা কোথায়? একটি অবৈধ সন্তান লাভ করায় বেদেনার জীবনে নেমে আসে সমাজপতিদের নির্যাতন। গ্রাম্য শালিস চলছে- 'এই মহাপাপের ফলে আছাবুদ্দির পরিবারকে একঘরে করে রাখা হলো। কেউ কারো নলকূপের পানি দিবা না, ধার দিবা না, মজুরী দেওয়াও বন্ধ; চারদিকে জনতার করতালি অথচ অপরাধী মহাজন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। শাস্তিস্বরূপ শালিসে ঘোষণা করা হয়- 'এই মাইয়াকে জারজ সন্তান পয়দার জন্য ১০১টা দোররা মারতে হবে। তা না হলে আমরা হগলেই গোনাহ্গার হইয়া যামু।' মাটিতে পড়ে আছে বেদেনা। শরীরে ১০১টা দোররা মারা হয়েছে। শরীর, শরীরের কাপড় বেয়ে রক্ত চুয়ে চুয়ে পড়ছে। তার চিৎকারে সবাই উল্লসিত। যে যার ঘরে ফিরছে- সবাই বলছে, হ্যা হ্যা উচিৎ শিক্ষা হইছে। এত বড় পাপ, পাপের ফলতো পাইবই। পাপের এই অবৈধ কন্যা সন্তান এখন কই রাখবে বেদেনা। তার পাপের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অবশেষে একটা বিহিত হলো। কন্যাটিকে এক অন্ধকার রাতে গোপনে এক উকিলের নিকট দত্তক দেয়া হলো। কেউ জানল না। পাপ বুঝি এবার মোচন হলো, বাঁচল এবার গ্রামের মানুষ। মেয়েটি আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে নিঃসন্তান উকিলের ঘরে। একদিন অভাবের তাড়নায় বেদেনা ঢাকায় চলে আসে। কাজ নেয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে। বেঁচে থাকতে চায় বেদেনা, তার পরিবারকেও বাঁচাতে চায়।

কি আছে তার রূপে, সৌন্দর্যে? এখনো তার প্রতি প্রেমের দৃষ্টি, ঘর বাধার স্বপ্ন অনেকের। দিন যায়। বেদেনা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। সে দাঁড়াবে কোথায়? ধরার মতো কোনো শক্ত আশ্রয় খোঁজে সে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? এক লম্পটের পাল্লায় পড়ে আবারো প্রতারিত। পৃথিবীতে সবাই সাধুবেশে থাকতে চায়। বেদেনা সবকিছু ভুলে থাকতে চায়। বেদেনার শত বেদনার পরেও সে বেঁচে থাকতে চায়, কাজ করতে চায়। বেঁচে থাকতে হলে পেটে ক্ষুধা আছে- এই ক্ষুধার জন্য চলতে হবে, ছুটতে হবে। বেদেনার কখনো কখনো মনে হয়- 'পেটে যদি ক্ষুধা না পাইত তবে ১০১ বছরের একটা ঘুম দিতাম। জাইগা থাকার আর কিসের দরকার।' তারপর বাসা বাড়িতে ঝি-গিরি, মেসে রান্না, যখন যেখানে পারে তার কাজ চাই, চাকুরি চাই। অবশেষে দালাল নুরু ও মানুষ পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে। পাচারকারীরা তাকে চাকুরির প্রলোভনসহ বিয়ের কথা বলে বিক্রি করে দেয় কিন্তু সে বুঝতে পারেনি। নাম তার বেদেনা কিন্তু কেউ তাকে এ নামে ডাকেনি। সবাই ডাকত সহজ স্বরে বেদনা বলে। বেদেনা তার বেদনার কোনো এক অতল গহ্বরে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

গভীর রাত। শ্রাবণের বৃষ্টি ঝরঝর করে পড়ছে। ছোট্ট ভিটেমাটিতে ছোট্ট কুঁড়েঘর থেকে কোনো এক মায়ের কান্নার কণ্ঠস্বর বৃষ্টির শব্দের সাথে মিশে গেছে, যে কণ্ঠস্বর কেউ শোনেনা- আমগো মাইয়াডা কই আছে, কিবা আছে, ওকি বাঁইচা আছে নাকি মইরা গেছে, একবার যদি ফিরা আইতো। আমার চোক্ষের সোনাডারে দেখতাম, হায়রে আমার বেদেনা, হায়রে আমগো বেদনা। শূন্যতা, কোথায় যেন গভীর কোনো এক শূন্যতা। বাবা আছাবুদ্দির চোখে কখনো জল আসে না। সে কাঁদতে পারে না, সে শুধু নির্বাক, নির্মম তাকিয়ে থাকে। চকিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকা আছাবুদ্দি তার হাতে ধরানো জলিল বিড়িতে জোরে টান মারে। টের পায় তার ভাঙা দরজার সামনে দু'জন দাঁড়ানো। দরজা খুলে দ্যাখে ছেলে হযরত আর পাগলা নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টিভেজা শরীরে। তার মায়ের কণ্ঠস্বর আরো বেড়ে ওঠে; তার মাকেই বা কি বলবে। শুধু শুধুই মনে হয় তার আদরের বোনটাকে কত বছর দেখে না। বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টিভেজা বৃষ্টিতে তারা দেখতে পায় শায়িত বেদনার শরীরে ১০১টা দোররার দাগ। শরীর থেকে রক্ত ঝরে ঝরে বৃষ্টির সাথে মিশে যায়, আকাশ আরো বেশি ভারী হয়। দিন যায়। লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করে হেঁটে চলছে আছাবুদ্দি। চারদিকে তাঁকায় বড় বড় নিশ্বাস ফেলে। বড় বড় শ্বাস নিতে চায়, তার অক্সিজেন চাই। বেঁচে থাকার জন্য সমাজে বিশুদ্ধ অক্সিজেন চাই। আছাবুদ্দি নিজেকে ধিক্কার দেয়, সে টের পায় সমাজে অহন কত পরিবর্তন মানুষ অহন দিনকে রাত করছে, রাতকে দিন করছে। পোলা মাইয়া একলগে রাইত বিরাত ঘুইরা ফিরছে। কত কানকথা হুনি- ঔষধ খাইয়া নাকি মানুষ পেটের বাচ্চা নষ্ট করছে, শূয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা, অহন তাগো বিচার কে করে?

দিন যায়।

উকিলের ঘরে লালিত মেয়েটি, সে জানে তার বাবা একজন নামকরা উকিল- মা একজন শিক্ষিতা নারী। সেও একদিন বড় হবে। অনেক বড় হবে। আছাবুদ্দি ও তার নির্দিষ্ট পরিজনেরা কখনো নিভৃতে রাস্তাপথে মেয়েটিকে দেখে, কিন্তু পরিচয়হীন থেকে যায় তাদের সম্পর্ক। তার কাছে কখনো যেতে নেই। এখানে বেদেনার মতো বেদনার কোনো রং নেই। বয়সের ভারে ন্যুব্জ আছাবুদ্দি দূরে দাঁড়িয়ে পরিচয়হীন নাতনীর সুখ-শান্তি দেখে। নিরবে দু'চোখে জল আসে। আছাবুদ্দির কাশি বেড়ে যায়। দু'নখের ফাঁক থেকে জলিল বিড়িটি ছিটকে পড়ে। আছাবুদ্দি অনুভব করে, তার চোখেতো কখনো জল আসে না কিন্তু আজ কেন আসবে! ঠুক ঠুক লাঠিতে ভর দিয়ে রাস্তার পাশে সবুজ ঘাসে বসে পড়ে। সত্যিই দু'চোখে জল আসছে। ঐ দূরে তাকায়, সত্যিই দু'চোখে জল আসছে। ঐ দূরে তাঁকায়। তার দু'চোখ ঝাপসা থেকে আরো ঝাপসা হয়ে আসছে। দু'চোখে জল আসে। সুখের জল ফেলে। এ সুখের জল মুছতে বেশ ভালো লাগে।

উচ্চ রক্তচাপ-সমস্যা এবং প্রতিরোধ

ডাঃ আসমা আক্তার
মেডিক্যাল অফিসার
ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস

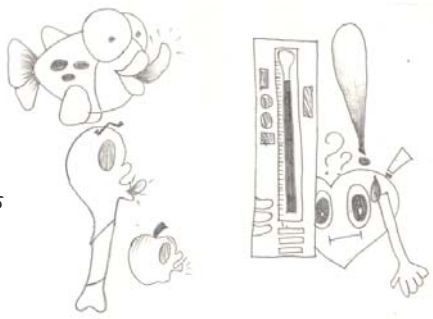

উচ্চ রক্তচাপ একটি বিপজ্জনক স্বাস্থ্য ঝুঁকি। রক্তের চাপ স্বাভাবিক মাত্রার (১২০/৮০) চেয়ে বেশি হলে হৃদরোগের যেমন সম্ভাবনা তৈরি হয় তেমনি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, পঙ্গুত্বসহ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ কিডনির সমস্যাসহ নানাবিধ স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

উচ্চ রক্তচাপ থেকে পরিত্রাণের উপায়সমূহ–

১. স্বাস্থ্যকর খাবার খান। যেমন- ফল, সবজি, শসা, মুরগীর মাংস, মাছ এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার। খাদ্যের মধ্যে লবনের পরিমান কমাতে হবে।
২. একটি স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন। ওজন নিয়ন্ত্রণ করলে আপনার উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
৩. বয়স এবং উচ্চতা অনুযায়ী ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
৪. শারীরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি, নিয়মিত শারীরিক কসরতের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমবে।
৫. মানসিক চাপ রক্তচাপ বৃদ্ধির একটি কারণ, তাই মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে মেডিটেশন করতে পারেন।
৬. মদ্যপান এবং ধুমপান থেকে বিরত থাকুন।
৭. গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিলে অবশ্যই নিয়মিত ডাক্তারের চেকআপে থাকতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপের উপসর্গসমূহ–

১. মাথা ব্যথা (মাথার পিছনে)
২. কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ
৩. ঘাড় ব্যথা
৪. বমি বমি ভাব
৫. বমি হওয়া
৬. মাথা ঘোরা
৭. অস্থির হওয়া
৮. বুকে ব্যথা

৯. বুক ধড়ফড় করা
১০. অতিমাত্রায় ঘাম।

তাৎক্ষণিক করণীয়–
উপরোক্ত উপসর্গগুলি দেখা দিলে প্রথম অবস্থায় রক্তচাপ পরিমাপ করতে হবে। রক্তচাপ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হলে সাথে সাথে মাথায় পানি ঢালতে হবে এবং সমস্ত শরীর মুছিয়ে দিতে হবে। অতঃপর রোগীকে অবশ্যই নিকটস্থ চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে।

কিডনিকে সুস্থ্য রাখার ১০টি উপায়–
কিডনি আমাদের শরীরে কতটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তা আলাদা করে বলার কিছু নেই। এক কথায় আমাদের শরীরকে নোংরামুক্ত করে কিডনি। খাওয়া-দাওয়া বা দূষণ থেকে শরীরে জমা হওয়া নানা টক্সিন শরীর থেকে বের করে রক্ত পরিস্কার করে, নানা হরমোন ক্ষরণ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ মিনারেল শরীরে শোষণ করে। বুঝতেই পারছেন এটা ছাড়া আমাদের শরীর একটা আস্তাকুড়ে পরিণত হবে। তবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা ক্রমাগত এমন কিছু ভুল করে চলেছি যাতে কিডনি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এটা চলতে থাকলেও বিশেষ একটা কিছু বোঝা যায় না। নিদেনপক্ষে ২০ শতাংশ ঠিকঠাক থাকলেও কিডনি তার কাজ করেই চলে। তবে যখন বোঝা যায় তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনেক দেরি হয়ে যায়। তাই সময় থাকতে সাবধানতাই কিডনি ভালো রাখার উৎকৃষ্ট উপায়।

১. পানি কম খাওয়া– কিডনির কাজ শরীরকে পরিস্কার রাখা। তার জন্য পরিমিত জলের প্রয়োজন। শরীরে জমা হওয়া টক্সিন এবং ক্ষতিকারক বর্জ্য জলের সাহায্যে ধুয়ে বের করে কিডনি। যদি পানি কম খাওয়া হয় তবে সেই টক্সিন জমা হতে থাকে কিডনিতে। যেটা একেবারেই কাম্য নয়।

২. খাবারে লবন বেশি খাওয়া– প্রত্যহ শরীর চালনার জন্য সোডিয়াম দরকার। তবে অনেকেরই লবন বেশি খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে, যা রক্তচাপ বাড়িয়ে কিডনিতে চাপ ফেলে। দিনে পাঁচ গ্রাম বেশি নুন মানেই সেই চাপ আপনি ডেকে আনছেন।

৩. দীর্ঘক্ষণ মূত্রের বেগ চেপে রাখা– রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়ে বা বাইরে কোথাও পর্যটনে গেলে পাবলিক টয়লেট ব্যবহারে অনেকেরই আপত্তি থাকে। তাই জল কম খেয়ে বা প্রচণ্ড বেগ চেপে রেখে হোটেলে বা বাড়িতে ফিরেই বাথরুমে যান। আপনি কিন্তু নিজের অজান্তেই কিডনির বড় ক্ষতি করে ফেলছেন। এর ফলে কিডনিতে পাথরতো হয়ই, সঙ্গে কিডনি বিকলও হতে পারে।

৪. চিনি বেশি খাওয়া– গবেষণায় দেখা গেছে দিনে দুইবারের বেশি চিনিযুক্ত পানীয় শরীরে গেলে মূত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রোটিন বেরিয়ে আসে। এটা কিডনি খারাপ হওয়ার

প্রাথমিক লক্ষণ।

৫. সুষম আহার– সুষম আহার না করা ও ভিটামিন বা মিনারেলযুক্ত খাবার বা এক কথায় বলতে গেলে প্রচুর শাক-সবজি এবং ফল খাওয়ার ব্যাপারে অনেকের অনীহা থাকে। এটা কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

৬. রেড মিটের ভক্ত– মাংস বলতেই বোঝেন রেড মিট এমন লোকের অভাব নেই। কিন্তু জানেন কি রেড মিট বেশি খেলে কিডনিতে মেটাবলিক লোড বেশি পড়ে? কারণ প্রচুর প্রোটিনযুক্ত খাবার শরীরে প্রচুর টক্সিনের জন্ম দেয়। যা পরিস্কার করতে কিডনিকে নিরন্তর কাজ করে যেতে হয়। যাতে পরবর্তীকালে কিডনি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৭. কম ঘুমানো- ক্রমাগত যদি ঘুম কম হয় তবে শরীরে নানা রোগ বাসা বাঁধে। কিডনিজনিত সমস্যাও এর মধ্যে রয়েছে। সারাদিন কাজ করার পর রাতে ঘুমানোর সময় আপনার কিডনি তার ক্ষতি হওয়া টিস্যুগুলোকে মেরামত করে। তাই রাতে ঘুমান এবং কিডনিকেও বিশ্রাম নিতে দিন।

৮. অতিরিক্ত কফি– নুনের মতোই ক্যাফেইনও রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গে কিডনির চাপও বাড়ায়। দিনে বারবার কফি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে এখনই তা ত্যাগ করুন।

৯. কথায় কথায় পেইন কিলার– সামান্য ব্যথা পেলেন কি মাথা ব্যথা হলো; সঙ্গে সঙ্গে পেইন কিলার চালান করলেন পেটে। অতিরিক্ত পেইন কিলার পরবর্তীকালে লিভার এবং কিডনি দুইই শেষ করে।

১০. অতিরিক্ত মদ্যপান– কদাচিৎ বন্ধুদের আড্ডায় সামান্য মদ্যপান বা মাসে দুই দিন ওয়াইন শরীরের ক্ষতি করে না। কিন্তু সেটাই যখন সপ্তাহে সপ্তাহে ফিরে আসে তখনই তা চিন্তার বিষয়। কারণ এ্যালকোহল বা মদ্যপান শরীরে সরাসরি টক্সিনের প্রবেশ করায়, যা লিভার এবং কিডনির পক্ষে অত্যন্ত খারাপ।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। তবে তার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। এতে সাময়িক কষ্ট কিংবা অসুবিধা হতে পারে, তবে তা আপনার জন্য সুফলই বয়ে আনবে।

কমন জেন্ডার

আতিকুল ইসলাম অপু
এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর, ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গ্রুপ

ঈদের ছুটি শেষ। রাস্তার অসহনীয় যানজটে পরিবারের বাকি সদস্যদের নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তাই নিজে একাই ঢাকা ফিরছি। একটু খারাপ লাগলেও মনে মনে আনন্দও পাচ্ছি। ক'টা দিন বিবাহিত ব্যাচেলর হিসেবে কাটাতে পারব- এই ভাবছি আর ছুটির দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে বাসের চেয়ারে নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছি।

তখন বাজে সকাল দশটা। গাড়ি ছাড়ার পূর্বেই হঠাৎ গাড়িতে একদল হিজড়াদের আগমন। অনেকেই আমরা হিজড়াদের দেখলে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করি। আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

আমি গাড়ির ৫নং লাইনে আছি। সবার কাছ থেকেই চাঁদা তোলা প্রায় শেষ। এবার আমার পালা। উপায়ান্তর না দেখে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর ভান করছি। আমিতো ভয়ে শেষ। মনে মনে কয়েক সেকেন্ডে অনেক কিছু ভেবে ফেললাম। যদি আমাকে জাপটে ধরে, যদি হাত ধরে টান দেয়, জানালা দিয়ে কীভাবে পালাব? আমি অভিনয় কিংবা ভান ধরে থাকায় পারদর্শী না হয়েও সুদক্ষভাবে বৃথা চেষ্টা চালালাম। ওদের একজন এসে দুই হাতে তালি মেরে আমার পেটে গুতা মারল। ঈদের বকশিস দে। আমি উঠলাম না, ঘুমানোর ভান করে রইলাম। সাড়া না দেয়ায় আরো একজন এসে গালে গুতো মারল- এই হিরো, ঝটপট টাকা দে, নইলে...। আমি ভয়ে পকেট থেকে বিশ টাকা দিলাম। ওরা বেশ নাছোড়বান্দা; মানল না। একশত টাকার নোটটা নিয়ে গেল। সঙ্গে ঐ ভাংতি বিশ টাকাও। এ যাত্রায় রক্ষা, অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম।

আমাদের সমাজে এ ধরনের অনেক কমন জেন্ডার মানুষ আছে। যারা কিনা ক্রোমজমের ত্রুটির কারণে জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী, আমরা যাদের দেখলে ভয়ে দূরে সরে যাই কিংবা অমঙ্গল, অশালীন, অলক্ষী বলে ভর্ৎসনা করে থাকি। ওরা চুরি না করে দোকানে দোকানে গিয়ে চাঁদা তোলে, ছোট্ট শিশুদের বাবা-মাদের জিম্মি করে অর্থ উপার্জন করে পেটের দায়ে।

সকালবেলা ফুটপাত দিয়ে হেঁটে অফিসে যাচ্ছিলাম। প্রচণ্ড তাপদাহে ঢাকার মানুষের জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে এসেছে। যতটুকু সম্ভব ছায়াযুক্ত পথ ধরে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে এক জায়গায় মানুষের প্রচণ্ড ভীড়, একজন মধ্যবয়সী মহিলা রাস্তায় বসে হাঁপাচ্ছে। আর সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে।

আমিও অন্যদের মতো ভীড় ঠেলে উঁকি দিয়ে দেখলাম। খারাপ লাগলেও অন্যদের মতোই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। তখনি কে যেন দৌড়ে এসে সেই মহিলাকে পানির বোতল দিল

পান করার জন্য। একটু থেমে তাকালাম। মনে মনে বললাম- আল্লাহ যেন তার মঙ্গল করেন। যে সাহস বা পদক্ষেপ আমি রাখি না, তা কেউ না কেউতো রেখেছে। একটু দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলাম, সেই নারীকে সাহায্যের জন্যে যে হাত বাড়াল সে আপনার আমার ভয়ের কারণ, ভর্ৎসনার শিকার, অলক্ষ্মী, অপয়া একজন হিজড়া। তার হাতে হাত রেখেই মধ্যবয়সী নারী পানি পান করে উঠে দাঁড়ালেন। না চাইলেও এই পাষাণ হৃদয়ে একবিন্দু চোখের জল এল। নিষ্ঠুর মানুষের মতো জলটাকে গড়িয়ে যেতে দিলাম না, সামলে নিলাম নিজেকে।

আজ যেন হিজড়াদের মূল্যবোধের কাছে হেরে গেলাম। পরাজিত হলো আমার বিবেক, ধিক্কার দিল আমাকে। কিছুদিন পর পত্রিকায় পড়লাম পুলিশ সার্জেন্ট পদে কমন জেন্ডারদের নিয়োগ দেয়া হবে। শুনেই আনন্দিত হলাম মনে মনে। আর যেন তাদেরকে পথে পথে ঘুরতে না হয়, চাঁদা তুলতে না হয়, সদ্য জন্মানো কোনো শিশুর বাবা-মাকে হেনস্থা করতে না হয়। সরকারের এরূপ পদক্ষেপ অব্যাহত থাকুক এই কামনা ও প্রার্থনা করি। আমরা যেন তাদেরকে ভয় না পেয়ে, তিরস্কারের চোখে না দেখে আমাদের ভাই-বোন হিসেবে সমাজে সমান সুযোগ করে দেই। আর জ্বালাতন নয়, তারাও প্রমাণ করার সুযোগ পাক যে- তারাও আমাদের মতো রক্ত-মাংসের বোধসম্পন্ন উন্নত মানুষ।

We congratulate Babylon Group
on 10th publication of
Babylon Kathokata

LALON
CNG

LALON FILLING & CNG STATION
লালন ফিলিং এন্ড সি.এন.জি স্টেশন
JORPOOL, HEMAYETPUR, SAVAR, DHAKA
Mobile: 01714058551, 01727706573, 01731423107

বর্ষার আকাশে সাতরঙা মেঘেদের দল

আরিফ হোসেন
সিনিয়র অফিসার, এইচআর ডিপার্টমেন্ট
ব্যাবিলন গ্রুপ

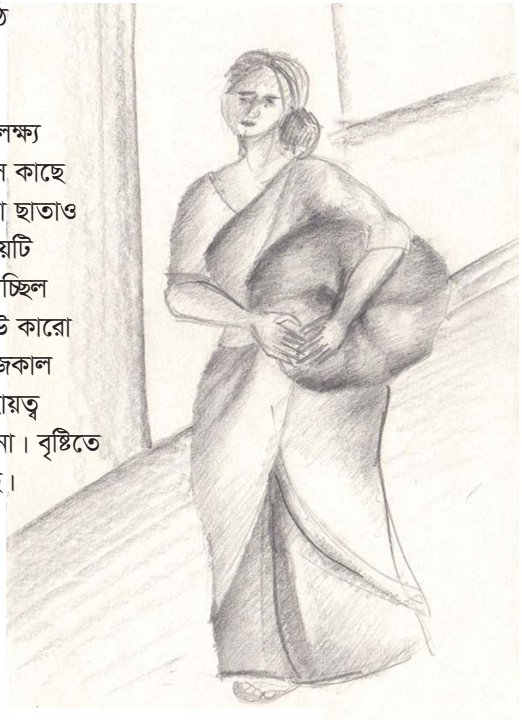

মহিলাটি চেষ্টা করেও পারছে না উঠে দাঁড়াতে, পড়ে যাচ্ছে বারবার।

আকাশ রাস্তার এপার থেকে বিষয়টি লক্ষ্য করছিল। কিন্তু তুমুল বৃষ্টির কারণে সে কাছে যেতে পারছিল না, তার সাথে কোনো ছাতাও নেই। দু'একজন পথচারী অবশ্য বিষয়টি দেখেও মহিলাটির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল যার যার গন্তব্যে। আজকাল যেন কেউ কারো জন্য নয়। সামান্য মানবতাটুকুও আজকাল অনেক কমে গেছে। মহিলাটির অসহায়ত্ব দেখে আকাশ কাছে না গিয়ে পারল না। বৃষ্টিতে ভিজেই এগিয়ে গেল মহিলাটির কাছে।

কি হয়েছে আন্টি, পা পিছলে পড়ে গেছেন?- জিজ্ঞেস করল আকাশ।
হ্যা বাবা, পা পিছলে পড়ে গেছি।
কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারছি না।
আপনি কোথায় থাকেন?
এখান থেকে বেশি দূরে না। একটু সামনেই আমার বাড়ি।
আচ্ছা চলেন, আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেই।
মহিলাটি আকাশের কাঁধে হাত রেখে উঠে দাঁড়াল। আকাশ লক্ষ্য করল, ব্যথায় তার মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।
রিক্সায় উঠল তারা।
আকাশ বলল, সম্ভবত আপনার পা মচকে গেছে, বৃষ্টির মধ্যে একটু সাবধানে হাঁটবেন না।
কী করব বাবা, দেরি হয়ে গেছে, তাই তাড়াতাড়ি হাঁটছিলাম।
কিন্তু এত বৃষ্টির মধ্যে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?
আমাদের ঝড় আর বৃষ্টি নেই বাবা, ব্যথায় কাতর মহিলার উত্তর। গরিব মানুষ, সামান্য ছোটখাটো কাজ করি।
কোনো কাজই সামান্য না আন্টি, সব কাজই সম্মানের। আচ্ছা আপনি বরং চুপ করে থাকুন,

ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। পরে সব শোনা যাবে।

একটি টিনসেড বাড়ির সামনে রিক্সা থামল। আকাশের চোখ বাড়িটির দিকে নয়। বাড়ির পিছনের কদম ফুলের গাছটির দিকে। চমৎকার কদম ফুলে ফুলে গাছটি ছেয়ে গেছে। কী সুন্দর! চোখ জুড়িয়ে যায়। অদ্ভুত এক ধরনের ভালোলাগা ছুঁয়ে যায় হৃদয়জুড়ে। এই মুহূর্তে বৃষ্টি একটু কমেছে। একটি মেয়ে মহিলাটিকে দেখে এগিয়ে এল।
মা, কি হয়েছে তোমার?

আপনার মা পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন, সম্ভবত পা মচকে গেছে। উনাকে ভেতরে নিয়ে যান।
বাবা তুমিও ভেতরে আসো। আজ তুমি না নিয়ে এলে আমি যে কীভাবে বাসায় আসতাম? গরিবের বাড়িতে একটু বসে যাও।
হঠাৎ বৃষ্টির জোর বেড়ে গেল। আকাশকে বসতেই হলো।

বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি। বর্ষায় এই এক সমস্যা, কখন যে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে তার কোনো ঠিক নেই।
এই বর্ষা, উনাকে চা-বিস্কুট কিছু দে- মহিলাটি বললেন।

না না আন্টি, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি বরং বিশ্রাম নেন আর ব্যথা বেশি হলে ডাক্তার দেখাবেন। আমি কিছু খাব না।

আপনি আমাদের বাসায় আসলেন আর এক কাপ চাও খাবেন না, তা কি করে হয়?
আচ্ছা ঠিক আছে, এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে।

বর্ষা চা আনতে গেলে আকাশ মনে মনে ভাবে- ছয়টি ঋতুর মধ্যে শুধুমাত্র এই একটি ঋতুর নামেই মেয়েদের নাম রাখা হয় খুব বেশি। তাছাড়া বর্ষাকালের আর একটি অতি পরিচিত বিষয়- বৃষ্টি। এই বৃষ্টি নামটিও কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। আশ্চর্য! এগুলো কি ভাবছি আমি? নিজেকে প্রশ্ন করে আকাশ। আসলে বৃষ্টির দিনগুলোতে আকাশের কী যেন হয়। মন কেমন যেন উদাসী আর এলোমেলো হয়ে যায়। হঠাৎ ওপর থেকে টুপ টুপ করে পানি পড়ে আকাশের মাথা ভিজে যায়। সে লক্ষ্য করে- ঘরের চালের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে পানি পড়ছে। বর্ষা চা নিয়ে আসে। আকাশকে বৃষ্টির পানিতে ভিজতে দেখে বলে, ভাইয়া এদিকটায় বসেন। এখানে পানি পড়ে না। আকাশ চেয়ারটা নিয়ে সেদিকটায় যায় এবং চা খেতে খেতে বৃষ্টির সাথে আকাশের গল্প হয়। আকাশ জানতে পারে বর্ষার মা ফেরি করে বাড়ি বাড়ি শাড়ি/ থ্রি-পিছ বিক্রি করে। তার বাবা সৎ মায়ের সাথে থাকে এবং তাদের কোনো খোঁজখবর নেয় না। তার মায়ের সামান্য আয়েই মা-মেয়ের সংসার কোনোরকমে

চলে। আকাশ লক্ষ্য করল, তাদের পরিবারে মা-মেয়ের সাথে আরেকজন সদস্য সদা বিরাজমান। নাম তার অভাব। তার উপস্থিতি এ রুমে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বর্ষা এখন ৯ম শ্রেনীতে পড়ছে। কথা বলার এক পর্যায়ে আকাশের মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। আজ আসি, আমার বন্ধু অপেক্ষা করছে- বলে আকাশ বেরিয়ে পড়ে বাসা থেকে।

বৃষ্টিও এই মুহূর্তে নেই। বন্ধুর সাথে দেখা করে আকাশ ফিরে যায় তার বাসায়। একটি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে আকাশ। একটি সুইং লাইনের সুপারভাইজার সে। 'হালাল উপার্জন এবাদত কবুলের পূর্বশর্ত'- কোথায় যেন কথাটা পড়েছে সে। কারখানায় তার লাইনে প্রতিদিনের গুণগতমানসম্পন্ন পণ্যের উৎপাদনলক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাই তার প্রধান দায়িত্ব। আর সে জানে 'উৎপাদনই উন্নতি'। তার কোম্পানি উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতিতেও রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাই সে নিজ কাজের জন্য গর্বিত এবং দৃঢ়ভাবে বলতে পারে- এবাদত কবুলের সেই পূর্বশর্তটি সে পূরণ করতে পেরেছে এখানে কাজের মাধ্যমে।

মা-বাবা ও ছোট বোনকে নিয়ে আকাশের ছোট্ট পরিবার। ছয় দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়, আবার ফিরে আসে- শুক্রবার। এই দিনটি আকাশের ভীষণ প্রিয়। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার আকাশ ভাবে শুক্রবারে লম্বা সময় ধরে ঘুমাবে, কিন্তু প্রতি শুক্রবারই অদ্ভুত কারণে খুব ভোরেই তার ঘুম ভেঙে যায়। অথচ সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে সকালে বিছানা ছাড়তেই ইচ্ছা করে না। ব্যাপারটা রহস্যজনকই বটে। আজ শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। খুব ভোরেই তার যখন ঘুম ভেঙে যায় তখনো সূর্যের আলো ফুটে ওঠেনি চারপাশে।

বন্ধু সোহেলের সাথে আজ তার স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কথা। হেমায়েতপুর নেমে পদ্মার মোড় থেকে তার বন্ধু সোহেলকে নিয়ে যেতে হবে। ঝটপট রেডি হয়ে রওনা হলো সে। হেমায়েতপুর নেমে পদ্মার মোড়ের উদ্দেশে লেগুনাতে উঠল সে। সামনে ড্রাইভারের সাথেই বসল। রাস্তার অবস্থা বিশেষ ভালো না। যত্রতত্র গর্ত ও ভাঙা। হেলেদুলে চলছে লেগুনা। ড্রাইভার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ওপর তার রাগ ঝাড়ছে- রাস্তাটার খেয়াল কেউ রাখেনা, সবাই নিজের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। রাস্তার কিনার দিয়ে শত শত ছেলে/ মেয়েদের টিফিন বাটি নিয়ে যেতে দেখে আকাশ নিজে নিজেই বলে উঠল- কী ব্যাপার, আজ অবনী খোলা নাকি? ড্রাইভার বলে উঠে, না ভাই, অবনী শুক্রবারে খোলা থাকে না। অন্য কোনো গার্মেন্টস হবে হয়তো, জরুরি কাজে খোলা রেখেছে। আপনি কীভাবে জানেন, অবনী খোলা না বন্ধ? জিজ্ঞেস করল আকাশ। এবার সে বিস্তারিত বলতে শুরু করল- অবনীর মালিক খুব ভালো, তাঁরা শুক্রবারে বন্ধ দেয়। বেতনও ঠিক সাত তারিখের মধ্যেই দিয়ে দেয়। গরিব ওয়ার্কারদের নাকি বেতন ছাড়াও গরু, ফার্নিচার দিয়ে ও বিভিন্ন সমস্যায় আর্থিকভাবেও সাহায্য করে। আকাশ মনোযোগ দিয়ে শোনে কথাগুলো এবং বলে- সত্যিই নাকি? ড্রাইভার বলে- কোম্পানিতে কাজ করা মেয়েদের কাছ থেকেই শুনেছি। সত্যি না হলে তারা কি এমনি

এমনি বলবে নাকি? আকাশ মনে মনে খুব খুশি ও গর্বিত হয় কথাগুলো শুনে। অবনী ফ্যাশন্স, অবনী নীট ওয়্যার ও অবনী টেক্সটাইলস লিঃ আকাশের কোম্পানিরই অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান। আকাশ সবই জানে তার কোম্পানির নিয়ম-কানুন ও সিএসআর কর্মসূচির ব্যাপারে। তার কোম্পানির নতুন একটি উদ্যোগ- 'হোম ওয়েলফেয়ার'- যা অন্য কোম্পানিগুলোর জন্য ঈর্ষা করার মতো একটি ব্যাপার। গরিব- অসহায় শ্রমিকদের জীবনমান সরেজমিনে পরিদর্শন করে তা উন্নয়নে সহযোগিতামূলক একটি প্রয়াসের নামই 'হোম ওয়েলফেয়ার।' তার নিজের লাইনের কয়েকজন গরিব শ্রমিকদেরও এমন সহযোগিতা করা হয়েছে। ব্যাপারটা সত্যিই যে এভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে তা দেখে আকাশ মুগ্ধ হয়। একজন লেগুনা চালকও তার কোম্পানির এসব মহৎ কাজের ব্যাপারে জানে। ব্যাপারটা আকাশের বেশ ভালো লাগে।

পদ্মার মোড়ে নামতেই আকাশ সোহেলকে দেখতে পায়। সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্য। সোহেলকে নিয়ে স্মৃতিসৌধে যাবার জন্য যাত্রা শুরু করল আকাশ। শুক্রবার বলে রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা। খুব তাড়াতাড়িই তারা স্মৃতিসৌধে পৌঁছে গেল। স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়ালে সব সময় আকাশের মনের মধ্যে অন্যরকম একটা অনুভূতি হয়। গায়ের সমস্ত লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়- যেন তার অন্তরাত্মাও জেগে ওঠে এবং সশ্রদ্ধ সম্মান জানায় মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি। আকাশ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। তার সমস্ত ভাবনাগুলো স্থির হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। শহীদ মিনারের সামনে গেলেও তার একই অনুভূতি হয়।

সোহেলের ডাকে তার মৌনতা ভাঙে। স্বাভাবিক হয় ভাবনাগুলো। চল আইসক্রিম খাব, সোহেল বলে। খুঁজতে খুঁজতে তারা একেবারে গেটের সামনে চলে আসে। রাস্তার কিনারে কিছু মানুষের জটলা দেখতে পায় তারা। আইসক্রিম কেনার জন্য সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় আকাশ শুনতে পায় লোকজন নিজেরা বলাবলি করছে- আহারে! মাথায় আঘাত পেয়েছে, হয়তোবা বাঁচবে না। মহিলাটি মনে হয় কাপড়ের ব্যবসা করত। কথাটা কানে পৌঁছাতেই আকাশ ঘুরে দাঁড়ায়। দ্রুত হেঁটে পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। তার হৃদয়টা এক অব্যক্ত আর অজানা বেদনায় চুরমার হয়ে যাচ্ছে কেন? জটলা ঠেলে সামনে যেতেই আকাশের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। এ যে সেই মহিলাটি! পাশে রক্তমাখা কাপড়ের একটি ব্যাগ। 'সোহেল' চিৎকার করে ডাকে আকাশ, তাড়াতাড়ি একটা সিএনজি ঠিক কর। মহিলাটিকে বাঁচাতে হবে। মহিলাটি চোখের ইশারায় কিছু বলতে চাইল আকাশকে। কিন্তু আকাশ কিছু বুঝতে পারল না (লোকজনের বলাবলি করা নানা কথা তার কানে আসলো- একটি বেপরোয়া গতিতে ছুটে চলা ট্রাকের ধাক্কায় মহিলাটির এ অবস্থা। মহিলাটির কোন দোষ ছিল না, রাস্তার কিনার দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি)। সিএনজি দিয়ে কাছের একটি হাসপাতালে নিলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে যেতে বলে।

বর্ষার মায়ের অপারেশন হচ্ছে। অপারেশন থিয়েটারের সামনের বেঞ্চে সোহেল ও বর্ষা বসে

আছে। পাশেই রক্তমাখা একটি কাপড়ের ব্যাগ। ব্যাগটি ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে বর্ষা। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে সোহেল। আকাশ এ মুহূর্তে খুব উদ্বিগ্ন। অস্থিরভাবে শুধু পায়চারি করছে অপারেশন থিয়েটারের সামনে। মাঝে মাঝে বর্ষার দিকে তাকাচ্ছে। ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটির মায়াভরা দু'চোখ বেয়ে লোনাজলের স্রোতধারা। মেয়েটির বাবাকেও খবর দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে আসতে পারবে না বলে জানিয়েছে। মানুষ কীভাবে এতটা নিষ্ঠুর হয়! ভেবে পায় না আকাশ। কি হবে মেয়েটির ভবিষ্যৎ? যদি তার মায়ের কিছু হয়ে যায়। নানা রকম চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

আকাশ জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে পুরো আকাশটা। চারদিকে অন্ধকারের কারণে দুপুরের এই মুহূর্তটাকে সন্ধ্যার মতো মনে হচ্ছে। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। চারপাশের করুণ পরিস্থিতির সাথে প্রকৃতিও তার সকরুণ উপস্থিতির প্রমাণ দিচ্ছে যেন। হঠাৎ সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল আকাশের। ঠিক এমন একটি দিনেইতো মহিলাটির সাথে তার প্রথম দেখা হয়েছিল। সেদিন তাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারলেও আজ আকাশ জানে না- মহিলাটি বাঁচবে কিনা? কী হবে তার ফুলের মতো মেয়েটির ভবিষ্যৎ?

ডাক্তার বেরিয়ে আসে অপারেশন রুম থেকে। আকাশ এগিয়ে যায় তাঁর দিকে। বর্ষা এবং সোহেলও এগিয়ে আসে। ডাক্তার বলে- দুঃখিত, উনাকে বাঁচানো গেল না। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। বর্ষা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। আকাশ তাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে যায়। আকাশকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি কাঁদতে থাকে। আকাশও অনুভব করে তার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসছে অঝোর শ্রাবণধারা-----

ভালোবাসার ওম

সফিকুল ইসলাম সবুজ
এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ট্রান্সপোর্ট
ব্যাবিলন গ্রুপ

আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছরই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে শীতের প্রকোপ থাকে খুব বেশি। আর সেইজন্য উত্তরাঞ্চলকে বেছে নেয়া হয় এই কার্যক্রমের জন্য। আমার বাড়িও ঐ অঞ্চলেই। লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা আমার গ্রামের বাড়ি। পাশেই ভারতের সীমানা। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই এ এলাকায় শীত জেঁকে বসে। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কুয়াশা আর ঠান্ডা চলতে থাকে। শীতে খুব কষ্ট পায় গরিব, অসহায় মানুষগুলো। এদের কথা চিন্তা করেই আমি পরিচালকগণের কাছে আমার এলাকায় শীতবস্ত্র দেয়ার প্রস্তাব দেই। প্রস্তাব পাশ হয়।

বস্ত্র কেনা, এলাকার সাথে যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা করা, বিতরণের স্থান নির্বাচন সব প্রস্তুতি চলতে থাকে। কাজগুলো যে বেশ ঝামেলার এর আগে বুঝতে পারিনি। সব প্রস্তুতি শেষ করে আমরা ডিসেম্বরের (২০১৪) পাঁচ তারিখে যাত্রা শুরু করি। আমার সহকর্মী মাহমুদ ভাই, তুষার ভাই এবং আইটি ডিপার্টমেন্টের আসাদ সাহেব রয়েছেন আমার সাথে। কঠিন কাজও যে আনন্দের সাথে করা যায় এদের সাথে না আসলে বুঝতে পারতাম না। সারাক্ষণ গান, বাজনা আর মজা করতে করতে আমরা বিকেলের দিকে তিস্তার চরে বিশ-পঁচিশ মিনিটের বিরতি দিয়ে কিছু ছবি তুললাম সবাই মিলে। এখান থেকে আমাদের বাড়ি খুব বেশি দূরে না, আধা ঘন্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

আমার বাবা এ ক'দিন খুব কষ্ট করেছেন। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ, শীতবস্ত্রের বন্টন, বিতরণের স্থানগুলোর ডেকোরেশন থেকে শুরু করে সব প্রস্তুতি তিনি সেরে রেখেছেন। আমরা পৌঁছাবার পর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সাথে একটা মিটিং করে পুরো পরিকল্পনাটা সম্পর্কে একটা মত বিনিময় হলো। মিটিং শেষে খাওয়া-দাওয়া করে বাকি সদস্যদের নিয়ে আমি বের হলাম এলাকাটা ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য। আমার বাড়ি থেকে চারশ গজ দূরেই ভারতের সীমানা। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা সীমানাপ্রাচীরের পাশ ধরে সারি সারি লাইটের উজ্জ্বল আলো বাকি সদস্যদের মুগ্ধ করল। বাসায় ফিরে গিয়ে আরো কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে নাস্তা করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির পাশের বিতরণ কেন্দ্রের উদ্দেশে। পূর্ব সারোডুবি মাদ্রাসায় বস্ত্র বিতরণ কেন্দ্রে মানুষের লম্বা লাইন পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। শত শত অসহায় মানুষ সে লাইনে। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার, সাংবাদিকদের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে সারোডুবিতে বিতরণ শেষ হলো সুষ্ঠুভাবে।

ঐদিন বিকেলে বস্ত্র দেয়া হলো বড়খাতা ইউনিয়ন পরিষদে। বড়খাতা উপজেলার মান্যবর

টিএনও, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়্যারম্যান এবং মেম্বারগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মানুষের ঢল সামলাতে তুষার ভাই, মাহমুদ ভাই এবং আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শত পরিশ্রমের মধ্যেও শীতবস্ত্র পাওয়ার পর মানুষের চোখে-মুখের আনন্দ আমাদেরকেও আনন্দ দিয়েছিল।

পরেরদিন আমরা চলে যাই পাটগ্রাম উপজেলায়। উপজেলা পরিষদের সামনে আমরা বিতরণ কাজ সম্পন্ন করি। পাটগ্রাম উপজেলার টিএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর চেয়ারম্যান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত থেকে আমাদের বিতরণ কাজে সাহায্য করেন।

পাটগ্রামের বিতরণ শেষে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল এবং বুড়িমারী স্থলবন্দর ভ্রমণ আমাদের জন্য বাড়তি পাওনা ছিল। দুই দিনের বস্ত্র বিতরণ শেষে পরদিন খুব সকালে আমরা ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেই। শীতবস্ত্রের লাইনে দাঁড়ানো শত শত মলিন মুখ আমাদের চেতনায় বারবার ফিরে ফিরে আসে। এই ছোট্ট জীবনে অনেক কাজ করেছি আমি কিন্তু এত আনন্দ কখনো পাইনি। ফেরার পথে তিস্তা ব্যারেজে এসে ভোরবেলার সৌন্দর্য অন্যরকম মনে হলো। আমরা গাড়ি থেকে না নেমে পারলাম না। ঘন কুয়াশায় নদীটা ঢেকে আছে। আসাদ ভাই, তুষার ভাই ছবি তুলছে আর বলা নেই কওয়া নেই মাহমুদ ভাই নেমে পড়ল পানিতে। ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে আমরা থর থর কাঁপছি নদীর বাতাসে আর এই লোকটা পানিতে নেমে সাঁতরাচ্ছে, ডুব দিচ্ছে- এ এক আজব লোক। পরে শুনলাম বাংলাদেশের বেশির ভাগ বড় নদীতে মাহমুদ ভাই গোছল করেছেন। তিস্তায় গোছল করাটাও তার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। সুযোগ পেয়ে তাই হাতছাড়া করলেন না। আমার আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো। একরাশ সুন্দর স্মৃতি নিয়ে আমরা ঢাকার দিকে যাত্রা শুরু করলাম।

পরকালের যাত্রী

মোঃ তাজাম্মুল হোসাইন
সেলস এক্সিকিউটিভ
ট্রেন্ডজ, বসুন্ধরা সিটি

কখন যে কার মরণ ঘটে
কেউ বুঝতে পারে না,
মরণ সবার সঙ্গী সাথী
কারো পিছু ছাড়ে না।

জীবন হলো তাসের ঘর
আজ বাদে কাল থাকে না,
মরণ হলো চিরস্থায়ী
অনন্ত যার ঠিকানা।

অনন্তকাল করো পুঁজি
কিছুই সঙ্গে রেখো না,
জগতের এই ধনদৌলত
কিছুই সঙ্গী হবে না।

সময় থাকতে করো কাজ
সৎপথের ধ্যান-ধারণা,
জীবন থাকতে এমন কাজ আর
এমন পথটি ভুলো না।

যাবে তুমি আমার সাথে?

বাপ্পি মোড়ল
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

ওই পাহাড়ের স্বপ্নচূড়ায় চাঁদনি রাতে
মন ভেজাব চাঁদের আলোয়
শুধু তোমার হাতটি রেখো আমার হাতে।

তোমার চোখের নীল নীলিমায়
তোমার অই মধুর পরশে
মনপাখিটা হারাতে চায়।

রঙধনুর অই রঙিন ছোঁয়ায়
গহীন রাতে স্বপ্ন আঁকি,
তোমার গভীর নীরবতায়
সকল কিছু শূন্য একি!

মৌন তুমি জেগে ওঠো
সরব চটুল মিলন সুরে
সকল দুয়ার রইল খোলা
আমার নবীন হৃদয়পুরে।

কষ্ট

রাজিয়া সুলতানা
সিনিয়র অফিসার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

আমার জীবনের সব কষ্টগুলোকে
একত্রিত করে কষ্টের পাহাড় গড়েছি,
কষ্টগুলো একান্তই আমার-
তাই পাহাড়ে ওঠার কোনো সিঁড়ি নেই।

কষ্টগুলোকে যত্ন করে খুব
লোকালয় থেকে অনেক দূরে রেখেছি,
কারো দৃষ্টি যেন
তাকে আর না কাঁদায়।

অনেক সময় কষ্টকে ফাঁকি দিয়ে
দ্রুত হেঁটে চলে যাই
সুখের কাছে
তবু কি শান্তি পাই-
না পাওয়া যায়?

premiaflex

TOP BRAND
IN FLEXIBLE
PACKAGING
INDUSTRY

Premiaflex Plastic Limited

We are a growth-oriented company of flexible packaging manufacturer in Bangladesh, supplying quality printed flexible packaging material using Fully automated Roto Gravure Printing technologies for various forms of laminates with foil, film and paper. We have strategy and spare capacity to increase our business volumes further

Our job category is given below

- All kind of soap ,detergent and shampoo wrapper.
- All kind of candy, chutney, chanachur, biscuits, Saline and Salt. wrapper and packets.
- All kind of Fertilizer, Pesticide and seeds wrapper and Packets with 3-side sealing & std. up pouch with zipper.
- All kind of Ice cream, Mineral water, Drinks & Others label.
- All kind of Tea, Milk powder, Spices wrapper and packets.
- Blister foil for all kind of Pharmaceuticals.

Available Raw Materials

- PET, BOPP, Paper
- MPET, MBOPP, MCPP, ALU-FOIL
- LLDPE (Metalosine Grade)
- Shrink Film, Pearl Film
- Heat Sealble BOPPIPP
- Shrinkage LLDPE Film For Outer Pack
- Ink, Chemical, Adhesive & HMA

Our values

- Quality
- Customer Focus
- Fairness
- Transparency
- Continuous Improvement
- Innovation

SUSTAINABLE CERTIFICATION

ISO 9001:2008 Certificd

HACCP Certified

JAS-ANZ

IAF

LIC.2012-50323

Contact & Inquires

ACI Center, 245 Tejgaon I/A, Dhaka-1208

Tel: 8878603-10, Fax: 8878626

Mobile - 01714163046, 01713310414

E-mail anisur@aci-bd.com

RK Corporation

Your Trusted Trading Partner

Manufacturer's, Supplier's & Buyer's Local Agent

We deal with following items:

Paper & Board Packaging & Printing
Kraft Liner Paper, Medium Paper, Duplex Board (Grey & White Back)
Bristol Board/Solid Card, Swedish Board, Art Card

Poly Packaging & Printing
PP, LDPE, LLDPE, HDPE, Printing Ink,
Resealable Bag Sealing Tapes & Security Tapes

Metals (Ferrous & Non-Ferrous)
Hot Rolled Steel Sheet/Coil, Zinc Ingot

Yarns
Spandex

Others
EVA Resin, PVC resin, Tapioca Starch & Stitching Wire

Export Interests
Garments (different descriptions), Crust & Finished Leathers,
Potato, Processed Fish & Papadams (Papad)

Contact Address:
House: 60/1, Road: 12/A, Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, BANGLADESH
Phone: 9112560, 9112583, 9119778
E-mail: kabir.rkc@gmail.com & sadaf.rkc@gmail.com
Cell: 01552 388503, 01819 503939, 01798 860681 & 01842 860681

We congratulate
Babylon Group on
10th publication of
Babylon Kathokata.

YOUR GLOBAL
SOURCING
PARTNER

MAJOR PRODUCTS:

CORRUGATED MEDIUM PAPER, KRAFT/WHITE LINER PAPER, DUPLEX BOARD, IVORY BOARD (FBB), ART CARD (CHENMING), GLASSINE PAPER, TISSUE PAPER, SELF ADHESIVE STICKER PAPER, STARCH, BOPP FILM & BOPP TAPE, CELLOPHANE TAPE, ADHESIVE TAPE FOR POLY BAG, KRAFT TAPE, DIFFERENT SPECIALIZED TAPE, SATIN/PAPER RIBBON, LLDPE, LDPE, HDPE, PP, PVC RESIN, RAW COTTON, SEWING THREAD, RUBBER TREAD, POLYESTER TEXTURED YARN, NYLON YARN, ALL KINDS OF MACHINERY FOR TEXTILE/PRINTING & PACKAGING INDUSTRY !!! UPVC & CPVC PIPE FITTINGS, RESIN & EXTRUSION MACHINES !!! ANIMAL FEEDS !!! PHARMACEUTICAL INGREDIENTS !!! ETC.

MAHBUBA INTERNATIONAL TRADING CO.
SAN CLEMENTE-HOUSE # 539, FLOOR # 5, APT # A5, LANE # 11,
D O H S BARIDHARA, DHAKA-1206, BANGLADESH
TEL: +880 2 8410985 FAX: +880 2 8410986
CELL: +880 1711 535569
EMAIL: mitc@mitcbd.net, sohelsamad@yahoo.com
WEB: www.mitcbd.net

সম্পূর্ণ বিদেশী কাঁচামাল ও উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা বিশ্বমানের উন্নত মান সম্পন্ন লাইনার পেপার, মিডিয়াম পেপার, ক্রাফট পেপার, সিমপ্লেক্স বোর্ড পেপার প্রস্তুত করা হয়।

MEGHNA GROUP OF INDUSTRIES

তানভীর পেপার মিলস্ লিমিটেড

(মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

প্রধান কার্যালয়: ফ্রেশ ভিলা, বাড়ী নং ১৫, রোড নং ৩৪, গুলশান ০১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
ফোনঃ-৮৮০-২-৯৮৮৯৩০৬, ৯৮৮৯৪৯০, ৯৮৮৪৮৫৬, ৯৮৮৪৭৯১, ৯৮৮৪৭৭৩
ফ্যাক্সঃ- ৮৮০-২-৯৮৮৯৩৬১, ৯৮৮৪৮৯৬
ই-মেইলঃ- info@meghnagroup.biz, Web: www.meghnagroup.biz
ফ্যাক্টরীঃ- মেঘনা ঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

ব্যাবিলন কথকতার গৌরবময় দশ বছর-
আমরাও গর্বিত...

Daihan Ink Co., Ltd.

Moorim Paper Co., Ltd.

wings of change sehacorp Seha Corporation

CHENMING

DAIHAN Brand INK: Offest Printing Ink, Gravure Ink (Surface/Reverse Printing)
Pantone Basic Color etc.

PAPER & PAPER BOARD: Duplex Board, Art Card, Art Paper,
Cast Coated Paper, Cast Coated
Board, Tissue Paper, Self Adhesive Paper,
Kraft Liner Paper and Corrugated Medium Paper

HARBIS CONVERTING LTD.
(Paper Converting & Garments Accessories Manufacturer)

MB TRADERS
(INTERNATIONAL TRADING HOUSE)

House # 100/B (3rd Floor), Road # 6/A, Old DOHS, Banani, Dhaka-1206
Tel: +88-02-8712407, 8712492 Fax: +88-02-8712428 E-mail: mbtrade@dhaka.net

SYMANTEC
TECHNOLOGY LTD.

Expertise & Services:

- Fire Detection & Alarming System
- Fire Hydrant, Standpipe & Sprinkler System
- Fire Resistant Door
- Fire Suppression Aerosol System
- CCTV & Access Control System
- Lighting Protection System
- ETP, WTP System
- Boiler & Compressor System

Safety
Audit & Consultancy

Expertise & Services:

FIRE SAFETY AUDIT & CONSULTANCY
- Fire Detection & Protection System

ELECTRICAL SAFETY AUDIT & CONSULTANCY
- Single Line Diagram (SLD)
- Lighting Protection System (LPS)
- CCTV, PA System & PABX System

BUILDING SAFETY AUDIT & CONSULTANCY
- Detail Engineering Assessment (DEA)
- BNS Design

Valued Clients

www.symantecbd.com

Partners

Dhaka Office: **Symantec:** 20/5 (3rd Floor), West Panthapath, Dhanmondi, Dhaka- 1205, Bangladesh
SAC: 20/6 (3rd Floor), West Panthapath, Dhanmondi, Dhaka- 1216, Bangladesh
Phone: +88 02 9102554, HotLine: +88 0178 7690145, E-mail: info@symantecbd.com

Chittagong Office: 90, East high level road, Lalkham Bazar, Chittagong. Hot Line: +88 017877690146

R. M. Interlinings Ltd.

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

We are **specialize** in
MANUFACTURING
Oeko-Tex Standard
Woven & Non-woven Interlinings in Bangladesh.

- **World renowned latest technology associated Machinery**
- **Comprehensive range of interlinings for every kind of garment**
- **Full range backward linkage for bleaching & Dying**
- **Specialist in product customization**
- **Skilled Research & Development team**
- **German Technical Know - how**

AJA REGISTRARS ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0059

R.M. Interlinings Ltd.
A concern of R.M. Group of Industries

Corporate Office :
R.M. Centre, 119 Sheikh Mujib Road, Agrabad, Chittagong – 4100, Bangladesh.
Tel : +880 31 2520741, 2520743, 718669

Chittagong Factory :
Plot No. : 36, Sector No. : 4, CEPZ, Chittagong- 4223, Bangladesh.
Tel : +88 031 740083, 741643

Dhaka Factory :
Plot No. : 281, DEPZ(Extension Area), Ganakbari, Savar, Dhaka, Bangladesh.
Tel : +880 02 7788529

Dhaka Office :
Plot : 1097 , Road No. : 6/A, Mirpur, DOHS, Dhaka-1216.

www.rmilbd.com

BROTHER'S
TECHNOLOGY SYSTEM

Rely on our comprehensive security solutions.

One-stop source for PABX, CCTV, PA System, and access control.

OUR CUSTOMERS

www. btsbd.info

BABYLON

FSIB ISLAMI BANK

SQUARE TEXTILES LTD.

National Bank Limited

Shahjalal Islami Bank

ANANTA

envoy textiles ltd

VIYELLATEX

Many More 300+

Cha-94/5 Uttar Badda,
Hazi Market (3rd Floor),
Badda, Gulshan, Dhaka-1212.

T : 88-02-58815960
88-02-9856078
M: +8801726246020
+8801715627691

info@btsbd.info
masud@btsbd.info

design by: mfizur@yahoo.com
+88 01717074159

মায়ের আঁচল

মোঃ তরিকুল ইসলাম
সুপারভাইজার, ফিনিশিং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আমি এখন যে গল্পটি লিখতে বসেছি সেটি একজন দুঃখিনি মায়ের জীবনযুদ্ধ নিয়ে। এই গল্পটি হয়তো অনেক পাঠকের ভালো নাও লাগতে পারে। সেজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিন্তু পাঠক ভাই ও বোনদের কাছে আমার এইটুকু অনুরোধ যে, আপনারা পুরো গল্প না পড়ে কোনো মন্তব্য করবেন না।

গল্পটির শুরুতেই যদি এই দুঃখিনি মায়ের পরিচয় দিতে হয় তবে বলা যায় যে, চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার ছোট্ট একটি গ্রাম- শেখটোলায় ছিল তার বাস। তার ছোট্ট গৃহে ছিল স্বামী-সন্তানসহ মোট পাঁচজন সদস্যের বাস। স্বামী একজন রাজমিস্ত্রী। তার দৈনিক যা আয় ছিল তা দিয়ে নুন আনতে পান্তা ফুরাত।

তাদের এই করুণ অবস্থা তার স্বামী সহ্য করতে না পারায় সে ঠিক করল যে, সে শহরে গিয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করবে। কিন্তু এদিকে শহরে আসার মতো তার সেই অর্থটুকুও ছিল না।

কিন্তু এই অর্থ পাবার আশা ছেড়ে সে যখন তার স্ত্রীর কাছে যায়, ঠিক তখনই তার পূণ্যবতী স্ত্রী তাকে এই অর্থ পাবার আশা দেয়। আর এই আশাটি ছিল তার স্ত্রীর একমাত্র শেষ সম্বল ও সবচেয়ে প্রিয় একটি সম্পদ। সেটি হলো একটি ছাগল। তার নাম ছিল ময়না। বলতে গেলে ছাগলটিও তার পরিবারের একটি সদস্য ছিল।

কিন্তু তারপরেও সেই পুণ্যবতী স্ত্রী বুকে পাথর বেঁধে অতি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে হলেও তার সংসারের উন্নতির জন্য সে তার শেষ সম্বল এই ছাগলটিকে বিক্রি করে দিল। তখন এই বাছুর আকৃতির ছাগলটির দাম পেল মাত্র ৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা। তখন তার স্বামী খুশিমনে ঘরে এসে তার স্ত্রীকে বলল, 'শুনেছ, হারগে বকরিটি পাঁচশ পঞ্চাশ টাকায় বেইচাছি; সে তার স্ত্রীর হাতে মাত্র ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা দিয়ে সে ঢাকায় যাবার জন্য রওনা হবার সময় বলল, 'হামি তোমাকে এই পঞ্চাশ টাকা দিলাম, ঢাকায় গিয়ে রোজগার করে ১০ দিন পর হামি টাকা দিয়া পাঠাব। এই কয়টা দিন তুমি কষ্ট কইরা চইলো।'

তাই বলে কি এই মায়ের দুঃখ ঘুচে গেল, কিন্তু না। আসলে আটকপালে লোকের জীবনে কি সুখ আসে, ঠিক তেমনি হলো এই দুঃখিনি মায়ের। কোথায় গেল সেই ১০ দিনের কথা। দশ দিন গেল, বিশ দিন গেল। -এভাবে কেটে গেল একটি মাস।

যাবার সময় তার স্বামী তাকে দিয়ে গিয়েছিল মাত্র পঞ্চাশটি টাকা। এতে না হয় বড়জোর

তার দুই দিনই গেল। কিন্তু বাকি দিন কিভাবে কাটল? হ্যাঁ কেটেছে তবে তা ধার করে। এই যেমন পাশের বাড়ির মন্টুর মায়ের থেকে এক কেজি চাল ধার করে, করিমন খালার কাছ থেকে এক শিশি তেল নিয়ে। দোকান বাকি করে। কিন্তু যখন একমাস কেটে গেল, তখন আর কেউ তাকে ধার দেয় না। দেবেই বা কেন, কোন ভরসায় দেবে? তার স্বামীর যে কোন খবর নেই।

আপনারা হয়তো বলবেন যে, তার কি কোন নিকট আত্মীয় ছিল না। হ্যাঁ ছিল। কিন্তু বাঙালীর আসল পরিচয় তো পাওয়া যায় বিপদে। তাই বিপদেই এ সকল নিকট আত্মীয় তাদের আসল পরিচয় দিল তাদের স্বভাবমতোই। তাহলে কি এই মায়ের আর কোনো উপায় নেই? হ্যাঁ আছে। আর এই উপায় বের করে এই বুদ্ধিমতি মা। সে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে ধান সিদ্ধ করে এবং তার বড় ছেলেকে বাদাম বিক্রী করতে পাঠায়। তার অন্য দুই সন্তানের বয়স ছিল ৬ বছর ও ৩ বছর। আর বড় ছেলের ছিল ৯ বছর।

সেই মা এতই কষ্ট করত যে, সে একমন ধান সিদ্ধ করে মাত্র চার কেজি চাল পেত এবং বাকিটা ধানের মালিকের। আর তখন এই ধানের দাম ছিল মন প্রতি ১২০-১৫০ টাকা। যেখানে একটা পরিবারের দৈনিক খরচ ছিল অন্তত ৩০-৪০ টাকা। তাই বাকি টাকা আয় করত তার বড় ছেলে বাদাম বিক্রি করে।

এভাবে কেটে গেল প্রায় ৪ থেকে ৫ মাস। কিন্তু তখনও তার স্বামীর কোন খবর নেই। এরপর আসলো পবিত্র রমজান মাস। তখন কি আর বাদাম বিক্রি হয়। না, হয় না। তাই সে ঠিক করল এবার বাদাম বিক্রি বাদ দিয়ে বিক্রি করবে পিয়াজু। আর যেই কথা সেই কাজ। এদিকে বড় ছেলে সংসারের হাল ধরতে গিয়ে বাদ দিল তার লেখাপড়া। এই বড় ছেলেও করেছে তার মায়ের পাশাপাশি অনেক কষ্ট। পরনে ছিল তার ছেঁড়া ও নোংরা জামাকাপড় এবং পায়ে ছিল না জুতা। এই গরমে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে তার পা হয়ে গিয়েছে শক্ত পাথর, আর এদিকে শত কষ্টের মাঝেও সে রেখেছে রোজা।

এরপর আসলো পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। এ উপলক্ষ্যে ঈদের আগেই নিয়ম অনুযায়ী দিতে হয় ফেতরার টাকা সম্বলহীনদের। তাই গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকেরা ঠিক করে এই মাকে তারা ফেতরার টাকা দিবে। কেননা তারা ধরে নিয়েছিল যে, তার স্বামী আর বেঁচে নেই। কিন্তু এই মা বলেন, 'হামার স্বামী মরেনি গে, তাই আমি এই ফেতরার টাকা নিব না, হামি জানি যে, সে বেঁচে আছে, সে আসবেই।'

আর এভাবে কেটে গেল ঈদ-উল-ফিতর। বড় ছেলে আবার শুরু করল বাদাম বিক্রী। সে যখন মাঠে গিয়ে বাদাম বিক্রি করত, তখন সে দেখত তার সমবয়সীরা মাঠে খেলছে। তার মন চাইত খেলতে। কিন্তু যখন সে তার পরিবারের কথা মনে করত তখন সে আর খেলতে

যেত না।

এভাবেই তাদের চলছিল জীবন। আসলো কুরবানীর ঈদ। এ সময় ঘটল এক বিস্ময়ের ঘটনা। পূর্ণ হলো পুণ্যবতীর মনের আশা। ঈদের আগের দিন রাতে আসলো তার স্বামী। রাত প্রায় তিনটা। বড় ছেলের ঘুম ভাঙল তার মায়ের কান্নার আওয়াজ শুনে। সে দেখল তার বাবা ঘরে চৌকিতে বসে আছে। তার বাবার প্রতি তার অনেক রাগ হয়। বাবা যখন তাকে তার বুকে টেনে নিল তখন তার রাগ ভেঙ্গে গেল। কি করবে শত হলেও তার বাবা তো।

আসলো তাদের সুখের দিন। আর এরপর থেকে তাদের দিন যায় সুখে-শান্তিতে।

আমরা এই গল্পের সাথে যদি বাস্তব জীবনের মিল খুঁজি তবে দেখা যাবে যে, এখানে মায়ের বদলে যদি বাবা থাকত তবে কবেই বাবা চলে যেত। কিন্তু এটা যে মা, তাই সে শত ঝড়-ঝঞ্জার মধ্যেও তার আঁচল দিয়ে দিয়ে আগলে রেখেছিল তার সন্তানদের। তাই এই মায়ের প্রতি আমার রইল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাই এই মায়ের প্রতি উৎসর্গ করে আমার একটি কবিতা নিম্নে দেয়া হলো-

মাগো তুমি কেমন করে,
এত কষ্ট করে
সন্তানকে আগলে রাখো-
রোদ বৃষ্টি ঝড়ে।
অসুখ হলে মাগো তুমি
জাগো সারারাত।
পরশ বুলিয়ে দেও মাগো-
তোমার স্নেহের হাত।
কষ্ট কাকে বলে মাগো
বুঝতে দেওনি কোনোদিন।
গায়ের চামড়া কেটেও মাগো
শোধ হবে না তোমার ঋণ।

স্বাধীনতা

মোঃ আবুল কালাম (আপন)
প্রাক্তন ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আজ আমাদের এই যে স্বাধীন পথ চলা,
সেখানে ছিল কত বাধা কথায় যায় না বলা।
আজকে আমরা সবাই স্বাধীন নেই কোনো বন্ধন,
অনেক ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন এই জীবন।

কতযুগ ছিল পরাধীন দেশ, শিকল পরা এ পাখি,
পরের গোলাম ছিলাম আমরা বন্ধ করে দু'আখি।
শাসন-শোষণে পিষ্ট ছিলাম, ছিল না তৃপ্ত শ্বাস,
পঁচিশের কালো রাত্রিতে ওরা করল এদেশ গ্রাস।

নিদ্রামগ্ন বাঙালি মুহূর্তে হলো শেষ,
লক্ষ প্রাণের ঘৃনার আগুনে জ্বলে ওঠে সারাদেশ।
ভয়াল রাতের বিভীষিকা ছিঁড়ে কোটি জনতার প্রাণ,
একাত্মা হলো শত্রু হননে ছড়াল আলোর গান।

এমনি করে পরাধীন দেশে দীর্ঘ নয়টি মাস,
সশস্ত্র রণে বাঙালি লিখল রক্তরাঙা ইতিহাস।
পদাঘাতে ভেঙে পরাধীনতার কারাগার,
মুক্তিপাগল বাঙালি উড়াল, ঝান্ডা স্বাধীনতার।

মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ

ডাঃ মোঃ মোজাহারুল হক
মেডিক্যাল অফিসার
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার কমপ্লেক্স

বিজয় দিবসের ৪৪ বছর অতিক্রম হতে চলল। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা স্বাধীনতা যুদ্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তা এ প্রজন্মের ছাত্র ও ডাক্তারদের জানা দরকার। বৃটিশ বিতাড়িত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান নামে আমরা একটা ভূখন্ড পেয়েছিলাম। এই ভূখন্ডে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার পায়তারা চালিয়েছিল শাসকরা, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ৫২-র ভাষা আন্দোলন।

৫৪-র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী জয়, ৬২-র শিক্ষা কমিশন বাতিল আন্দোলন, ৬৬-র ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর এগার দফা আন্দোলন এবং গণঅভ্যুত্থান অতঃপর ৭০ এর নির্বাচন এবং আওয়ামীলীগের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন সবই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব। সামরিক জান্তা ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহানা শুরু করতেই আন্দোলনের সূচনা হয়। সে আন্দোলনের নেতৃত্বের অংশীদার রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও ছিল। ১লা মার্চ ১৯৭১ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইএনটি বহির্বিভাগে মোঃ আব্দুল জলিলকে পাঞ্জাবী এক ক্যাপ্টেন বাস্টার্ড বলায় তাকে উত্তম মধ্যম দেয়া হয়। সেখান থেকেই রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ২রা মার্চ প্রস্তুতি পর্ব, ৩রা মার্চ ১৯৭১ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ থেকে মোঃ মিজানুর রহমান (পরবর্তীকালে প্রিন্সিপাল, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ), মোঃ সিরাজুল হক (তৎকালীন সহ সভাপতি, রামেকসু), শাহ আব্দুল খালেক (তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক, রামেকসু), মোঃ আব্দুল করিম, সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, রাজশাহী জেলা শাখা) মোঃ কাজী নুরুন্নবী সভাপতি রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ শাখা প্রমুখের নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল বের হয় রাজশাহী শহরে। সাহেব বাজার থেকে শুরু হয়ে মাদ্রাসা মাঠ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তা জুড়ে লাঠি নিয়ে মিছিল বের হয়। শহরবাসী সেই মিছিলে যোগদান করেন। অতবড় মিছিল রাজশাহী শহরে তখন পর্যন্ত আর কোনোদিন হয়নি। উল্লেখ্য এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন ছাত্র নেতারা।

৩রা মার্চ ১৯৭১ রাজশাহীতে প্রথম গুলি হয় টিএন্ডটির কাছে সকাল সাড়ে দশটায়। একজন মারা যান এবং গুলিবিদ্ধ হন অনেকে। আহতদের জরুরীভাবে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অপারেশন করা হয়। বিকাল পাঁচটায় ভুবনমোহন পার্কে জনসভা হয়। সে সময় টিএন্ডটির দু'পাশ (মালোপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির সম্মুখে) সেনাবাহিনী কর্ডন করে রাখে। আমি এবং বন্ধু আনোয়ার জনসভা শেষে এক চা দোকানে চা খাচ্ছি। সন্ধ্যার সময় আবার গুলির শব্দ সদর হাসপাতালের মোড় থেকে ভেসে এল। তারপর ৪, ৫ এবং ৬ই মার্চের মধ্যে আমরা হোস্টেল ত্যাগ করতে শুরু করলাম। অনেকেই সে সময় ঝুঁকি নিয়ে হোস্টেলে অবস্থান করছিলেন। ৭ই মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হতে দিক নির্দেশনাপূর্ণ ভাষণ দেন। সেদিন বঙ্গবন্ধু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২৫ শে মার্চ ১৯৭১, দিবাগত রাত ১টার পর বঙ্গবন্ধু বন্দী হওয়ার পূর্বক্ষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

আমরা রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা জরুরি বলে মনে করি। যাদের নাম মনে পড়ছে তাদের মধ্যে ডাঃ মিজানুর রহমান, ডাঃ শাহ আব্দুল খালেক, ডাঃ আব্দুল করিম, ডাঃ আব্দুল মান্নান, ডাঃ মাহবুবুল আলম বীর প্রতীক, ডাঃ জিল্লুর রহমান, ডাঃ এ কে এম ফজলুল হক, ডাঃ সিরাজুল হক, ডাঃ সরওয়ার্দী, ডাঃ তোফাজ্জল, ডাঃ আফজাল, ডাঃ ফারুক, ডাঃ শফিউল আলম বাদশা, ডাঃ বাচ্চু প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে।

এই মুহূর্তে যার কথা বেশি মনে পড়ছে তিনি হচ্ছেন শহীদ কাজী নুরুন্নবী, যার রচিত এবং নির্দেশিত অনেক গীতিনাট্য এই রাজশাহী মেডিক্যালে প্রদর্শিত হয়েছে।

আমি আসামের হাফলং ট্রেনিং সেন্টার হতে ট্রেনিং নিয়ে জলপাইগুড়িতে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অবস্থান করছি। পাঁচ/ সাত দিনের মধ্যেই আমাদের দলকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই সময় কাজী নুরুন্নবী ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা। সে দেখাই তার সঙ্গে শেষ দেখা। সেদিন নুরুন্নবী ভাই আমাকে বলেছিলেন- তুমি বাংলাদেশের ভিতরে না গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে হাসপাতালগুলোতে কাজ করো। আমি প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম, না ভাই, আমি ভেতরে যাব এবং যুদ্ধ করব। তার চেয়ে বরং আপনি লিডার আপনি থাকেন। সেদিন নুরুন্নবী ভাই বলেছিলেন, আমিও ভেতরে যাব। আমি রোগা পাতলা মানুষ, আমার বগলের ফাঁক দিয়ে গুলি বের হয়ে যাবে।

তারপর একদিন নুরুন্নবী ভাই পোরশা বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশের ভিতর প্রবেশ করেন। পোরশা নিয়ামতপুর, তানোর হয়ে তিনি রাজশাহী এসেছিলেন। যদিও কনসিভ ড্রেসে উনি

ছিলেন, তথাপি আলবদররা তাকে চিনতে পারে এবং ধরে নিয়ে যায়। আর কোনোদিন নুরুন্নবী ভাই ফিরে আসেননি এবং ফিরে আসবেন না। তাঁর যে দুটি ছবি একটি কাজী নুরুন্নবী ছাত্রাবাসের ৩৯নং কক্ষে এবং অপরটি ছাত্র সংসদ রুমে ছিল সেই ছবি দু'টো কোথায় এখন অবস্থান করছে তা জানি না।

আমরা আস্তে আস্তে ইতিহাস ভুলে যেতে বসেছি। আরও দু'জন শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আলমগীর এবং শহীদ আবুল আমজাদ। তাঁদের নামানুসারে দুইটি ছাত্রাবাস ছিল যার একটি সিভিল সার্জন অফিস হয়েছে। অপরটি কি হবে তা জানি না। নতুন প্রজন্মের কাছে দাবী রইল তিন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিস্তম্ভ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে স্থাপন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুত তারা যেন করেন।

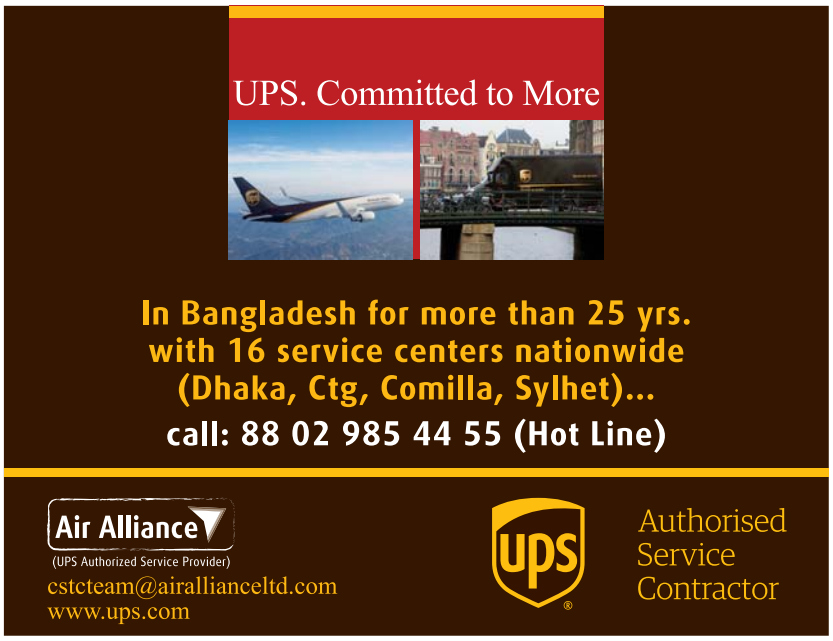

স্বপ্নের জাল

উজ্জল মাহমুদ
সিনিয়র অফিসার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

স্বপ্নবাজ আমি বুঝতে শেখার পর থেকেই স্বপ্নের জাল বুনি। থরে থরে সাজানো স্বপ্নগুলো মুছে মুছে রাখি শেল্‌ফে রাখা শো-পিসগুলোর মতো। কেননা এগুলো শুধু স্বপ্ন নয়, এগুলো আমার অতি যত্নে লালিত ভালোবাসার সম্পদ। এগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে।

স্বপ্ন দেখি নিজেকে নিয়ে, সমাজকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে। স্বাধীনতার দীর্ঘজীবনে কী পেয়েছি আমরা? উন্নতির কোন পর্যায়ে আসতে পেরেছি আমরা? আর আমাদের তৎকালীন সমপর্যায়ের দেশগুলোর অবস্থান এখন কোথায়? উন্নতি জিনিসটা যেন পাটিগণিতের তেল মাখানো বাঁশ, আর আমরা সেই বানর, যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁশের উপরের দিকে উঠতে পারে না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ইচ্ছে করে চিৎকার করে বলি-

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে...

সঠিক নেতৃত্বের অভাব এবং গলাবাজি রাজনীতির প্রভাব আমাদের উন্নয়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। এদেশে নির্বাচনে বিজয়ী দলের ভাব অনেকটা এ রকম, যে যায় লংকা সেই হনুমান। আর পরাজিত দলের বক্তব্য-সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে, ভোট জালিয়াতি হয়েছে। আন্দোলন, হরতাল আর ভাংচুর করো। অবশেষে জনগণকে হতে হয় বলির পাঠা।

রাজনৈতিক এই অস্থিরতাকে তুলনা করা চলে ধুমপানের সাথে। ধুমপান যেমন মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত করে। রাজনৈতিক অস্থিরতাও তেমনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে একটা দেশের টপ টু বটম সবগুলো খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমি স্বপ্ন দেখি আমার দেশের এই পরিবেশটা বদলের। যেখানে বিরোধী দলগুলো পরস্পরের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেবে। প্রতিহিংসার নয়, ক্ষমাসুন্দর ভালোবাসার হাত; সাহায্যের হাত, সহানুভূতির হাত।

বিদ্যা সুখের দিশারী, দুঃখের ঔষধ, বন্ধুমহলে অহংকার আর শত্রুর মাঝে ঢাল। অথচ আমার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ব্যাপক সমস্যা বিদ্যমান। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বুঝাতে হবে- নকল করে পাশ করার চেয়ে ফেল করা অনেক সম্মানের। ওদের মগজে ঢুকিয়ে দিতে হবে, সফলতার চেয়ে সততার ভ্যালু অনেক বেশি। শিক্ষা এখন প্রাইভেট কোচিং নির্ভর। দু'একজন ভালো শিক্ষক যে নেই এমন না। তবে শিক্ষকরা এখন ক্লাসে হাতে রেখে পড়ায়। ফলশ্রুতিতে ক্লাসের বাইরে স্যারের বাসায় কিংবা কোচিং সেন্টারে স্যারের সাথে

দেখা করতে হয়। দেখা করারও বিভিন্ন ধরন। মাসে বড়জোর ৮ থেকে ১২ দিন। আর এ জন্য বড় অংকের একটা এমাউন্টতো গুনতেই হয়। এ ছাড়া এখানে ঘন ঘন বই, সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়। তাছাড়া সেশন জটের সমস্যাতো জোঁকের মতো লেগেই আছে। আমরা জানি শিক্ষা শুধু ডিগ্রি অর্জন নয়, শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র সনদপত্র লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা মানুষকে যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ বানায়। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে যুগোপযোগী ও মানসম্মত।

প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার বলিষ্ঠ পদচারণা। স্কুল পর্যায় থেকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে নাগরিকের সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ক বই, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বিষয়ক বই। গুরুত্ব দিতে হবে বাস্তবমূখী প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষায়। সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষা ব্যবস্থার কলকাঠি যারা নাড়েন, শিক্ষা ব্যবস্থার অস্থিরতায় তাদের কোনো সমস্যা নেই। কারণ খোঁজ নিলে হয়তোবা দেখা যাবে তাদের উত্তরসূরিরা পড়াশোনা করছে বাইরের কোনো উন্নত দেশে, উন্নত পরিবেশে। আমার দেশের এই ধারা বদলের স্বপ্ন দেখি আমি। সৃষ্টি হবে ভিন্ন ধারার, ভিন্ন দিনের। যেখানে শিক্ষকরা হবে প্রকৃতভাবেই জাতি গড়ার কারিগর। আর শিক্ষা ব্যবস্থার কলকাঠি যারা নাড়েন, তারাও অর্জন করবেন অনুসরণীয় মনোভাব, ব্যক্তিত্ব।

দুর্নীতি আমাদের সমাজের একটি ঘুনপোকা। বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর বিস্তার। অক্টোপাসের মতো আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতি। এর বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। ধর্মীয় চেতনায় নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে নীতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যেখান থেকে দুর্নীতি থাকবে বহুদূরে। দুর্নীতির ব্যাপারে প্রশাসনকে অনেক বেশি কঠোর হতে হবে। প্রমাণসাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অপরাধী পুলিশ হোক আর পিয়ন হোক, শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় আমাদের অনেক ভদ্র, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত হর্তাকর্তারাও দুর্নীতির ঘোলা জল পেট পুরে পান করে।

জবাবদিহিতা হচ্ছে দুর্নীতি দূর করার অন্যতম প্রধান উপায়। প্রতিটি প্রার্থীকে চাকুরির শুরুতে এবং শেষে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তথ্যচিত্র দাখিল করার নিয়ম করা উচিত। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচনে অশিক্ষিত, দরিদ্র, বেকার এরূপ কাউকে মনোনয়ন দেয়া ঠিক নয়। কেননা পরবর্তীতে এরা দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতাকে উপরে উঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে।

আমার দেশের আরেকটি বড় সমস্যা দারিদ্র। দারিদ্রের বিরুদ্ধে আমাদের কৌশলী হতে হবে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত এবং ফিত্রা আদায় এবং যথাযথ বন্টন নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের আরো বেশি পরিশ্রমী হতে হবে। আমাদের সমস্যা হলো, পড়ি কিন্তু শিখি

না। সেই ছোট্ট বয়সে পড়েছি-

"Early to bed
early to rise
Makes a man healthy
wealthy and wise"

আর বাস্তবে কী? রাত ১২-১টা পর্যন্ত আড্ডা দেই, টিভি দেখি, আরও বিভিন্নভাবে সময় পার করি। এরপর ঘুমাই সকাল ৯-১০টা পর্যন্ত। আচ্ছা, যদি এমন হতো ফজরের নামাজের পর কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া এবং কর্মস্থলে পৌঁছানো বাবদ যে সময় লাগবে তার পরেই অর্থাৎ ভোরেই অফিস-আদালত, কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে। আমাদের দেশে রোজার মাসে কাজকর্ম যেভাবে চলে অনেকটা সেই ধাঁচে। তাহলে দেখা যাবে ছুটি হয়ে যাবে ২-৩টায়। এরপরের লম্বা সময়টা অনেকেই শুধু শুধু বসে পার করবেন না। হয়তো চেষ্টা করবেন বাড়তি আয়ের, অংশগ্রহণ করবেন সৃষ্টিশীল কাজে, গোছগাছ করতে পারবেন নিজেকে, তদারকি করতে পারবেন সন্তানের পড়াশোনার, সময় দিতে পারবেন প্রিয়জনকে।

প্রথমদিকে হয়তো একটু সমস্যা মনে হবে, কিন্তু পরবর্তীতে ঠিক হয়ে যাবে। কেননা আমরা বিশ্বাস করি অভ্যাস মানুষের দাস। এতে সময়ের সদ্ব্যবহার হবে, দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং অর্থনীতির চাকা আরও গতিশীল হবে। এ ছাড়া স্ত্রী-সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারায় আমাদের পারিবারিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। সর্বোপরি জাতিগতভাবে উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

চামড়াশিল্প, চিংড়ি ও মৎসখাত, ঔষধশিল্প, তৈরি পোশাকশিল্প ইত্যাদি প্রত্যেকটা শিল্পে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান করতে হবে।

দুর্ভাগ্যকে মেনে নেয় দুর্বলেরা। আমরা দুর্বল নই; আমরা পারি। বিশ্বের বুকে আমাদের স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে, পতাকা রয়েছে। আমরা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। আমাদের ভাষা দিবস আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি; গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস শুনেছি। আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের বুকে ভর করে সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনা করব।

দূর হতেই

আব্দুল কাদের
প্রাক্তন ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

দূর হতেই তোরে বাসব ভালো
কাছে ডাকব নারে,
হৃদয় দিয়ে বাসিস ভালো
তোর ভালো লাগে যারে।

দূর হতেই তোরে দেখে যাব
নয়ন দু'টি ভরে,
না চাইলে তুই ক্যামনে আমি
চাইব আপন করে।

দূর হতেই তোর শুনব গালি
ঘৃনা করব নারে,
তবে মনের কথা বলিস খুলে
ভালোবাসিস যারে।

দূর হতেই তোর দেখব হাসি
চাঁদমাখা ঐ মুখে,
রইব পাশে সারাজীবন
তোরই দুঃখ-সুখে।

মাটির গৃহে পরীরে তুই
আমি মাটির ছেলে,
কেমন করে চাইব তোরে
ভাগ্যে যদি মেলে।

দূর হতেই তোর করে যাব-
শুভ কামনা,
করি আশিষ হোক যে পূরণ
তোর মনের বাসনা।

ব্যাবিলন কথকতার দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে
রইল আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন

PIONEER CHEMICAL

(A trusted House of Textile Screen Printing Chemical)
House# 46, Baisteky, Mirpur-13, Dhaka-1216.
Cell: 01714-109060, E-mail: pioneer.chemicalbd@gmail.com

We are the Importer of Textile Screen Printing Chemical

Our Product Range

- White Paste
- Clear Paste
- Foil Paste
- Foaming Paste
- Crack Paste
- Nylon Paste
- Glitter Paste
- Pigment White
- Table Gum
- Oxal
- Binder
- Plastisol

And All Other Paste Items

We Offer

- Technical Data Sheet (TDS)
- Material Safety Data Sheet (MSDS)
- Chemical Compliance Certificate
- Oeko-tex Standard 100 Class-1 Type Printing Chemical
- Sales And Technical Support
- Delivery for Specific Quantity

ব্যাবিলন কথকতার দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে
রইল আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন

Fairlon

FAIRLON AGENCY LTD.

Your trusted partner of Garments Machinery

Our Concern

Fairlon Garments Ltd.
Pancha Ratna (Pvt.) Ltd.
Eco Machines International Ltd.

Corporate Head Office:
28,Dilkusha C/A 13th Floor
Dhaka 1000,Bangladesh.
Email:fairlon@citech.net
Tel:+88 02 9564082,9565645
Fax: 02 9564085

Chittagong Branch
Karim Plaza (4th floor),
Commerse College Hostel Road,
West maderbari,agrabar Chittagong.
E-mail: fairlonctg@colbd.com
Tel: +88 31 713771

brother. at your side
PEGASUS
Ngai Shing
HASHIMA
KM CLOTH CUTTING MACHINE
A-S-S Automated Sewing Systems Made in Germany

We congratulate Babylon Group on 10th publication of Babylon Kathokata.

Sewing machine needles for:

industrial use/home use
industry embroidery/lace
dial linking/others

Knitting machine needles for:

circular knitting
transfer knitting

Felting needles for nonwovens:

car decorative materials/geotextiles
filters/artificial leather/others

ORGAN NEEDLE CO., LTD.

Sole Agent

General Business Co.

Dhaka, Bangladesh
Tel : 880-2-8321372~3, Fax : 880-2-8317199
Mob : 01711-610202, 01817-147059
Email : general@aitlbd.net

We congratulate Babylon Group on 10th publication of Babylon Kathokata

SGS IS THE WORLD'S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY.

WHEN YOU NEED TO BE SURE

SGS

sgs.com ; sgs.bangladesh@sgs.com

Softy
স্যানিটারি ন্যাপকিন
রেগুলার প্যাক (প্যান্টি সিস্টেম)
প্যাড ১০
রেগুলার প্যাক
পাওয়া যাচ্ছে যে সব সাইজে:
Softy
আইটেম | ধরন | প্যাক সাইজ | প্যান্টি | বেল্ট
রেগুলার | সফ্‌টি রেগুলার | ০৫ প্যাড | | ✓
রেগুলার | সফ্‌টি রেগুলার | ১০ প্যাড | ✓ | ✓
Softy
স্যানিটারি ন্যাপকিন
রেগুলার প্যাক (প্যান্টি সিস্টেম)
Softy
স্যানিটারি ন্যাপকিন
রেগুলার প্যাক (প্যান্টি সিস্টেম)
সহনীয় ডিজাইন
প্যাডটি বিশেষভাবে তৈরি যাতে সহজে ভাঁজ পড়ে না এবং কুঁচকায় না।
বিস্তৃত পরিসীমা
যা ভালভাবে আবদ্ধ রাখে।
শক্তিশালী শোষণ ক্ষমতা
অত্যধিক আরামের জন্য মাঝখানে বিশেষ শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন উপাদান বিদ্যমান।
সংরক্ষিত সীমা/এলাকা
প্যাডটি দাগমুক্ত এবং নির্দিষ্ট আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে।
আপনার সর্বোচ্চ সুরক্ষা আর স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তায় Softy
উন্নতমানের জীবাণুমুক্ত পাল্প প্যাডের গভীরে আর্দ্রতা ধরে রাখে, যা আপনাকে সারাদিন রাখবে শুকনো, পরিষ্কার আর সতেজ। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত। সর্বোপরি এটি আপনাকে দেবে সর্বোচ্চ আরাম আর হালকা অনুভূতি।
গ্রামীণ ব্যাবিলন একটি সামাজিক ব্যাবসা। সফ্‌টি গ্রামীণ ব্যাবিলনের একটি জনকল্যাণমূখী উদ্যোগ। গ্রামের সাধারণ নারী ও পোশাক শিল্পের নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বল্পমূল্যে সরবরাহের জন্য সফ্‌টি তৈরি করা হয়েছে।
ব্যবহার বিধি: প্যাডের সাথে আঠাযুক্ত কাগজ টেনে তুলুন এবং ন্যাপকিনটি ভালভাবে প্যান্টির উপর চাপ দিয়ে লাগান।
প্রস্তুতকারক: গ্রামীণ ব্যাবিলন
গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক
সারাবো, কাশিমপুর, গাজীপুর।
বর্জন বিধি: ন্যাপকিনটি ব্যবহার শেষে গুটিয়ে অথবা ভাঁজ করে কাগজে মুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলুন।

We congratulate Babylon Group on 10th publication of Babylon Kathokata

GETCO Online Ltd

GETCO ONLIN LIMITED (HRC TECHNOLOGIES LIMITED), A CONCERN OF GETCO GROUP IS ONE OF THE FASTEST GROWING INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY (ICT) BASED COMPANIES IN BANGLADESH PROVIDING DIFFERENT TYPES OF SERVICES AND HAS BEEN INVOLVED IN BUSINESS OF 'ICT' IN BANGLADESH WITH GREAT CLIENT SATISFACTION.

Key Services of GETCO Online

- High Speed Broadband Internet Connectivity
- High Speed Intranet (Data) Connectivity
- IP Telephony Service & Solutions
  (IP Phone, PC Dialer, Mobile Dialer, IP PBX, Hosted IP PBX, IP Video Phone, Video PC Dialer & Many other customized solution.)
- Customized Video Conferencing Solution
- IP Surveillance & IP Camera Solution
- Co-location and many more..

We put customer first
We are professional
We provide the best service
We respect each other
We work as one team
We are committed to
Continuous improvement...

GETCO
GETCO ONLINE LTD.

CORPORATE OFFICE
Rupayun Shelford
(Flat C8, Level9) Block B
Mirpur Road, Shyamoli
Dhaka 1207, Bangladesh
Tel: 09613-333-333

Hotline: 09613-141516
Email:info@hrctech.net
Web:www.hrctech.net

We congratulate Babylon Group on 10th publication of Babylon Kathokata.

SHIRAT CHEMICALS LIMITED

An Enterprise Of Swiss Tex Group

A PROJECT OF

QUALITY SODIUM SILICATE GUM MANUFACTURER & SUPPLIER

Address:

Office: 23/11-B, Khiljee road, Block # B, Mohammadpur, Shamoly, Dhaka-1207, Bangladesh

Factory: Plot # 251,Tetuljhora, Rajfulbaria, Savar, Dhaka-1340, Bangladesh. Phone: 8144857, 8128164

We congratulate Babylon Group on 10th publication of Babylon Kathokata

Md. Mizanur Rahman
CEO
MSS (DU)

Abdullah Al-Amin
Director
MSC (Pharmacy)

Company Profile :

The story of TEXCHEM BD INTERNATIONAL goes way back to 2005.We started business with Dyeing & Finishing Chemicals, trying to make a mark in Textile Industry with a vision then it has gone on to a renounced companies which lead to do Printing Chemical later in 2009,has been engaged in this business line for more than 11 years and established our fame with plentiful experiences, and develop various products by continuous innovation of technology. The superior quality and reasonable price are both well controlled under the strict inspection of producing process. Our diverse & highly skilled workforce consists of approximately 15 employees.

Statement of Commitment:

01. Our success is driven by our employee & their commitment to get results the right way by operating responsibility & executing with excellence

02. We serve with best quality products. We have two mother companies which are belongs to TAIWAN (Bestchem) and TURKEY (Ozanadolu).We ensure that all Chemicals are free from hazard which minimize the impact to our environment and protect health and safety to our consumers. We works with customers to deliver innovative products and solutions while maintaining a commitment to safety and sustainability

03.As a team we will continuously improve in all aspects of our business by measuring performance againstobjectives and targets, also comply the guiding principles of responsible care and all other legal and agreed to requirements

As a Company and as individuals we are committed to this policy and proud to share our Quality, Health,Safety and Environmental Commitment with the Customer which their actual needs.

জল জোছনার কাব্য

মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
ম্যানেজার, এইচআর এন্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

ছাইয়ের ঢিবিতে বাতাস হানা দিলে যে অবস্থা হয়, ফুর ফুর করে উড়তে থাকে- আমার অবস্থাও ঠিক সে রকম। আজকেই লাঞ্চের সময় তুষার, সাজ্জাদ ভাই এবং আমি ডাইনিংয়ের একই টেবিলে বসে খাচ্ছিলাম। স্বল্পবাক সাজ্জাদ ভাই বেশ দৃঢ় উচ্চারণে বলে উঠলেন- এই চলেন কোথাও ঘুরে আসি, এক নাগাড়ে কাজ করতে করতে আর ভাল্লাগছেনা। তুষার নড়েচড়ে বসল, আমিতো নেচে উঠলাম- মনোজাগতিক নাচ। গত নভেম্বরের পরে আর দূরে কোথাও ঘুরতে যাইনি। রাস উৎসবের মনিপুরী নৃত্য আর হামহামের বুনোপথের ট্র্যাকিংয়ের স্মৃতি অনেকটাই ফিকে হতে বসেছে। স্মৃতি বেচারার মনে হয় বয়স বেড়ে যাচ্ছে।

খাবার টেবিলেই সিদ্ধান্ত হলো- একেবারে দ্ব্যর্থহীন ঐক্যমত্য। একটা উপযুক্ত জায়গা ঠিক করতে হবে। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো স্থান নির্বাচনের। দুই দিন সময়ও দেয়া হলো। মাথার ভেতরের এন্টেনাটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা উপযুক্ত জায়গা খোঁজার চেষ্টা করছি। অল্প সময়ের একটা ট্যুর- মাত্র দুই দিনের- কীভাবে সর্বোচ্চ উপযোগ পাওয়া যেতে পারে তার সম্ভাবনাগুলোকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

নদী-জল-জ্যোৎস্না, অরণ্য-সাগর-সৈকত একসাথে পাওয়া গেলে আর কি চাই? সদরঘাট থেকে পটুয়াখালী তারপর কুয়াকাটা- প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় সবগুলো ভোট পড়ল। শুধু জ্যোৎস্নাটা চাই। হালের পঞ্জিকা গুগলে বসে গেলাম তুষারকে নিয়ে। হালনাগাদ চাঁদের একটা সাদাকালো ছবি বের করে দিলেন তুষার। পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমীর নিখুঁত হিসেব করে পূর্ণিমার দিনক্ষণ বের করে ফেললাম দু'জন মিলে। শুক্লা চতুর্দশীতে ভাসান- বিস্তীর্ণ অথৈ

জলের ঢেউয়ে ভেঙে পড়া রুপালী জ্যোৎস্নার মায়া আলো, কুয়াকাটার সাগর সৈকতে পূর্ণিমার আলোর দীপাবলী- এ রকম একটা রূপকল্প ভেবে নিয়ে দিনক্ষণ পাশ করা হলো। বেশ একটা রোমান্টিক উত্তেজনায় দিন যাচ্ছে যাত্রীগণের। সাজ্জাদ ভাই'র সাথে দেখা হলেই একটা মুচকি হাসি আর সংক্ষিপ্ত একটা বাক্য- আমরা যাচ্ছি তাহলে। আমার আর তুষারের হাসিটা আরো বিস্তারিত হয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দিনগোনা চলে। টুকটাক পরিকল্পনা নিতে থাকি, সম্ভাব্য যাত্রাটাকে যথাসম্ভব নান্দনিক করে তুলবার জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। এ যাত্রার সমন্বয়ক হিসেবে একটা বাড়তি চাপ ছিল আমার উপর। সেই দায়িত্বের জায়গা থেকেই চাইছিলাম সবকিছু আগেভাগেই ঠিকঠাক করে নিতে।

যুৎসই লঞ্চ নির্বাচন এবং কেবিন বুকিংয়ের জন্য সানন্দে দায়িত্ব নেন মনির ভাই। ব্যাবিলনের সিএন্ডএফ ডিভিশনে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন তিনি। পটুয়াখালী মনির ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি। আমরা বেড়াতে যাচ্ছি সেখানেই। আমাদের আনন্দের চাইতে তাঁর আনন্দ একরত্তিও কম নয়। আমাদের সাথে অন্তত পটুয়াখালী পর্যন্ত যেতে পারলে পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করা হতো বলে তাঁর বিশ্বাস- কিন্তু জরুরি কারণে সেটা না পেরে তাঁর আফসোসের শেষ নেই।

১৩ই আগস্ট। আমাদের যাত্রার দিন আজ। ব্যাগ-পেটরা গুছিয়ে নিয়ে অফিসে গেলাম। অফিস শেষ করে লঞ্চে উঠব। দিনের কাজ শেষ করে লাঞ্চের পরই বেরিয়ে পড়তে হবে। বৃহস্পতিবার এলেই নিজ বাসভূমের উদ্দেশে ছুটতে থাকা মানুষের সীমাহীন দৌড়ের যানজটে ঢাকা শহর নাকাল হয়ে পড়ে। ট্রান্সপোর্ট অধিকর্তা সবুজ ভাইয়ের কাছে একটা গাড়ির আবেদন করা হলো সদরঘাট পৌঁছে দেবার। অনুমোদন মিলল।

বের হতে হতে ৩.০০ টা বেজে গেছে। হাতে রয়েছে ঘন্টা দু'য়েকের মতো সময় বৃহস্পতিবারের ঢাকা শহর পেরিয়ে সদরঘাট পৌঁছানোর জন্য। এক ধরনের চিনচিনে টেনশন অনুভব করছি সবাই। সাজ্জাদ ভাই, তুষার এবং জাহাঙ্গীর- এই তিনজনের ধারণা মোহাম্মদপুর বেড়িবাধ দিয়ে গেলে অল্প সময়ে পৌঁছানো সম্ভব এবং এই পথ দিয়েই যাবার ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্তে অটল। আমি বাগড়া দিলাম আরো দৃঢ়ভাবে। ঐ পথে কোনোমতেই যাব না। প্রয়োজন হলে দল ছেড়ে একলা পথের যাত্রী হবার হুমকি দিলাম। এই পথে আরো দু'বার আমাকে চরম বিপত্তিতে পড়তে হয়েছিল। সোয়ারিঘাট থেকে বাবুবাজার পর্যন্ত এক দুঃসহ পদযাত্রার স্মৃতি এখনো বেশ দগদগে। তাছাড়া ব্যাবিলন কথকতার কোনো এক সংখ্যায় হাসান স্যারের লেখা 'ভোলাযাত্রার ইতিবৃত্তে'র দম বন্ধ করা অনুভূতির কথা কার না মনে আছে। এ তো সেই পথ। বাকি যাত্রীদলের সাথে একটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চলছে। আমি আমার নেতৃত্বের ক্ষমতাবলে অনেকটাই স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ। আমাকে নেতা বানানো হয়েছিল পুরো ট্যুরের জন্য, কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বসহ। ব্যাপারটার মধ্যে রিস্ক থাকলেও সফলতার সম্ভাবনাও আছে। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বেশ একটা চ্যালেঞ্জিং জব। চ্যালেঞ্জটা বেশ ভালোভাবেই টের পেলাম যাত্রার একেবারে শুরুতেই। টুকটাক বাকযুদ্ধের এক পর্যায়ে

বললাম- এই পথে কোনোরকমে গুলিস্তান পর্যন্ত যেতে পারলে বাকিটা হেঁটে সদরঘাট পৌঁছানোটা কোনো ব্যাপার হবে না। সাজ্জাদ ভাই বেশ ঝাঝালো উত্তাপে বলে উঠলেন- দ্যাখেন মাহমুদ ভাই, আমি কিন্তু আরামপ্রিয় মানুষ। ব্যাগ, বাক্স নিয়ে এক পাও কিন্তু আমি হাঁটতে পারব না বলে দিলাম। আর যদি শেষে হাঁটাই লাগে তাহলে আপনার নেতৃত্ব কিন্তু কেড়ে নেয়া হবে। আমরা সবাই হো হো করে না হেসে পারলাম না। সাজ্জাদ ভাইও হাসলেন। গুমোট পরিস্থিতি কিছুটা হলেও কেটে গেল।

কলাবাগান পর্যন্ত ভালোই গেলাম। গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের কাছে যেতেই জ্যাম শুরু হলো। বেশ জমাট জ্যাম। ভেতরে ভেতরে নেতৃত্ব হারানোর শংকায় অনেকটা ইন্টারনাল হ্যামারেজ শুরু হয়েছে। উপরে বুঝতে দিচ্ছি না। একই জায়গায় প্রায় পঁচিশ মিনিটের মতো কেটে যাচ্ছে- এ্যালিফ্যান্ট রোডের মাথায় এখনো পৌঁছাতে পারিনি। ভেতরের স্নায়বিক উত্তেজনার পারদ উপরের দিকে উঠছে। আবার গুমোট অবস্থা। হাত দু'টোকে উপরে তুলে মোনাজাত শুরু করলাম- হে আল্লাহ একজন সম্মানী মানুষ তার সম্মান হারাতে বসেছে। কুলাঙ্গার যানজটের কারণে তার নেতৃত্ব আজ হুমকির মুখে। তুমি তার সম্মান রক্ষা করো হে খোদা। কতিপয় বিপথগামী মানুষের কাছে...।

জ্যাম ছাড়তে শুরু করেছে। সিগন্যাল সচল হয়েছে। সোয়া চারটার দিকে আমরা সদরঘাট পৌঁছাতে পারলাম। এবারের মতো নেতৃত্বটা টিকে গেল। বল বীর চির উন্নত মম শির। মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে টার্মিনাল পাশ কিনে ভেতরে ঢুকলাম। মনির ভাই আমাদেরকে লঞ্চে তুলে দেবার জন্য আমাদের সঙ্গে এসেছেন। একটা এসি ডাবল কেবিনের জন্য আগেই বুকিং দিয়েছিলেন মনির ভাই। অপ্রশস্ত কেবিনটা আমাদের খুব একটা পছন্দ হলো না। মনির ভাই আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। বেচারা অবশ্য আগেই বলেছিলেন একটা ভিআইপি কেবিনের কথা। আমরাই রাজি হইনি একরাতের জন্য এত টাকা খরচ করতে। এমভি জামালের স্টাফদের সাথে বেশ পরিচিতি আছে মনির ভাইয়ের। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কেবিন প্রাপ্তির খবর নিয়ে এলেন তিনি- সাথে চাবিসহ কেবিন বয়। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো লঞ্চের তিনতলার পেছনের দিকে কেবিনে পৌঁছে দেয়ার জন্য। কলাপসিবল গেটের নিরাপত্তার ভেতরে কেবিনগুলো একটা প্রশস্ত প্যাসেজের দুই পাশে দু'টো করে মুখোমুখি। কাঠের অসাধারণ কারুকাজ পুরো এলাকা জুড়ে। বেশ রাজকীয় ভাবভঙ্গির ইন্টেরিয়র। প্যাসেজের শেষ দিকে একটা কমন ডাইনিং টেবিলে ঝকঝকে প্লেট, বাটি, চামচ, গ্লাস সাজানো। কেবিনের তালা খুলে ভেতরে ঢুকতেই একটা প্রশান্তির চোখাচোখি হয়ে গেল সকলের মধ্যে। ঠোঁটের কোণের আর চোখের হাসিটা ওয়াও শব্দ করে বেরিয়ে এল। মনির ভাই বেশ পুলকিত তাঁর পটুয়াখালীর লঞ্চের বনেদি ব্যবস্থা আমাদের মুগ্ধ করেছে বলে। নিজ বাসভূমের আভিজাত্য অথবা বিশেষ কিছু এভাবেই মানুষকে গর্বিত করে।

কেবিনে তুষার, সাজ্জাদ ভাই আর মনির ভাইকে রেখে আমি টার্মিনালের বাইরে এসে কিছু

খাবার-দাবার, পানি ইত্যাদি সংগ্রহ করে খুব দ্রুত কেবিনে ফিরে গেলাম। শেষ বিকেলের সদরঘাটের ফটোগ্রাফির একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, সেটাকে যতটা সম্ভব কাজে লাগানো উচিত। সুযোগ তো বারবার আসে না। সাজ্জাদ ভাইও ক্যামেরায় শান দিয়ে বসে আছে। নোংরা নদীটার এই অংশ ভীষণ ব্যস্ত। লঞ্চগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে খেয়া নৌকাগুলো ফোড়ন কেটে কেটে এপার ওপার করছে, পানির উপরিতলের প্রায় সমতলে ডুবুডুবু বালির ট্রলারগুলো ধীরস্থির গতিতে উজানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা- ঢাকা শহরের আশেপাশের জলাভূমি আর ফসলের ক্ষেতের বারোটা বাজাতে। ভাঙা ভাঙা নানা রঙের মেঘের ভেতর দিয়ে বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালী- এ রকম বারোয়ারী আকাশের ভেতরে ভুবন চিলেরা উড়ে বেড়াচ্ছে নিরন্তর। ঘাটে ভেড়া সারি সারি লঞ্চ, রাস্তায় সারি বেধে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক আর কাভার্ড ভ্যানের ছাদের উপর দিয়ে আহসান মঞ্জিলের উপরের অংশ দৃশ্যমান, বড় বেশি বিসদৃশ এ রকম ঘিঞ্জির ভেতরে। মঞ্জিলের যখন নির্মাণ, তখন সুদর্শন নদীতীরের বিস্তারিত সৌন্দর্যের মধ্যে হয়তো এক মহামূল্য অলংকারের মতো ঝলমল করত এই মহল। যার রূপকল্প চিন্তা করার মতো কল্পনাশক্তিও হয়তো আমরা রাখি না। বৃটিশ রাজত্বের সময় ক'জন সংবেদনশীল বৃটিশ চিত্রকর ঢাকা নগরের বেশ কিছু জল আর তেল রঙের ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছিলেন। আহসান মঞ্জিল এবং এর আশেপাশের একটা ল্যান্ডস্কেপও পাওয়া যায় চিত্রকর্মগুলোর একটিতে। তখন বিশুদ্ধ বুড়িগঙ্গা নদীতে পালতোলা নৌকা চলত। নদীর ওপারের কালীগঞ্জ ছিল সবুজ গ্রাম। টাইম মেশিনে চড়ে সেই সময়ে ফিরে যেতে খুব ইচ্ছা করছে। আমরা সেই নদীটাকে মেরে ফেলেছি। আমরা আমাদের নদীগুলোকে মেরে ফেলি, আর সভ্য মানুষগুলো শহরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম নদী খনন করে এপাশ ওপাশ সংযোগ করে।

আমরা সমানে ছবি তুলছিলাম। কখন যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে টের পাইনি। বিজ্ঞাপনের নিয়ন বাতিগুলো জ্বলে উঠছে- শত শত।

একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
... তোমার জন্য গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

- শঙ্খ ঘোষ

লঞ্চ ছাড়ার সময় হয়ে এল। লম্বা ভো আওয়াজ দিয়ে সে রকমটাই জানান দিচ্ছে যেন। মনির ভাই এ লাইনের অভিজ্ঞ মানুষ। বললেন- আরো আধা ঘন্টা। খানিক পরপর ভো-ও-ও বাজতে লাগল। আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আরেকবার তার শ্বশুরবাড়ি পটুয়াখালীতে সকালের নাস্তাটা করার অনুরোধ জানালেন মনির ভাই। আমরা যেতে পারিনি, যেতে রাজি হইনি। কিন্তু তার সেই নির্ভেজাল আমন্ত্রণের উষ্ণতা অনুভব করি মাঝেমাঝেই

এখনো। আমাদের সাথে অন্তত পটুয়াখালী পর্যন্ত যাওয়ার একটা প্রবল বাসনা ছিল মনির ভাইয়ের। যেতে না পারার হতাশা বিদায়ের সময় তার কণ্ঠকেও ছুঁয়ে গেল।

একটা লম্বা ভো দিয়ে লঞ্চ চলতে শুরু করেছে। কেবিনের ডেকে দাঁড়িয়ে আমরা তিনজন একটা রোমাঞ্চকর ভ্রমণের খুঁটিনাটি উপভোগ করতে শুরু করেছি। নদীর পূর্ব দিকে বড়সড় একটা প্রায় পূর্ণ চাঁদ আমাদের পাশে পাশে হেঁটে আলো ছড়াচ্ছে। সে আলোয় উদ্ভাসিত নদীবক্ষ আর নদীতীরে এখনো ভীষণ ব্যস্ততা- নদীর তীর ধরে বসতি, শিল্প-কারখানা, দোকানের ইলেকট্রিক বাতির ঝলকানি- নাগরিক, উপ-নাগরিক অনুসংগ এখন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে। নদী অববাহিকার চিরায়ত লোকজ রূপের সন্ধান পেতে আমাদেরকে আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।

সারাদিনের সার সার কাজের চাপ, যানজটের টেনশন, কেবিন পাওয়ার ঝক্কি– দুপুরে যা খেয়েছিলাম পাকস্থলী পুরোটাই হজম করে নিয়েছে। বাসা থেকে নিয়ে আসা হাসের ভুনা মাংস জিভ আর পাকস্থলীকে আরো বেশি অস্থির করে দিচ্ছে। কেবিনে ফিরে গেলাম। সদরঘাট থেকে পরোটা কিনেছিলাম ১২/ ১৪ টা। কেবিন বয়কে বলে মাংসটা গরম করে নেয়া হলো। গরম গরম ভুনা মাংস, সাথে হোটেলের ভাজা পরোটা! আহ্। মহাতৃপ্তি।

কেবিনের সাথেই লাগোয়া জানালার পর্দা সরালে শুয়ে শুয়েই নদীরূপ চোখে পড়ে। ফ্রিজ, টেলিভিশন, এয়ারকন্ডিশনার, কাঠের র‍্যাক, একসেট সোফা আর প্রশস্ত একটা খাট কারুকাজ করা, সিলিংয়ে কাঠের শিল্পকর্ম- বেশ কুলীন পরিব্রাজক মনে হয় নিজেদেরকে। বিশাল নদীর উপর জ্যোৎস্নার আলোতে চিকচিক জলের মুক্তোদানার উপরে বিন্দুর মতো দু'একটা নৌকার আনা গোনা- এক অসামান্য কাব্যিক দ্যোতনায় মনোজগতে কবি কবি ভাব জাগে আমাদের। সাজ্জাদ ভাই জীবনানন্দের কবিতা শুরু করেন-

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভেতর
এক নিরালা নীড়ে;

অথবা
পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে;

আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

প্রায় ঘন্টাখানেক কাব্যচর্চা চলে। রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলার ভাড়ার থেকে।

হঠাৎ লঞ্চের নীচে পানি ভাঙার শব্দ শুরু হয়। সামান্য কাঁপুনি টের পাই আমরা। কাব্য চর্চায় ছেদ পড়ে। পদ্মা, যমুনার বিশাল প্রবহমান জলরাশি মেঘনার সাথে মিশে যাচ্ছে এখানে। ঢাউস আকৃতির নদীগুলোর মোহনায় তাই জলের কল্লোল। রোমাঞ্চের মাত্রা বদলায়। নদী এখানে কূল কিনারাবিহীন। পূব পাড়ে চাঁদপুর শহরের ঝলমলে আলো- পাশ্চিমে শুধুই জলরাশি। কেবিন ছেড়ে আমরা ডেকে উঠে পড়ি। পশ্চিম উত্তর আর দক্ষিণের আদিগন্ত দৃষ্টিসীমার অথৈই পানির উপর জ্যোৎস্নার আলো পড়ে নরম ম্লান মায়াবী রূপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। জলের স্রোত আর উথালী পাথালির উপর চাঁদের আলোর নানা আকৃতির প্রতিফলন। অদ্ভুত আলো আঁধারির খেলা। দূরে দূরে আরো কিছু লঞ্চের জাকালো আলোর ঝলকানি যেন এক বিচিত্র রূপের বাহার তৈরি করেছে। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন দু'এক টুকরো মেঘ এসে চতুর্দশীর উজ্জ্বল চাঁদটাকে গ্রাস করে বিস্তারিত জলের উপরিতলে এক অদ্ভুত রহস্য তৈরি করছে। জল জ্যোৎস্নার এই অপার্থিব প্রকৃতির বিচিত্র রূপের ভেতর ডুবে গিয়ে আমরা কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাই না। তিন তিনটা প্রাণবন্ত মানুষ এ এক অন্য রূপের ইন্দ্রজালে মোহাবিষ্ট- যা আমাদের প্রাত্যহিক গৎবাধা রুটিনের কল্পনাতেও নেই। এ রকম অনভ্যস্ত সুন্দরের ভেতর বেশিক্ষণ না থাকাই ভালো- মনোবৈকল্যের সম্ভাবনা থাকতে পারে। চাকরি-বাকরি-সমাজ-সংসার না থাকলে সমস্যা ছিল না। শেষে জীবনানন্দের মতো পরিণতিও ঘটতে পারে কিংবা সিলভিয়া প্লাথের মতো অথবা কায়েস আহমেদের মতো কোনো কিছু।

কেবিনে ফিরে আরেক পর্ব আহারের প্রস্তুতি চলছে। লঞ্চের হেসেলের খাবার- সবজি, শাক আর ইলিশ ভাজা- কেবিন বয় রেডি করে রেখেছে ডাইনিংয়ে জালি দিয়ে দিয়ে ঢেকে। বাইরে বের হলে ক্ষিধে মনে হয় একটু বেড়ে যায়। সাজ্জাদ ভাই তার আইপ্যাডে একটা কম্পোজিশন ছেড়ে দিয়েছেন। বেশ মেলোডিয়াস এবং অসাধারণ কম্পোজ। তুষার নাচ শুরু করেছে। কথকের ঢংয়ে, কথক থেকে ফোক, ফোক থেকে ভারত নাট্টম- চমৎকার ইম্প্রোভাইজেশন। নদীবক্ষের রোমান্টিক যাত্রায় বাকি ছিল নৃত্য- বিনোদিনী আর মীরা বাঈ হাওয়ায় ভর করে কেবিনে হাজির। চমৎকার!

চমৎকার!
ধরা যাক দু'একটা ইঁদুর এবার-
হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার
আমিও তোমার মতো বুড়ো হব- বুড়ি চাঁদটারে আমি

করে দেব কালীদহে বেনো জলে পার;
আমরা দু'জনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাড়ার।

সাজ্জাদ ভাই জীবনানন্দে ফিরে গেলেন আবার। আমি শুধু অবাক হচ্ছি- পৃথিবীর সব রূপ দেখে দেখে।

খাবারের চারপাশে বিশেষ আকৃতির অনেকটা ছোট এবং সরু তেলাপোকারা ঘুরাঘুরি করছে। সরকারি হসপিটাল, লঞ্চের কেবিন, ফেরির হেসেল যেখানে পালাবার কিংবা বসবাসের জায়গা বেশ সংকীর্ণ সেখানকার তেলাপোকাগুলোকে এই আকারে দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক কালের টিকে থাকা প্রাণীদের মধ্যে মনে হয় সবচেয়ে অভিযোজন সফল এই আরশোলা সমাজ। ওদেরকে বেশিক্ষণ সুযোগ না দিয়ে আমরা ডিনার সেরে নিলাম। বেশ মজাদার রান্না লঞ্চের বাবুর্চির।

ঘুমানোর আগে আরেকবার জ্যোৎস্নাস্নাত নদী আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। বারান্দায় চেয়ারে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে সেই সৌন্দর্য সুধার মধ্যে দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে কখন যে ঘুম পেয়ে গেছে- আগামীকালের জন্য কিছুটা ঘুম দরকার। সাগর তীর্থে চারণের জন্য কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করা জরুরি। তুষার আর সাজ্জাদ ভাই ইতিমধ্যে শুয়ে পড়েছে। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আমিও ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছি। জানালা দিয়ে নদী দেখা যাচ্ছে। একটা ফ্রেমের ভেতরে দৃশ্যের পর দৃশ্য সরে সরে যাচ্ছে। পদ্মা মেঘনার বিশালাক্ষী ছেড়ে একটা মাঝারি আকারের নদীর পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। তেতুলিয়া নদী। নদীপাড়ের গ্রামগুলো এখানে আবছারূপে দৃশ্যমান। গাছ-গাছালি, মাঠ, নদী থেকে উৎসারিত খালের উপর শেষ রাতের মৃয়মান আলো- মায়াময়, অপার্থিব।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ অস্পষ্ট হাকডাকে ঘুম ভাঙল। তুষার উঠে গেছে। নদীর প্রায় মাঝখানে লঞ্চ নোঙর করা- ছোট ছোট নৌকা এসে ভীড় করে যাত্রী আর পণ্য নামিয়ে নিয়ে পাড়ের দিকে যাচ্ছে। অনাব্যতার কারণে লঞ্চ ভিড়াতে পারেনি পন্টুনে। পায়রা নদী এটি, আর জায়গাটার নাম বগা। লঞ্চ ছাড়লে আরেক পশলা ঘুমের চেষ্টায় চোখ বুজলাম।

সাজ্জাদ ভাইয়ের ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙল, সূর্যটা বেশ খানিকটা উপরে উঠে গেছে ইতিমধ্যে। শুনলাম প্রায় ঘন্টা দু'য়েক আগে এ যাত্রার শেষ গন্তব্য পটুয়াখালীর পন্টুনে এসে নোঙর করেছে লঞ্চটি। ঘুমিয়েছিলাম বলে কেউই টের পাইনি। যাত্রীরা সব নেমে গেছে। কিছুক্ষণ আড়মোড়া দিয়ে হাই টাই তুলে উঠে পড়লাম। শরীর চাইছে সটান শুয়ে থাকতে, কিন্তু উপায় নেই। মৌসুমে ইলিশ ধরায় ব্যস্ত মাঝিদের চাইতেও ব্যস্ত রুটিন আমাদের। কত দ্রুত কুয়াকাটায় পৌঁছাতে পারি- সমুদ্র অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য। হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ব্যাগ ট্যাগ গুছিয়ে নেমে পড়লাম লঞ্চ থেকে। একরাতের সঙ্গী কেবিনটাকে ভীষণ

শূন্য মনে হচ্ছে- শূন্যতা ছুয়ে যাচ্ছে আমাদেরকেও। পন্টুনের খুব কাছেই একটা হোটেলে ঢুকে নাস্তা করছি। হঠাৎ বৃষ্টি নামল। উপকূলের কাছে নাকি এ রকম বৃষ্টি প্রায়ই হয়। আমার জাহাঙ্গীর মামা- বিআরডিবির অফিসার, দশমিনা থেকে এক ঘন্টার মোটরবাইকের দূরত্ব অতিক্রম করে দেখা করতে এসেছে।

নাস্তা শেষ করে একটা মাইক্রো ভাড়া করতে হবে। বৃষ্টি বেশ ঝামেলা করছিল। পাঁচ হাজার টাকায় দুই দিনের দফারফা হলো মাইক্রো মালিকের সাথে। একদফা চা টা খেয়ে মামাকে বিদায় দিয়ে আমরা ছুটলাম পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। বেশ সবুজ পটভূমি রাস্তার দু'দিকে, মাঝে মাঝে নদী- আন্ধার মানিক- পায়রা ইত্যাদি। জোয়ার ভাটার টান এখানে প্রবল- ছোট ছোট খালগুলোও বেশ বেগবান- সমুদ্রের প্রতাপ সুস্পষ্ট। কুয়াকাটার সামান্য আগে উপকূলের সমান্তরালে একটা নদীতে শত শত জেলে নৌকা আমাদের দৃষ্টি কাড়ল। নদীর দুইপাড় ধরে শয়ে শয়ে মাছ ধরার ট্রলার, লাল-নীল-সবুজ-কমলা পতাকা উড়ছে মাস্তুলে মাস্তুলে। রঙিন দৃশ্যপট। সারারাত রুপালী মাছ ধরে বেচতে এসেছে আড়তে। বিকেলে আবার সমুদ্র যাত্রার প্রস্তুতি চলছে। ব্যস্ত জনপদ। ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ফটোগ্রাফি চলল।

কুয়াকাটায় পৌঁছে একটা হোটেল ঠিক করলাম। খুব বেশি আলিশান না হলেও ধ্রুপদী ইন্টেরিয়র, খোলামেলা বারান্দা থেকে সাগর দৃশ্যমান, পাগলা হাওয়া, সামনে কয়েকটা ঝাউগাছ- আমাদের সবারই বেশ পছন্দ হলো। সাগরের বালুতট আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। দুপুরের খাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের আশেপাশে মোটরবাইক ঘোরাঘুরি করছে। ওদের হাতে একটা ট্যুরিস্ট চার্ট- লোভনীয় ছবিসম্বলিত। বেশ কয়েকটা প্যাকেজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কুয়াকাটার দর্শনীয় স্থানগুলোতে যেকোনো একটা প্যাকেজ ট্যুরে রাজি করাতে কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে মার্কেটিং করছে জনাকয়েক। বেশ স্মার্ট ওদের উপস্থাপন। ঝাউবন, লেবু বাগান, তালবন, গংগামতির চর, লালকাকড়া, স্লুইস গেট, বৌদ্ধমন্দির, রাখাইন পল্লী ঘুরে আবার কুয়াকাটা প্যাকেজটা মন্দ না। দরদাম নিয়ে টুকটাক কথা বলছিলাম আর ছবি তুলছিলাম। অনেক বছর পর কুয়াকাটায় এসেছি। আগের সেই নারকেল আর তালবিথী খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে। সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে অনেকটাই বিলীন হয়েছে- এখনো হচ্ছে। তারপরও অসাধারণ। পূর্ব সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ এই সৈকতটাকে আলাদা সৌন্দর্য দিয়েছে। কক্সবাজারের পাহাড় যেমন। সমুদ্রের কাছে এলে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। এই রূপের বর্ণনা সম্ভব না, অতএব থাক। দুঃসাহসেরও একটা সীমা থাকা উচিত।

আমরা তিনজনে তিনটা মোটরসাইকেলের পেছনে উঠে পড়লাম। আলো থাকতে থাকতে পুরোটা জায়গা ঘুরে আসতে হবে। দেরি করলে লাল কাকড়ারা গর্তে লুকাবে। আলো পড়ে গেলে ওরাও গর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। মোটর সাইকেল থামিয়ে থামিয়ে ছবি তুলছিলাম। একটা খেয়া নৌকায় গংগামতি পার হয়ে লাল কাকড়ার চরে পৌছে গেছি। বাক ঘুরতেই বেলাভূমি জুড়ে শয়ে শয়ে লাল কাঞ্চন বিছিয়ে রয়েছে যেন। কাছে গেলেই নিকটবর্তী গর্তে

ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাবে কাকড়ার দল। দূর থেকে ছবি তুললাম। একটা ভো দৌড়ে পুরো দল থেকে একটা কাকড়াকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলাম। ওর আশেপাশে কোনো গর্ত নেই। আমি ওকে সমুদ্রের দিকে অনেকটাই তাড়িয়ে আনতে পেরেছি, কিন্তু মুশকিল হলো জটিল এই প্রাণীটি ওর চোখের এন্টেনাকে আমার দিকে নিবদ্ধ করে চতুর্দিকে সঞ্চারণশীল। দ্রুত প্রাইম ৫০ ক্যামেরায় লাগিয়ে ওকে স্থির করার চেষ্টা করছি, সাপুড়েরা হাত নাচিয়ে সাপকে যেমন বাগে আনে। পটাপট কয়েকটা হাই স্পিড শট নিতে পারলাম প্রায় মিনিট বিশেকের চেষ্টায়। দরদর করে ঘাম ঝরছে শরীরে। আমার এই আয়াসসাধ্য ফটোগ্রাফি দেখে গাইড শরীফের ক্যামেরা কেনার সাধ চুপসে গেল। ও একটা ক্যামেরা কেনার জন্য টাকা গোছাচ্ছে। একটু আগে সেটাই বলছিল। ছবি তোলা যে এতটা কষ্ট সেটা আগে বুঝতে পারেনি ও। আমরাও বুঝিনি। আগে মনে হতো দামী ক্যামেরা দিয়ে ক্লিক করলেই মনে হয় অসাধারণ সব ছবি বেরিয়ে আসে। ফটোগ্রাফির শখ আমার বহু পুরনো। একটা ডিএসএলআর কেনার জন্য বেশ কয়েকবার টাকা গুছিয়েও শেষ পর্যন্ত কেনা হয়ে ওঠেনি। কোনো না কোনো জরুরি দায় এসে আশার গুড়ে বালি ঢেলে দিয়েছে প্রতিবারই। শেষ পর্যন্ত একটা ডিএসএলআরের মালিক হতে পেরেছি বছর দেড়েক আগে। মায়ের কাছ থেকে নেয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার লোনটা এখনো শোধ হয়নি। প্রতিমাসে ১০০০ টাকার সুদমুক্ত কিস্তি দিচ্ছি। কিন্তু এই ঋণ কোনোকালে শোধ হবে না।

ক্যামেরাটা কেনার আগে একটা ক্যানন সাইবার শট আমার ফটোগ্রাফির অবলম্বন ছিল। এমদাদ স্যার (পরিচালক, ব্যাবিলন গ্রুপ) ক্যামেরা হাতে নিয়েছেন বছর তিনেক হবে। স্যারের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক বিনিময় হয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে। সেই সুবাদে স্যারের তোলা ছবিগুলো দেখার সুযোগ হয়। ফটোগ্রাফির প্রতি আগ্রহও বাড়তে থাকে। মাঝে মাঝে ছবি তোলার জন্য আর ফটোগ্রাফি ব্যাপারটা বোঝার জন্য স্যারের সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ ঘটে। মনে পড়ে আমি আর সুশান্ত (আইটি ডিপার্টমেন্ট) প্রথমবারের মতো স্যারের সাথে বের হয়েছিলাম চন্দ্রিমা উদ্যানে। জারুল আর কৃষ্ণচূড়ার সময় ছিল তখন। ডিএসএলআর এ ক্লিক করার প্রথম সৌভাগ্যটা হয়েছিল সেই দিন। সে যে কি উত্তেজনা! ম্যানুয়াল ফাংশনে কীভাবে ছবি তুলতে হয়- আইএসও, এ্যাপারচার, শাটার স্পিড, ফ্রেমিং, রুল অব থার্ড ইত্যাদি প্রথম দিনেই প্রাথমিক পাঠ হয়েছিল আমাদের। ফটোগ্রাফির মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক দুই নাদান শিক্ষার্থীকে উদার পাঠদান করেছিলেন আর আগ্রহের ব্যারোমিটার উচু থেকে আরো উঁচুতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই দিনগুলোতে।

কোনো এক শুক্রবারে স্যার যাবেন তাঁর হলদিয়ার গ্রামের বাড়িতে- আমরাও প্রস্তাব পেলাম দুই অনুগত ছাত্র হিসেবে। আমি আর সুশান্ত। গাড়িতে বসেই পাঠদান শুরু হলো- আমরা আত্মস্থ করবার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে পূর্বের পড়া থেকে পরীক্ষা দিচ্ছি। পথে কোথাও কোথাও থেমে ফটোগ্রাফির প্র্যাকটিক্যাল সেশন হচ্ছে। আমার হাতে তখনো সাইবার শট- পয়েন্ট এন্ড শ্যুট। মাঝে মাঝে স্যারের ক্যামেরা দিয়ে দু'একটা শট নেবার সুযোগ ঘটে,

তোলা ছবিটার ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করেন স্যার। আমরা বুঝবার চেষ্টা করি। স্যারের গ্রামের বাড়িতে হরেক রকম গাছ-গাছালি আর একদিকে একটা সমৃদ্ধ ফুলের বাগান। প্রজাপতি আর ফড়িঙেরা ভীড় করেছে বাগানটিতে। অস্থির এই সুদর্শন প্রাণীগুলোর ছবি তোলার কৌশল দেখতে থাকি আমি আর সুশান্ত। গাছ-গাছালির সন্নিবিষ্ট ডালে ডালে পাখিদেরও বেশ আনাগোনা। সেগুলোর ছবি তোলার সময় লেন্স বদল হয়, সেই সাথে রেসিপিও। একেকটা শটের পর আমরা ছবিগুলো দেখি, স্যারের কাছে বিশ্লেষণ দাবি করি। দুই অনুগত ছাত্রকে আস্কারা না দিয়ে পারেন না স্যার। মাঝে মাঝে স্যারের ক্যামেরার ভারী ব্যাগটাকে বহন করে অনুগত্য বাড়াবার চেষ্টা করি। এটাও যে এক ধরনের গুরুমুখী বিদ্যা সেটা ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছি। ভারতীয় শাস্ত্রীয় আর বাদ্যযন্ত্রের আজকের যারা লিজেন্ড তাদের অনেকেই সুদীর্ঘ সময় ধরে ওস্তাদের তবলা-হারমোনিয়াম টেনে বেড়িয়েছেন, এটা সেটা ফাই-ফরমায়েশ খেটেছেন। আমরাতো সেই অর্থে ভাগ্যবান।

ফেরার পথে থেমে থেমে ছবি তোলা চলতে থাকে। কচুরির ফুল, অল্পজলে ধ্যানমগ্ন বক, লাল কৃষ্ণচূড়া, পুকুরে ডোবানো নৌকা- প্রকৃতির সুন্দরেরা ক্যামেরাবন্দী হতে থাকে একটার পরে একটা। ফটোগ্রাফির লেসনটাও চলতে থাকে। ফটোগ্রাফি ক্লাবের আইডিয়াটাও আসে স্যারের কাছ থেকে। ফটোগ্রাফি একটা খরুচে শখ। বিশেষ করে লেন্সের দাম বেশ চড়া। স্যার বুদ্ধি দেন- আমরা যদি একটা ক্লাব করে নিতে পারি, সমন্বিত উদ্যোগে বিষয়টা সহজ হতে পারে। ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাবের বীজ বোনা হয়ে যায় হলদিয়া ট্যুর থেকে ফেরার সময়। আমার একটা নিজস্ব ক্যামেরা কেনার সংকল্পটা দৃঢ়তর ঐ সময়টাতেই।

একটা মহাসুযোগের হাতছানি আমাদের সামনে। পরের দিন অফিসে ফিরেই একটা ছোটখাটো নীরব ক্যাম্পেইন করে ফেলি। চৌদ্দ জনের তাৎক্ষণিক সাড়া মেলে। অল্পদিনের মধ্যে একটা মিটিংয়ে প্রতিষ্ঠা পায় ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাব। সাথে আরো একটা সারপ্রাইজ- একটা নতুন ক্যামেরা- ঈধহড়হ ৬০ উ। ঐ দিনই উপহার পাই এমদাদ স্যারের কাছ থেকে। ক্লাবের নবীন সদস্যদের যে কী আনন্দ হয়েছিল সেদিন!

কুয়াকাটার সাগরপাড়ে আমরা যে তিনজন ছবি তোলার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছি কাকতালীয়ভাবে সবাই ঐ ক্লাবেরই সদস্য। সাজ্জাদ ভাইয়ের হাতে স্যারের দেয়া সেই ক্যামেরাটি। ছবি তুলতে তুলতে সন্ধ্যা নেমে আসে। প্যাকেজের শেষ স্পটে ফিরে আসি যখন তখন সমুদ্রের উপর রুপালী থালার মতো চাঁদ উঠেছে, পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সৈকতে ঢেউ ভাঙছে অবিরত। হোটেলে ক্যামেরা রেখে আমরা সেই ঢেউয়ের ভেতর নেমে পড়লাম।

পরদিন সকালে মেঘে ঢাকা আকাশ সূর্যোদয়ের ছবি তোলার আজন্ম সাধকে বরবাদ করে দিল। বিকেলের লঞ্চে ঢাকায় ফিরতে হবে। আনন্দের সময়গুলো মনে হয় দ্রুত ফুরিয়ে

যায়। চারটার আগে পটুয়াখালী পৌঁছাতে না পারলে কেবিন পাওয়া মুশকিল হবে। সমস্ত পিছুটান জয় করে সাড়ে এগারটার দিকে কুয়াকাটা ছাড়লাম। ফেরার পথে মহিপুরের জেলে পল্লীতে আধা ঘন্টার ফটোগ্রাফি হলো। বঙ্গোপসাগরের কুবেরেরা জড়ো হয়েছে, শেতল বাবুরাও আছে। টনকে টন রুপালি ইলিশ দ্যুতি ছড়াচ্ছে আড়তে আড়তে। উচ্চস্বরে ডাক চলছে, প্যাকেট হচ্ছে- সার সার ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, শহরে শহরে পৌঁছে এগুলো পরিণত হবে পদ্মার ইলিশে।

মহিপুর ছাড়ার পর থেকেই কেমন যেন বিরহ বিরহ অনুভূতি আমাদের ভেতরে। সমুদ্র পাড়ে ২৪/২৫ ঘন্টার যাপিত জীবন কেমন যেন একটা মায়ার বন্ধন তৈরি করে ফেলেছে যেন। উপকূলবর্তী খাল, নদী আর অজস্র সবুজের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে যখন পটুয়াখালী পৌঁছালাম তখন বিকেলের সূর্য মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলছে। লঞ্চঘাটের পাশেই একটা হোটেলে শাক-ভর্তা-সবজি, ছোট মাছ, নানা পদের ঘরোয়া ব্যঞ্জনের স্বাদ পাওয়া গেল। বেশ ক্ষিধে লেগেছিল সবার।

ঘাটে দু'টো লঞ্চ ভেড়ানো। এমভি কুয়াকাটা আর এমভি সুন্দরবনের স্টাফগণ একটা হালকায়ে জিকির তুলে ফেলেছে ঢাকা ঢাকা করতে করতে। ওটাইতো আমাদের শেষ গন্তব্য, ওটাই আমাদের শেষ ঠিকানা। আমরা এক ধরনের দ্বন্দ্বে পড়ে গেছি কোনটাতে যাব। সাজ্জাদ ভাই আমি আর তুষার পর্যবেক্ষণ করছি- কোন লঞ্চের গেটআপ ভালো, কোনটা কত নতুন ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত কুয়াকাটার ভিআইপিটা পছন্দ হলো আমাদের। ব্যাগট্যাগ নিয়ে উঠে পড়লাম আমাদের এক রাতের বাসস্থানে। চমক অপেক্ষা করছিল শেষ বেলাতেও। সাজ্জাদ ভাই ফোনে কথা বলছিলেন কার সাথে যেন। ফোন ছেড়ে আমাদেরকে জানালেন- ডিনারের অনিবার্য স্পন্সর পাওয়া গেছে। তোফাজ্জল ভাই জানতে পেরেছেন আমরা পটুয়াখালী এসেছি। রাতের ডিনারের সমস্ত আয়োজন তাঁর। তোফাজ্জল ভাই আমাদের কলিগ- অবনী ফ্যাশন্সের ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। এই পটুয়াখালীতেই তার বাড়ি। শ্বশুরবাড়িও এখানেই। তার এই রিমোট আতিথেয়টা আমাদের জন্য চমকই বটে।

বিকেলের সূর্যটা আরো কিছুটা নেমে গেছে। নদীর উপর তার ভাঙা ভাঙা আলোকছটা, মেঘের কারণে সন্ধ্যার একটু আগাম উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। লঞ্চের ইঞ্জিন সচল হয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। মাঝে মাঝে ভো দিচ্ছে- যেমনটা দিয়েছিল সদরঘাটে। আমরা কেবিনের বারান্দায় চেয়ারে বসে ব্যস্ত লঞ্চঘাটে নদী প্রকৃতির অসামান্য চেহারা দেখছি। হঠাৎ একজন আগন্তুক আমাদের কেবিনে হাজির। পেছনে কেবিন বয়। আমরা বুঝতে পারলাম তোফাজ্জল ভাইয়ের বন্ধু যার কথা আগেই বলেছিলেন। আমাদের অভিবাদন জানিয়ে পরিচয় দিলেন। একগাদা খাবার দাবার নিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। বিরানী, মাংস, বিচিত্র ফল, চানাচুর, কেক, বিস্কুট- পটুয়াখালীর লঞ্চঘাটের আশেপাশে যা পাওয়া গেছে সব খালি করে নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্য। কিছুক্ষণ কথা হলো দেলোয়ার ভাই'র সাথে। টেলিফোন নাম্বার

বিনিময় হলো। পটুয়াখালীর বেশ প্রভাবশালী মানুষ অথচ তাঁর বিনয় আমাদেরকে ছুঁয়ে গেল। বাড়িতে নিয়ে আপ্যায়ন করতে পারলেন না বলে তাঁর যে আক্ষেপ- সেই আক্ষেপে আমরাও পুড়তে লাগলাম। লম্বা ভো দিয়ে লঞ্চ ছাড়ার আভাস দিচ্ছে। দেলোয়ার ভাই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন পটুয়াখালীতে পুণর্বার আমন্ত্রণ জানিয়ে।

তোফাজ্জল ভাই বেচারা ঢাকায় বসে পটুয়াখালীর ঘাটে বাঁধা লঞ্চে আতিথেয়তার উষ্ণতা ছড়িয়ে দিলেন! ধন্যবাদের মতো একটা বহুল প্রচলিত শব্দ তাকে না জানানোর আক্ষেপ আমাদের চিরকালই পোড়াবে। এর চেয়ে ভালো কোন শব্দের অপেক্ষায় রইলাম।

পটুয়াখালীর পন্টুন ছেড়ে এমভি কুয়াকাটা এগিয়ে যাচ্ছে বিশাল অজগরের মতো আকাবাঁকা নদীর মাঝখান দিয়ে। নদীতীরের জনজীবন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিনের আলো ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ। পূর্ব তীরের আকাশে চাঁদ উঠবে একটু পরে। একঝাঁক সাদা বক ভাঙা মেঘ সাতরায়ে অন্ধকারের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। সাজ্জাদ ভাই বলে উঠলেন-

'রাঙা মেঘ সাতরায়ে, অন্ধকার আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক। আমারেই পাবে
তুমি ইহাদের ভীড়ে...'

শিশুতোষ বধ

হাদিয়ার রহমান মীর
সিনিয়র ম্যানেজার, কমার্শিয়াল
ব্যাবিলন গ্রুপ

নচিকেতার গানের এক পংক্তিতে শুনেছিলাম, 'ছোট ছোট শিশুদের শৈশব চুরি করে গ্রন্থিকদের দল বানায় নির্বোধ।' ঐ সময়ে এই পংক্তির মর্মার্থ খুব একটা বোধগম্য না হলেও নিজের সন্তান এবং বর্তমান শিশুদের দৈনন্দিন রুটিন দেখে সত্যিই ঐ গানের লাইনের মর্মার্থ হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি।

খুব ভোরে শিশুদের ঘুম থেকে উঠে স্কুলের জন্য তৈরি হওয়া, তারপর স্কুল শেষে কোচিং শুরু, কোচিং থেকে ঘরে ফিরে কোনোমতে গোসল সেরে নাকেমুখে খাওয়া দাওয়া। অতঃপর শুরু বিকেলের কোচিং, আর্ট স্কুল এবং সন্ধ্যায় আরবী শিক্ষার তালিম; স্কুল-কোচিং এর হোমওয়ার্ক শেষ করা, অতঃপর রাত ১১-১২ টার পরে ঘুমাতে যাওয়া, আবার পরের দিন খুব ভোরে ৬টায় ঘুম থেকে উঠা- এমনকি শুক্রবার বন্ধের দিনেও নিস্তার নেই ওদের। বাড়তি পড়ার চাপ, বাড়তি বইয়ের ভারে ন্যুব্জ শিশুরা। ভারী ব্যাগ বহনে শিশুর মেরুদন্ড অকালে ক্ষয় হচ্ছে, ঢিলে হয়ে যাচ্ছে তাদের পেশি। প্রত্যেকটি স্কুলের পাঠ্যসূচিতে যোগ হচ্ছে দ্বিগুণ নতুন বই- যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের প্রাইভেট/ কোচিং এর জন্য রমরমা ব্যবসার উপাত্ত। এ ছাড়াও বর্তমানে স্কুলের মেইন বইগুলো সঠিক এবং সুন্দর করে বুঝানোর চেয়ে ছাত্রদেরকে হোমওয়ার্ক দেওয়ার জন্যই শিক্ষকগণ বেশি ব্যবহার করে থাকেন- যা পরবর্তীতে প্রাইভেট/ কোচিং এর জন্য মহাসহায়ক। আর এসব মনগড়া শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ডের জন্য খেসারত দিতে হয় কোমলমনা শিক্ষার্থীদের। দিন নেই রাত নেই- প্রাইভেট কোচিং নিয়ে তাদের মহামূল্যবান শৈশব আজ নির্মমতার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

আমাদের শৈশবের এক/ দুই যুগ আগের জীবনের সেই আনন্দময় দিনগুলো কতইনা অনাবিল আনন্দ ও খেলাধুলার মধ্যে কেটেছে, অথচ বর্তমানের শিশুরা পাঠ্যবইয়েই সীমাবদ্ধ। তাদের নিজেদের জীবনের শৈশব আসলেই চুরি হয়ে যাচ্ছে। শিশুদের শৈশব হবে আনন্দময়, খেলাধুলা, দুষ্টুমি আর শারীরিক কসরতে ভরপুর। তাদের শরীর, মেধা সবই এই সময়ে বাড়তে থাকে। অথচ তারা এখন দিনের পর দিন পড়াশুনার চাপে পিষ্ট হয়ে শৈশব, কৈশোর সবই নষ্ট করে ঝিমাচ্ছে। অকালে শরীরে বাঁধছে নানারকম রোগের বাসা। দু'চোখে

উঠেছে মেগা পাওয়ারওয়ালা চশমা। দীপ্তবুদ্ধির পরিবর্তে স্থূলকায় শরীরে নানা সমস্যায় তারা জর্জরিত। এরই ফাঁকে সময় পেলে ঠরৎঃঁধষ জগতে প্রবেশ করছে, শিখছে নানা কু-সংস্কৃতি, সাথে আছে অপসংস্কৃতির নানা নোংরা হাতছানি। সুস্থ-সবল দেহ, স্বচ্ছ মন নেই তাদের। দিন দিন বড় হয় আর যেন ক্ষয়ে যাওয়া সমাজের নতুন অতিথি হিসেবে প্রকাশিত হয়।

আমরাই আমাদের শিশুদের শৈশব-কৈশোর নষ্ট করছি। আমাদের ঘুনেধরা সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। পাশ্চাত্যের লেখাপড়ায় ঝুঁকছে ধনী সমাজ। অথচ তারা চোখ খুলে দেখতে পায় না ঐ সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ছবি। ঐসব উন্নত বিশ্বের স্কুলই সকল শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। স্কুল শেষে বাসায় ফেরার পর ছাত্র-ছাত্রীদের নেই কোনো বাড়তি লেখাপড়ার চাপ, রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকু শিশুরা খেলাধুলা, পারিবারিক শিক্ষা ও অন্যান্য বিনোদনে পার করে দেয়। এমনকি ঐসব স্কুলে খেলাধুলা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক শিক্ষাব্যবস্থাও আছে।

তাই আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কর্ণধারদের বলছি, গুনগত ও মানসম্পন্ন, জ্ঞানভিত্তিক ও নৈতিক শিক্ষার বিকাশ এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠ্যক্রমে উপযুক্ত পাঠ্যবই, বয়স অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা ও নৈতিক শিক্ষার অধিক গুরুত্বারোপ করে সৃজনশীল ও সুশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থাকে শিশু শিক্ষার অন্যতম কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করে ফিরিয়ে দিন আমাদের সন্তানদের সু-শৈশব। বাঁচতে দিন তাদেরকে শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতায়। শিশুর কাঁধে ভারী ব্যাগ নয়, পড়াশুনা হোক আনন্দময়- এ আবেদন আজ সমগ্র জাতির|

সাগর-পাহাড়ের দেশে

মোঃ সাহেবজাদা
অফিসার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের হাজারো মজার স্মৃতি মাঝে মাঝে স্মৃতিতাড়িত করে। ৪র্থ বর্ষের শেষ সেমিস্টারের ঘটনা। হঠাৎ সিদ্ধান্ত হলো- কক্সবাজার আর সেন্টমার্টিনে পিকনিকে যাব। সব আয়োজন প্রায় সম্পন্ন। আনন্দে উদ্বেল সবাই। হঠাৎ আমাদের প্রস্তাবিত তারিখে হরতাল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। আনন্দ আর হতাশার মধ্যে হরতাল প্রত্যাহারের ঘোষণা আসলো। আমাদের আর পায় কে?

অবশেষে কাঙ্খিত দিনটি এল। রাত দশটায় ঢাকা থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। সারারাত গাড়ির মধ্যে হৈ-হুল্লোড় করে পরদিন সকাল আটটার দিকে আমরা কক্সবাজার পৌঁছালাম। ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করলাম দল বেঁধে। আমাদের আর তর সইছিল না। সারারাতের ভ্রমণক্লান্তি আমাদের চোখে-মুখে। তা সত্ত্বেও সমুদ্রের হাতছানি উপেক্ষা করা গেল না। দল বেঁধে সাগরপাড়ের বালিতে ফুটবল খেললাম, গোসল করলাম।

হোটেলে ফিরে খাওয়া দাওয়া শেষ করেই ঘুম। সন্ধ্যায় ঘুম থেকে উঠে দেখি রুমে কেউ নেই। সবাই চলে গেছে সাগরপাড়ে। দেরি না করে সোজাসুজি চলে গেলাম বীচে। সাগরপাড়ে মজা করতে করতে কখন যে ৯টা বেজে গেছে। সবাই মিলে বসে সাগরের বাতাস খাচ্ছি। কিছুটা দূর থেকে গানের আওয়াজ আসছিল। একদল ছেলেমেয়ে সমস্বরে গান গাইছিল আর দলবেঁধে নাচছিল। কৌতুহল পেয়ে বসল। ওদের আনন্দে ভাগ বসাতে ইচ্ছা করল। আমরাও যোগ দিলাম ওদের দলে। কিছুক্ষণ নাচ গান করে আমরা ফেরার জন্য পা বাড়ালাম। আমরা লাবনী পয়েন্টের দিকে হেঁটে আসছিলাম। আমাদের একটু সামনে জনাতিনেক লোক হাঁটছিল। একটু পেছনে আরও দু'জন। হঠাৎ আমার সামনের লোকটি পেছন ফিরে বলে উঠল- এই আপনি আমার কানে হাত দিলেন কেন? আমিতো আকাশ থেকে পড়লাম। কিছু বুঝে উঠার আগেই লোকটা আমার হাত ধরে বসল। চিৎকার করে দলের লোকদের উদ্দেশ্যে বলল- এই লোকটা আমার কান ধরছে, ধর তোরা। আমি বুঝতে পারলাম আমরা খপ্পরের দলে পড়ে গেছি। এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। যা করার এক্ষুণি

করতে হবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দিলাম এক দৌড়। উসাইন বোল্টের একশ মিটার। বাকিদেরকে বললাম দৌড়া। বীচে বসে থাকা বাকি বন্ধুরা আমাদের দৌড় দেখে ওরাও দৌড়াতে শুরু করল। আমি শুনতে পেলাম ওরা আমাদেরকে চোর চোর বলে চিৎকার করছিল। আমরা বাজারে এসে একত্র হলাম। এরই মধ্যে বিপদ কেটে গেছে মনে হলো। আমি কেনাকাটার জন্য একটু আলাদা হয়ে গেছি। পিছনে ঘুরে দেখি ঐ লোকটা আমার দিকে দৌড়াচ্ছে আর চোর চোর বলে চিৎকার করছে। কিছু না ভেবে আবার দৌড় দিলাম। এক দৌড়ে হোটেলে গিয়ে উঠলাম। রিসিপশনে গিয়ে বললাম- আমি বিপদে পড়েছি। ওরা আমাকে আশ্বস্ত করল। পরে বন্ধুরা এসে পড়ায় সাহস ফিরে পেলাম। রাতের খাবার শেষে সাগরে গোসল করার পরিকল্পনা ছিল। ঘটনার পর আর সমুদ্রমুখী হওয়ার সাহস পেলাম না।

সমুদ্র দেখার সেই সুখস্মৃতির সাথে আজও সেই ভয়ংকর স্মৃতিটাও মনে পড়ে। মাঝে মাঝে ঐ লোকগুলোর মুখচ্ছবি দেখতে পাই। আমাদের চারদিকে ওদের ভীষণ দাপট এখন।

ঢাকা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারী এন্ড টায়ার

দীর্ঘ ৪২ বছরের টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়ের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ।

* এখানে সুলভ মূল্যে সকল প্রকার বিভিন্ন ব্রান্ডের টায়ার, ব্যাটারী, আই.পি.এস খুচরা ও পাইকরী বিক্রয় এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়।

১২৫, দারুস সালাম রোড (মিরপুর রোড) ঢাকা -১২১৮।
ফোনঃ ৯০১১১৮২, মোবাইলঃ ০১৫৫২৪৯৩৩২০, ০১৭৪২৮৪২৮৪২
E-mail: dhakastandardbattery@gmail.com

Once A Day Together

Salma Sultana
Ex. Admin Officer
Babylon Group

"What's now? Let's go back to office, ok?" asked Swarna Apa.
"Oh no, no Swarna Apa, why don't you understand? How often we get a bank holiday? We must not go back to office now," implored Rokhsana in one breath.

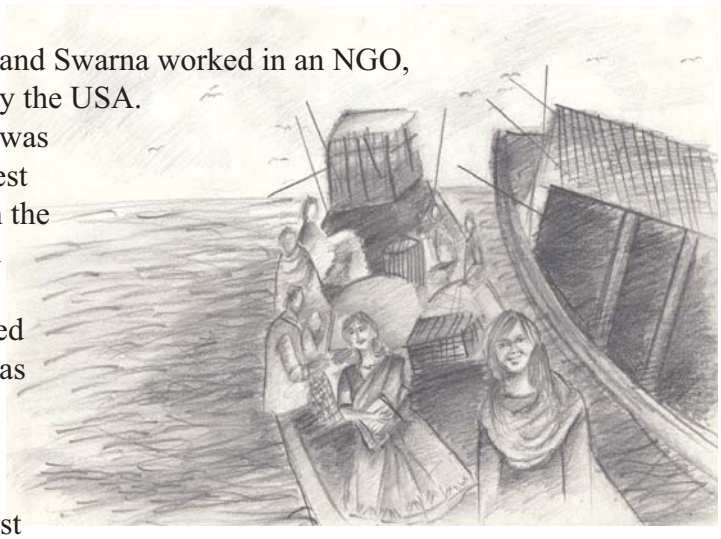

Rokhsana and Swarna worked in an NGO, financed by the USA. Rokhsana was the youngest member in the office and everyone there adored her. She was a restless girl of nineteen. She had just completed her graduation and on an impulse applied for the job, which she found in a job advert circulated in a daily newspaper. In the interview she made the highest score. All the members of the interview board including the chairman of the NGO were pretty impressed with the easiness of the young girl.

Rokhsana got the job; though she was not very sure whether she would continue the job or not. But meanwhile she was enjoying her office environment being with her colleagues. It had a homely atmosphere.

Swarna was a beautiful young woman. She was very sincere and responsible in her work. She was always serious doing a job and that made her look more senior than her actual age. She never took part in silly jokes, or in useless gossips, as her colleagues did. She liked to keep a distance from people. But for Rokhsana she was quite different. She had boundless affection for this girl. Though both of them were quite opposite in nature but for some no apparent reason Swarna liked the girl, Rokhsana. She never got angry with her.

Today when they came to bank for a withdrawal they had no idea that it was 1st of July and a bank holiday. So it was obvious that they had to return to their work. But the idea of resuming the daily routine today seemed simply foolish to Rokhsana. She wanted to utilize the god-sent opportunity. She wanted to have some fun. Immediately she hit upon a plan.

"Wow!!! What a lovely place!"
Both Rokhsana and Swarna were standing beside a highway that led to the airport. They were standing at a point from where anyone could enjoy both the descending of a chopper and the anchored marine vessels. The village Laldiar Char was beside the highway. In one side of the village there was a vast open space that the government had acquired recently for the future expansion of the airport facilities. The area was not yet separated by a brick wall but so was done by wire fences. That allowed the villagers and other onlookers to witness how a giant metallic dragonfly got down on the ground from the sky. In the other side of the village there was the place where the Bay of Bengal mingled with the Karnaphuli River. There, local and foreign ships laden with goods were moored.

The two young women adventure seekers took a taxi and reached the village Laldiar Char. Now the two were watching the sight with awe. It was such a nice place, far from the city crowd where

people could easily forget the worries of a life.
It was not easy for Rokhsana to make Swarna agree to come here. But reaching there Swarna also had to admit that there was no harm if they needed to skip office for a day for coming to such a beautiful place. What an enjoyment it was! She was very happy and thanked Rokhsana for bringing her there.

But Rokhsana's adventure was not yet completed. She had so many things to do. They were now walking through the village towards the ghaat where people got on ferryboats to cross the river. Reaching the ghaat they were waiting for the incoming boat, which was in the midway across the river at that time. The boat came, passengers alighted and the waiting passengers on this side climbed one by one. The two ladies also did not miss to manage a place for them to sit on amongst the crowd of people.

Since there was no other passenger left to come onboard the boat started moving. The girls felt that the passengers in the boat were eyeing them with curiosity and eagerness. Swarna and Rokhsana were truly worthy of attracting curious looks toward them from the rest of the ordinary villagers. After a minute or two one of the oldest passengers gathered his courage and asked them a question with much effort.

"Who are you ladies? Where are you heading? Don't see many like you around."
Rokhsana and Swarna exchanged a startled look and had a silent communication between themselves through their eyes.

Swarna took out her sunglasses at once from her bag and put them on. Rokhsana brought out her notebook and a pen.

"We are newspaper reporters. We are here to cover the story of the shipwreck that happened yesterday in your area." Rokhsana replied to the old man with a sweet smile on her face.

Rokhsana and Swarna had overheard the news of the shipwreck when they were waiting for the boat at the ghaat. Some villagers were talking about it. A ship carrying coconut from Sri Lanka was approaching the Chittagong port. But unfortunately it failed to escape the fury of the sudden storm on the Bay last night. Members of the crew of the ship were able to save their lives but the ship sank scattering the load of coconuts everywhere in the water near the mouth of the Karnaphuli where it met the Bay. Villagers from both sides of the river could not resist themselves from collecting the coconuts. Some of them were edible and some were good for squeezing oil from.

Swarna, not much like her usual nature, all on a sudden started asking questions to the co-passengers of the boat. As if she really was a newspaper reporter she asked them to tell her what they knew about the capsized Sri Lankan boat. Her genuine curiosity helped her look like a real reporter. She didn't have to pretend or act artificially for that.

This of course had its effect on the simpleminded villagers. All on a sudden they became very animated and started to talk all at a time. What a scene that was for the two adventuring young women from the city! Each one of the villagers competed with the other to help the 'reporters' with a news worthy report of the wreck before the others. Poor Swarna! She was in a fix no doubt - what to do now? At some point Rokhsana asked them to hold on till she had started taking notes and requested them to speak one after another. The two 'reporters' did not forget to take some snapshots of the enthusiastic narrators with the camera Swarna was carrying with her. By then the locals were eyeing them with respect and awe. They were excited at the idea of getting their photos printed or at least the names published in any of the newspapers next day.

The boat reached the ghaat on the other side. Everybody

disembarked including the two famous 'reporters'. Now they were not on a small boat anymore, they were on the land and in a totally unknown territory for them. They could not just pass their time in sightseeing because it was not common for two unknown ladies to roam in a village aimlessly. What would they do now?

When there was a problem there was a solution also for Rokhsana. Her searching eyes caught on a small notice written on a tin board hanging from a tree. It helped her immediately devising her next plan. On the notice somebody wrote that they were offering the villager's arsenic test of the water of their tube wells at a very low cost.

Now it was their next mission. This time they were the government officers who had come to the village to inquire about the tube-wells there whether they had gone through the arsenic tests or not.

As they knew exactly what to do they proceeded with confidence looking for a suitable prey for their prank. At last they chose a nice house for it. It looked like it was made for a joint family with many houses clustered side by side with a common big yard and a huge pond little afar. They also saw two tube-wells at the two sides of the house; their main targets.

They entered the yard where a number of females were busy working beside the heaps of dried paddy. It was obvious that the residents of the houses would be curious about the two young women from the town walking into their yard without any prior notice. They stopped working, raised their heads and then slowly stepped towards them. After the formal exchange of greetings the two honourable arsenic officials introduced themselves and explained to them the reason for their visit.

"We are here to know if the tube-wells that we see in your house

have had the arsenic test." Swarna said.
"No, they are not. We heard that some people were working on it. They came to our village few months ago but ours are not checked yet." Came the anxious reply in one breath from one occupant of the houses.
"Oh, I see! Said Rokhsana giving an air of being very disappointed hearing about the negligence from the part of some of their staff. "That is the exact reason why we are here." She continued. But both of them were secretly very happy to get an opportunity of staying in the place a little longer and continuing their fake but humorous conversations on the subject.
"Is the water of our tube-wells safe to drink or for other use?" asked one of the anxious women who had gathered around them.
"We can't say anything about this before the test has been done," said Swarna without any apparent enthusiasm, trying to sound like a genuine government official in duty under the circumstances.
"Are you madams here to test them now?" The women further interjected with eagerness in her voice.
"Not really. But we are here for collecting information from you. Later we will send someone soon to perform the tests for you," Rokhsana assured the village woman.
"We know about few more tube-wells in our village that are also not tested. Would you please also include them in your list?" pleaded another woman.
"Not a problem," Rokhsana said confidently.

They did not know for how long they would have stayed there in order to continue the fun but all on a sudden they noticed from the corner of their eyes that some of the male members of the houses were coming towards them. They must have been informed by someone from the women they were talking with. Their hearts sank and they beat faster and fear seized them. They knew that in a few minutes their 'expertise' in arsenic test matter would be exposed and they would be ridiculed in front of the eyes of their not-so-long-ago women admirers. So they decided that it would be

a very good idea for them to leave the place immediately without delaying a second before they were confronted by the curious, then surprised and finally angry villagers.

"We will see you later. Goodbye!" was what Rokhsana managed to mutter to the women before they turned around and started walking hurriedly out of the yard. In that time the pace Rokhsana and Swarna managed for leaving the place could have been a matter of envy for any champion fast walker.

"Hey, Swarna Apa, stop! Are you two here on any assignment from our office? And why are you leaving so quick like this? I am Baten." A male voice called out to them from behind.
Both of them looked back and recognized the caller immediately. He was one of the errand boys in their office. He was on his annual leave. They had no idea that it was the place of the boy they had come to have fun skiving off their office.

Both Swarna and Rokhsana gave a baffled look. They thought adventure of this kind always had a risk. But now they had no time to worry about it.

The only concern at that moment they had was whether the ferryboat would be on their side or on the other side.

Famous historian Professor Dr. Sayed Anowar Hossain and Professor Dr. Showkat Ara Hossain are unwrapping the 9th issue of Babylon Kathokata along with Babylon Directors

A team of Parliamentarians from Germany visits Aboni Knitwear complex on 25 August, 2015 & expresses its satisfaction with the remedial action of Accord & Alliance safety observations

Babylon team is distributing warm clothes to the cold affected people of northern Bangladesh.

Babylon employees are donating blood at a reguler blood donation program organised by Babylon Medical Services.

Her Excellency Gennet Zewide, Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary, Embassy of Ethiopia visited a factory of Babylon Group on 2nd December, 2014

Mr. Abdus Salam, Director of Babylon Group, is giving out stipend to the workers for the education of their children

Considering the need Babylon donates home appliances for workers to uplift their living standard.

Dr. Md. Shafiqul Islam, Consultant (ENT), Dhaka Medical College Hospital, is examining a patient at the Free Health Camp organised by Babylon Medical Services

Babylon donates cattle to the families of its insolvent employees to uplift their living standard.

Babylon donates food, medicine, medical services, educational support etc. for the orphan of Families for Children (FFC), an orphan house at Uttara, Dhaka

FFC's (Families for Children) artists are participating in a mind blowing dance on annual picnic at Babylon Garments.

Members of the Babylon Photography Club active on a day-out

Supporting Agricultre,
Ensuring Food Security

Our Concerns

- Seeds
- Agrochemicals
- Fertilizers

BABYLON

Spirit of Ethical Business

ব্যাবিলন এগ্রিসাইন্স লিমিটেড

২-বি/১ দারুস সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ

ফোন ঃ ৮০২৩৪৯৫-৬, ৮০২৩৪৬২-৩, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮০৩২৯৪৯

ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিষ্ঠানসমূহ-

- ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড
- ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড
- সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড
- অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড
- অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড
- অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড
- জুনিপার এমব্রয়ডারিজ লিমিটেড
- ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড
- ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড
- ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড
- ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিমিটেড
- ব্যাবিলন আউটফিট লিমিটেড (ট্রেন্ডজ)
- ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড
- ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস
- ব্যাবিলন লজিস্টিকস লিমিটেড
- ব্যাবিলন মেরিন ভেনচারস
- ব্যাবিলন এগ্রিসাইন্স লিমিটেড
- নিউজেন টেকনোলজি লিমিটেড
- ব্যাবিলন রিসোর্সেস লিমিটেড
- গ্রামীণ ব্যাবিলন প্রোডাক্টস

Head Office:
2-B/1, Darussalam Road, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel : 9023495-6, 8034266, 9023460, 9023462-3, 9015165 (Off)
9010533, 9007175 (Fac)
Fax : 880-2-8032949
E-mail: babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com